পর্দা গাইডলাইন

[পরিবেশ পরিস্থিতি পরামর্শ]

তানজীল আরেফীন আদনান

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের ইসলামের মতো নেয়ামত দান করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা শরীয়তে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, এর মধ্যে পর্দার বিধান অন্যতম। এর কিছু কারণ রয়েছে, যেমন, কিছু কিছু ইবাদতের ফায়দা একান্ত নিজের হলেও পর্দার বিধান মানার ফায়দা শুধু নিজের নয়; বরং এর দ্বারা পুরো সমাজ ঠিক থাকে, পুরো দেশ ঠিক থাকে, পুরো একটি জাতি সঠিক পথে থাকে। পর্দার বিধানের গুরুত্ব জানা থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বাস্তবিক রূপ কেমন হবে, কোন অবস্থায় কীভাবে পর্দা করতে হবে, আধুনিক যুগ অনুযায়ী পর্দার বিধান কেমন হবে, পর্দার পরিবেশ না থাকলে কীভাবে পরিবেশ গড়তে হবে, পর্দাবিমুখ পরিবেশে কীভাবে নিজেকে দ্বীনের পথে রাখতে হবে ইত্যাদি বিষয় অনেকেই না জানার কারণে সমস্যায় ভোগেন। কেউ কেউ খেই হারিয়ে ফেলেন বেদ্বীনী পরিবেশে। তাই আমরা এ বইতে পর্দা-কেন্দ্রিক সমসাময়িক সমস্যাগুলোর সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পর্দার খুঁটিনাটি সুরত উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি পর্দার গুরুত্ব ও এর প্রতি উদ্বুদ্বকরণের কাজটিও করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

বইটিকে আমার একার পক্ষে এত সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা সম্ভবপর ছিল না। বরং আরও অনেক তথ্য ও লেখা যুক্ত করে বইটিকে দারুণ করে তুলেছেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমাদ ইউসুফ শরীফ ভাই। এরপর

বইটিতে চুলচেরাভাবে সম্পাদনার কলম চালিয়েছেন মাওলানা ইউসুফ ওবাইদী হাফি.। ফলে বইটির রওনক আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনকে কবুল করুন। পাশাপাশি প্রকাশক, প্রুফরিডারসহ বইটিতে যারাই শ্রম দিয়েছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করুন। সবাইকে রওয়া যিয়ারতের তাওফীক দান করুন। খাতেমা বিল খায়ের নসীব করুন। আমীন।

তানজীল আরেফীন আদনান

শনির আখড়া, ঢাকা

মঙ্গলবার, ১৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরী

সূচিপত্র

পর্দা গাইডলাইন........ ১৩
সুযোগ সন্ধানী কেয়ারটেকার! ১৪
পর্দা করলেই জঙ্গি! ১৫
একজন তামান্না ও বাঙালি মুসলিম পরিবার ১৬
পর্দার শুরু ১৭
ছেলেদের পর্দার বয়স ১৯
মেয়েদের পর্দার বয়স ২১
বাচ্চাকে পর্দার জন্য উৎসাহ দেয়া ২৪
মাহ্‌রামের সামনে নারীর সতর ২৫
চেহারার পর্দা ও কিছু কথা ২৬
কুরআনের আলোকে চেহারার পর্দা ২৭
এই আয়াতের ব্যাপারে তাবিয়ীগণের তাফসীর ৩৪
পরবর্তী মুফাসসিরগণের তাফসীর ৩৫
হাদীসের আলোকে চেহারার পর্দা ৩৫
নিজেদের সরলতা ও বিজাতীয়দের প্রতারণা লক্ষ করুন ৪০
গ্রামগঞ্জে পর্দার বেহাল দশা ৪২
উন্মুক্ত স্থানে গোসল করা ৪২
ঘটনা : ১ .... ৪৩
ঘটনা : ২ .... ৪৩
ঘটনা : ৩ .... ৪৪

দোচালা টিনের ঘরে পর্দা ৪৬
গ্রামে কাপড় শুকানোর ঝামেলা ৪৭
গ্রামের বাড়িতে গলার আওয়াজ যেমন থাকবে............ ৪৮
উঠোনজুড়ে ডাকাডাকি ৪৮
গ্রামে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কীভাবে করবে? ৪৮
হুটহাট কারও ঘরে না যাওয়া ৫১
অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি............ ৫৩
কলিংবেল দেয়া ও দরজায় নক করা............ ৫৪
নাম-পরিচয় উল্লেখ............ ৫৪
'আমি আমি' বলা অনুচিত............ ৫৫
দরজায় দাঁড়ানোর নিয়ম............ ৫৬
ঘর থেকে কোনো জবাব না এলে............ ৫৭
মাহরামের ঘরে গেলে অনুমতি লাগবে?............ ৫৮
এক মহিলা অপর মহিলার ঘরে গেলে............ ৬০
ডেকে পাঠালে ৬১
উন্মুক্ত স্থানে অনুমতির প্রয়োজনীয়তা ৬১
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ঘরে গেলে............ ৬২
ধর্মের ভাই, ধর্মের বোন, উকিল বাবা সমাচার ৬২
পুরুষের জন্য মাহরাম : ৬৩
পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম : ৬৪
নারীর জন্য মাহরাম : ৬৫
নারীর জন্য গায়ের মাহরাম : ৬৫
উকিল বাবা আসল বাবা নয়............ ৬৬
গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারে পর্দার সুরত ৬৭
একান্নবর্তী পরিবারে পোশাকের পর্দা ৬৯
শহুরে পর্দার রকমফের............ ৭০
দরজা-জানালায় আধুনিক পর্দা............ ৭১
রুমের ভেতরের পর্দা............ ৭৪
বারান্দার পর্দা............ ৭৪
ছাদ যেন পর্দাহীনতার আরেক নাম ৭৫

চিলেকোঠায় বাসা ৭৬
লিফটে পর্দা.. ৭৬
থাই গ্লাসে দিন-রাতের মারপ্যাঁচ ৭৭
মেহমান এলে করণীয়.. ৭৮
কোথাও বেড়াতে গেলে ৮০
বিয়ে-বাড়ির পর্দা ৮১
পাত্রী দেখার হালচাল.. ৮২
ঘটকের কাছে ছবি দেয়া.. ৮৩
পাত্রীর ছবি তুলে নিয়ে যাওয়া ৮৪
পরিচয় হওয়ার নামে বিয়ের আগে ঘুরতে যাওয়া ৮৪
বিয়ের আগে কথোপকথন ৮৫
বিয়ের দিনের কার্যকলাপ.. ৮৫
বিয়ের পর দেখতে আসার হিড়িক ৮৬
বিয়ের অনুষ্ঠান ৮৭
বিয়ের আগে-পরে মেহমানের আনাগোনা.. ৮৭
বিয়ের খাওয়ার অনুষ্ঠান.. ৮৮
দ্বীনহীন বিয়ের অনুষ্ঠানে দ্বীনদারের উপস্থিতি! ৮৯
গ্রুপ ফটোসেশন.. ৯০
হানিমুন, নাকি বেপর্দা হওয়ার মহড়া? ৯১
অনলাইনে স্ত্রীর ছবি আপলোড করা ৯২
মহিলাদের বাইরে যাওয়ার বিধান ৯২
স্ত্রীকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া ৯৪
পথে-ঘাটে, গাড়িতে-ট্রেনে পর্দা ৯৫
বাজার বা মার্কেটে পর্দার রফাদফা ৯৬
নারী সেলসম্যান.. ৯৯
ভাড়ায় চালিত গাড়িতে গাইরে মাহরামের সাথে বসা.. ১০২
পালক সন্তানের সাথে পর্দা.. ১০২
হাফপ্যান্ট পরে বাইরে যাওয়া ১০৪
পাতলা লুঙ্গি পরিধান করা.. ১০৫
সাবলেট বাসায় পর্দা.. ১০৫

অনলাইন বিজনেস ১০৬
ভ্লগিং : একটি নব্য ফিতনা ১০৯
বাইক ভ্লগ ১১০
কাপল ভ্লগ ১১১
নারীদের বিদেশ গমন ১১২
উপার্জনের দায়িত্ব কার কাঁধে এবং ঘর সামলাবে কে? ১১৮
গৃহবিমুখ নারী, ফলাফল : সামাজিক অবক্ষয় ১২৬
নারীরা উপার্জন করবে কীভাবে? ১৩১
বোরকা নয়, যেন ফ্যাশনের আরেক রূপ ১৩৩
টেইলার্সে কাপড় বানানো ১৩৪
পুরোনো জিনিসপত্র কাপড়চোপড় বেচাকেনা ১৩৫
তরকারিওয়ালা ও মাছওয়ালার সাথে পর্দা ১৩৬
বারান্দায় কাপড় শুকোতে দেয়া ১৩৭
ভিডিও নাশীদ বা বয়ান শোনা ১৩৭
দেবর ও ভাশুরের সাথে পর্দা ১৩৮
ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের সাথে পর্দা ১৪১
চিকিৎসকের সাথে পর্দা ১৪৩
ইহরাম অবস্থায় হিজাব ১৪৪
ভিক্ষুকের সাথে পর্দা ১৪৫
গৃহশিক্ষকের সাথে পর্দা ১৪৬
নূপুর পরিধানের শরয়ী বিধান ১৪৭
পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু মৌলিক নীতিমালা ১৪৮
মাহরাম ছাড়া নারীদের সফর : শরয়ী দৃষ্টিকোণ ১৫৫
গভীর রাতের মাহফিল সমাচার ১৫৭
ঈদের জামাতে মহিলাদের উপস্থিতি ১৬২
নারীদের তারাবীর জামাত ১৬৩
কাজের লোকের সাথে পর্দা ১৬৪
ড্রাইভারের সাথে পর্দা ১৬৫
র‍্যাগ-ডে, নবীনবরণ অনুষ্ঠান : অশ্লীলতার অপর নাম ১৬৬
র‍্যাগ-ডে শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতেই নয়, সামাজিকভাবেও ঘৃণিত ১৬৯

র‍্যাগিং : কলেজ-ভার্সিটির নবাগতদের সাথে এক অমার্জনীয় অন্যায় ১৭০
বিধর্মীদের উৎসবে গমন : শুধু পর্দা নয়, ঈমানেরও ক্ষতি ১৭৩
মোবাইলে ছবি তোলা নষ্ট করে পর্দানশীনের পর্দা........................ ১৭৬
১. স্বামীর মোবাইলে স্ত্রীর ছবি ১৭৭
২. বিবাহের সময় ছবি তোলা.. ১৭৭
৩. নতুন পোশাক পরে ছবি তোলা ১৭৮
বৃদ্ধ বয়সে পর্দা ১৮০
প্রবাসীর স্ত্রী, পরকীয়া, বিচ্ছেদ : কিছু কথা, আফসোস ১৮১
এর থেকে উত্তরণের উপায় : ১৮৩
দ্বীনহীন পরিবেশে কীভাবে পর্দা করতে হবে ১৮৪
পর্দার বিধান মানার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা...................... ১৯১
প্রাসঙ্গিক আলোচনা : অভিভাবকরা কি
আসলেই সন্তানের কল্যাণ চান? ২০১
নারীর পর্দা রক্ষায় পুরুষের দায়িত্ব ২০৪
ইসলামের পর্দা বিধান : মুমিন-মুনাফিকের
পরিচয় নিরূপণের ঐশী মানদণ্ড ২০৭
মুসলিম বোনদের প্রতি খোলা চিঠি ২১১

পর্দা গাইডলাইন

পর্দা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ বিধান। ইসলামী শরীয়তে সাধারণ সমাজব্যবস্থার জন্য এবং বিশেষভাবে উম্মতের মায়েদের জন্য পর্দার বিধান অনেক বড় এক অনুগ্রহ। এই বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক দলীল। পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক এবং পূত-পবিত্রতা ও নিষ্কলুষ সতীত্ব রক্ষার অন্যতম উপায়।

যেকোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখিত পর্দা সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস ও অন্যান্য বর্ণনা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এই বাস্তবতা স্বীকার করবেন যে, ইসলামে পর্দার বিধানটি অন্যান্য হিকমতের পাশাপাশি নারীর সম্মান ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই দেয়া হয়েছে।

নারী-পুরুষ উভয়ের পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায় হলো ইসলামের পর্দা বা হিজাবের বিধান। এই বিধান অনুসরণের মাধ্যমেই হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। পর্দার এই সুফল স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ.

> ‘এই বিধান তোমাদের (পুরুষদের) ও তাদের (নারীদের) অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।’[১]

সুতরাং সমাজব্যবস্থাকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দার বিধানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে প্রতিটি সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারীজাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দার বিধানের পূর্ণ অনুসরণ সময়ের

সবচেয়ে বড় দাবি।

আমরা এই বইতে পর্দা কবে কখন কেন ফরজ হলো তা নিয়ে আলোচনা করব না। কারণ, পর্দা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সর্বকালীন ঐকমত্য সুস্পষ্ট। এখানে আমরা পর্দার রূপরেখা, এর শরয়ী সীমা, প্রতিকূল পরিবেশে পর্দার পদ্ধতিসহ সংশ্লিষ্ট কিছু বাস্তব ঘটনা ইত্যাদি সবিস্তারে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

শুরুতেই আমরা কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে বোঝানোর চেষ্টা করব, আমাদের সমাজে পর্দার বিধান অমান্য করার পরিণতি কী হয়! এবং যারা পর্দা করতে চায়, তাদের সাথেও কতটা রূঢ় আচরণ করা হয়ে থাকে। ঘটনা অল্প হলেও এগুলো আমাদের অসুস্থ সমাজের বাস্তব চিত্র বহন করে। দিন দিন আমরা ইসলাম থেকে কতটা দূরে সরে যাচ্ছি এটা বোঝা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

সুযোগ সন্ধানী কেয়ারটেকার!

ঢাকাস্থ দ্বীনদার পরিবারের স্ত্রী তিনি। স্বামীও দ্বীনদার মানুষ। দিনভর চাকরি করে রাত করে বাসায় ফেরেন। সারাদিন বাসায় স্ত্রী আর ছোট দুই সন্তান থাকে। তাই দিনে বাসার বেশির ভাগ কাজ স্ত্রীকেই সারতে হয়। এই সুযোগে বাড়ির কেয়ারটেকার দিনের বেলা কারণে-অকারণে বিভিন্ন অজুহাতে ঘনঘন তাদের বাসায় আসতে থাকেন। কখনো পানির কল চেক করতে, কখনো-বা পেপারের বিল নিতে। এভাবে বিভিন্ন ছুতায় বারবার বাসায় আসতে থাকেন। প্রথম দিকে সেই নারী পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতেন। এরপর ধীরে ধীরে পরিচয় গাঢ় হয়ে গেলে তিনি ভাবতে লাগলেন, কেয়ারটেকার সাহেব তো এখন আমাদের অনেক পরিচিতই হয়ে গিয়েছেন, এত বছর ধরে যাওয়া-আসা করছেন, তার মনের মধ্যে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। থাকলে এতদিনে তা প্রকাশ পেয়ে যেত। এই ভেবে ধীরে ধীরে তার সাথে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা করতে লাগলেন। প্রথম দিকে পর্দার আড়াল থেকে কথা বললেও এরপর পর্দার বাইরে শুধু মুখ বের করে কথা বলতে লাগলেন। এরপর পর্দার বাইরে বেশ খানিকটা বের হয়েই কথা বলতে লাগলেন। একপর্যায়ে পর্দাহীন হয়েই তার সামনে আসা শুরু করে দিলেন!

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। এরপর সেই কেয়ারটেকার বাসায় এসে প্রায়ই তার

সাথে গল্পগুজব করতেন। শয়তান তখন পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে নেয়, ধীরে ধীরে এই কথোপকথন গভীর অবৈধ সম্পর্কে রূপ নেয়। পর্দার এই অসতর্ক শিথিলতা একসময় ব্যভিচারের মতো অভিশপ্ত গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়!

পর্দা করলেই জঙ্গি!

ইনবক্সে পাওয়া একটি বাস্তব ঘটনা, সিনথিয়া (ছদ্মনাম) নামের বোনটি স্কুলের পাঠ চুকিয়ে মাত্রই কলেজে উঠেছেন। এস.এস.সির আগ থেকেই কিছু দ্বীনী বান্ধবীর মাধ্যমে পর্দা শুরু করেন। বাসায় এ নিয়ে প্রচুর বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। বোনটি তার কাজিনদের সাথে পর্দা করা শুরু করলে আত্মীয়স্বজনের মাঝে কানাঘুষা শুরু হয়। সবার কথা হলো, কাজিনরা তো ভাইয়ের মতোই, তাদের সাথে আবার পর্দা কিসের! পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পর্দার খেলাফ হওয়া এবং গুনাহের পরিবেশ থাকায় বোনটি অংশগ্রহণ করতে না চাইলে একসময় পারিবারিকভাবে তাকে একরকম একঘরে করে রাখা হয়। রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে চাইলে বাধা দেয়া হয়। দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিকভাবে তাকে নির্যাতন করা হয়। হয় তাদের কথামতো চলবে, আর না হয় তারা জঙ্গি বলে মেয়েটিকে আইনের হাতে তুলে দেবে—এমন হুমকিও শুনতে হয় অভিভাবকদের কাছ থেকে! আত্মীয়স্বজন আগে পিছে কানাঘুষা করতে থাকে, কাদের পাল্লায় পড়ে মেয়েটা এমন জঙ্গি হয়ে গেল। জঙ্গির সব ধরনের আলামত তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে!

আগে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে যেত, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ঘুরতে যেত। বাসায় এলে সবার সাথে বসে মুভি দেখত। গত ঈদেও একসাথে পরিবারের সাথে স্টার সিনেপ্লেক্সে মুভি দেখে এল। স্টাইলিশ পোশাক পরত। আর এখন কী হয়ে গেল কী জানি! কাজিনদের সাথে কথা বলে না। বাসায় কেউ এলে তার সামনে যায় না। ওর বাবার বন্ধু ওকে ছোট থেকে আদর করে, এখন তার সামনেও যায় না মেয়েটা। এ নিয়ে সেদিন ওর সেই আঙ্কেলও খুব মনঃক্ষুণ্ণ হলেন।

পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে খুব শঙ্কাবোধ করছে। মেয়েটা রাত হলে নামাজ পড়ে। নামাজের আড়ালে কী কী করে কে জানে! সারাদিন কেমন মনমরা হয়ে থাকে। আগের মতো সেই চাঞ্চল্য নেই। অবশেষে পরিবারের লোকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিল, ওর এই অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে পুলিশের

টেরোরিজম বিভাগের সাথে যোগাযোগ করবে। হয়তো মেয়ে খুব শীঘ্রই পালিয়ে সিরিয়া চলে যেতে পারে। এর আগেই মেয়েকে দমাতে হবে।

একজন তামান্না ও বাঙালি মুসলিম পরিবার

তামান্না (ছদ্মনাম), ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। জীবনের প্রায় ২৫টা বছর কাটিয়েছে বেপর্দায় আর গুনাহের পরিবেশে। বাসা থেকে শুরু করে ক্যাম্পাস, বন্ধুদের আড্ডা সবখানেই ছিল গুনাহের সয়লাব। এখন দ্বীনের পথে ফেরার তাওফীক হয়েছে। ধীরে ধীরে পাপাচারপূর্ণ বদ অভ্যাসগুলো বর্জন করছে। গুনাহের পরিবেশ থেকেও যথাসাধ্য দূরে থাকার চেষ্টা করছে। এদিকে বিয়ের বয়স হওয়াতে পরিবার থেকে পাত্র খোঁজা হচ্ছিল। তামান্নার প্রথম পছন্দ আলেম ছেলে। আলেম না হলেও অন্তত দ্বীনদার হওয়া আবশ্যক। যে নিজেও দ্বীনের পথে চলবে, আর তামান্নাকেও দ্বীনের পথে চলতে সাহায্য করবে। দ্বীনের পথে ফেরার পর তামান্নার খুব ইচ্ছা, একজন নেককার লোকের স্ত্রী হওয়া। যেন জীবনের বাকি দিনগুলো তার হাত ধরে দ্বীনের পথে চলে; জান্নাতেও একসাথে থাকতে পারে। কিন্তু তার এই স্বপ্নে বাধ সাধল তারই পরিবার।

তাদের চূড়ান্ত কথা, বিয়ে করতে হবে তাদের পছন্দমতোই। তামান্নার পছন্দমতো কোনো হুজুর টাইপের ছেলের হাতে মেয়েকে তারা তুলে দেবে না। এর মধ্যেই তারা পছন্দ করেছে ইউরোপ প্রবাসী এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলেকে। ছেলের শিক্ষা, সম্পদ, বংশমর্যাদা সবকিছুই আছে; নেই শুধু দ্বীনটুকু। দুনিয়াবি সব যোগ্যতাই রয়েছে ছেলের! কিন্তু দ্বীন-ঈমানের ছিটেফোঁটাও নেই। যেদিন পাত্রপক্ষ তামান্নাকে দেখতে আসে, সেদিনই ছেলে তামান্নাকে বলে বসে, হেই! তুমি এসব হিজাব-টিজাব কী পরে আছো? তোমার এত সুন্দর চুল ঢেকে রেখে লাভ কী বলো? বিয়ের পর আমার সাথে ইউরোপ চলে যাবে, সেখানে তো এসব মধ্যযুগীয় পোশাক চলবে না। তামান্না সেদিনই বুঝে গেছে, এর সাথে বিয়ে হলে আমার দুনিয়াই জাহান্নাম হয়ে যাবে। তাই সে কোনোভাবেই এই বিয়েতে রাজি হলো না। মাকে বারবার বোঝায়। কিন্তু মায়ের একটাই কথা, তোর বাবার কথার ওপর আমার কোনো কথা নেই। তোর বাবা তো তোর ভালোই চায়। হুজুর ছেলের কাছে বিয়ে দিলে তোর ভবিষ্যতের কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু এই ছেলের কাছে তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

তাদের এসব কথায় মেয়েটা আরও ভেঙে পড়ে। কোনোভাবেই সে তার

পরিবারকে ব্যাপারটা মানাতে পারছে না। পরিবার ও দ্বীনের এহেন মুখোমুখি অবস্থানে সে একা কী করবে তা ভেবেই দিশেহারা তামান্না! একা একাও যে কিছু করবে, তাও সম্ভব না।

এখানে মাত্র তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। কিন্তু আমাদের চারপাশে এমন সিনথিয়া বা তামান্নাদের সংখ্যা অনেক। যারা প্রতিনিয়তই নিজের পরিবার, পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে দ্বীন মেনে চলছে। যাদের প্রতিটা রাত কাটে বালিশে মুখ চেপে কেঁদে কেঁদে। কারণ, ভোর হলেই আবার শুরু হবে নিত্যদিনের জুলুম-নির্যাতন। যারা দ্বীনকে মানতে চায় পরিপূর্ণভাবে, কিন্তু বাধ্য হয়ে যখন গাইরে মাহরামের সামনে আসতে হয়, কাজিনদের সামনে আসতে হয়, তখন যেন এসব অবস্থা তাদের অন্তরে শূল হয়ে বিঁধে থাকে।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখন পর্দার খুব একটা গুরুত্ব নেই। বনেদি মুসলিম পরিবারগুলোতেও পর্দাকে এখন আর ফরজ বিধান বলে ধরা হয় না; বরং ক্ষেত্রবিশেষ এটা অনেকটা ফ্যাশন হিসেবেই পালন করা হয়। আবার অনেকেই মনে করেন, পর্দা শুধু হুজুরদের সাথেই করতে হয়, তাই পথেঘাটে হুজুর দেখলেই মাথায় ওড়না-আঁচল উঠে তাদের; কিন্তু অন্যদের বেলায় পর্দার কোনো বালাই থাকে না। বাইরের কেউ এলে পর্দার আড়ালে চলে যায় অনেকেই, কিন্তু নিজ ঘরের ভাসুর, দেবর, চাচাতো, ফুপাতো, মামাতো, খালাতো ভাই বা বেয়াইয়ের সামনে ঠিকই বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করে।

পর্দার এমন ভিন্নতা আমরা সমাজে অহরহ দেখতে পাই। আবার অনেকের ক্ষেত্রে শহরে একধরনের পর্দা হলেও গ্রামে গেলে পর্দার ধরন পাল্টে যায়। ঘরে পর্দা থাকলেও বাইরে গেলে পর্দার সুরত পরিবর্তন হয়ে যায়। পর্দার এই নানান ভিন্নতার কারণ কারও অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে, আবার কেউ জানা সত্ত্বেও অবহেলার কারণে করে থাকে। এই বইতে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শরয়ী পর্দার সুরত কী হতে পারে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পর্দার শুরু

একজন ছেলে বা মেয়ের পর্দার শুরু কখন থেকে হয়? এই প্রশ্নের জবাবে অনেকেই হয়তো বলবে ১৪-১৫ বছর থেকে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ২০ বছরেও একজন ছেলে বা মেয়ের পর্দার বয়স শুরু হয়নি; কারণ তখনো

সে অভিভাবকের চোখে ছোট্ট শিশু। মোটকথা নিজেদের চোখে যখন বড় মনে হবে তখনই পর্দার বয়স শুরু হবে, এর আগে পর্দার প্রয়োজন নেই, এমনটা ভাবা সম্পূর্ণ ভুল।

পর্দার শুরু কবে থেকে হবে এটা বোঝার আগে আমাদের পর্দার প্রয়োজনীয়তা জানা দরকার। পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে নিজের সম্ভ্রম-সতীত্বকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকের মধ্যে একধরনের আকর্ষণ দিয়েছেন, যার দ্বারা সে তার বিপরীত বস্তুর দিকে আকর্ষিত হয়। একটা বয়সে এসে একজন ছেলে যেমন নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, নারীর কোমল ছোঁয়া পেতে মুখিয়ে থাকে, ঠিক তেমনইভাবে একজন নারীও একটা বয়সে এসে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। আর এই আকর্ষণের শুরুটা হয় একে অপরকে দেখার মাধ্যমে। নারী-পুরুষ একে অপরের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টিপাত ও এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এই আকর্ষণকে দিন দিন তীব্র করে তোলে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষের ওপর পর্দা ফরজ করেছেন, যাতে অবৈধভাবে কেউ তার সেই আকর্ষণের অপব্যবহার করতে না পারে। এই চাহিদা ও আকর্ষণের সীমা পেরোতে না পারে।

পর্দার এই বিধান শুধু নারীর জন্যই নয়, বরং পুরুষের জন্যও পর্দার বিধি-বিধান রয়েছে। রয়েছে নির্দিষ্ট সতরের পরিসীমা।[২] প্রকাশ্যে একজন পুরুষ যে বস্ত্রহীন হয়ে, শরীর উদোম রেখে ঘোরাফেরা করবে, এই সুযোগ শরীয়ত দেয়নি। কারণ তার দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। একজন পুরুষকে এই অনুমতিও দেয়া হয়নি যে, সে গাইরে মাহরাম নারীর সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে; কারণ তার কণ্ঠের মধ্যেও একধরনের আকর্ষণ রয়েছে।

বর্তমানে যারা নারীবাদী বলে পরিচিত, যারা নিজেদের নারী অধিকার বাস্তবায়নে সোচ্চার বলে দাবি করে, ইসলামের ব্যাপারে তাদের বড় একটি অভিযোগ হলো, ইসলাম শুধু নারীর দেহকেই ঢেকে রাখতে বলে। কেন? নারী যেমন খুশি তেমন পোশাক পরিধান করবে, পুরুষ চোখ বন্ধ রাখলেই তো হয়। অথচ তারা যদি পর্দার বিধান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জানত, তাহলে এই অবান্তর কথা তাদের

---

২. সুনানে কুবরা, বাইহাকী, হাদীস : ৩২৩৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯৭; সুনানে দারা কুতনী, ১/৩২০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ২৫৩৪৯; হিদায়া : ১/৯২

মুখ দিয়ে বের হতো না।

শরীয়ত শুধু নারীকেই শরীর ঢেকে রাখতে বলেননি, বরং পুরুষকেও দেহের নির্দিষ্ট অংশ ঢেকে রাখতে বলেছে। শরীয়তের প্রতিটি বিধানের বাস্তব উপকারিতা রয়েছে। প্রত্যেক হুকুমেই বিশেষ হেকমত রয়েছে। পর্দার বিধানের মধ্যে নারী ও পুরুষকে সেসব অংশই ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর প্রতি একে অপরের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। এখন কেউ যদি দাবি করে যে, সেসব অঙ্গ দেখলে আমার কোনো আকর্ষণই হয় না, অথবা পরবর্তী সময় এই দৃশ্য আমার মাথায় খারাপ ভাবে আসে না, তাহলে তার এই দাবি অসত্যই বলা যায়। কারণ প্রত্যেক মানুষের এটাই স্বাভাবিক অভ্যাস যে, আকর্ষক অঙ্গ দেখলে সে অল্প-বিস্তর আকর্ষিত হবেই।

তাই নারীকে বলা হয়েছে সেসব অংশ ঢেকে রাখতে, আর পুরুষকে আদেশ করা হয়েছে তাদের চোখকে অবনত রাখতে। পুরুষকে ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, তুমি তোমার মনমতো সবকিছুই দেখতে পারো; না, তারও নির্দিষ্ট পর্দার বিধান রয়েছে। তদ্রূপ পুরুষকেও বলা হয়েছে দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ ঢেকে রাখতে, আর নারীকেও বলা হয়েছে তাদের চোখকে অবনত রাখতে।

এই পর্দার বিধানের সবচেয়ে বড় হেকমত এটাই যে, এর মাধ্যমে সমাজের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও খারাপ কাজের অধিকাংশই কমে যাবে। অনেক গুনাহের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে যদি সমাজে পর্দার বিধান পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত হয়।

সুতরাং বোঝা গেল, পর্দার শুরু এমন বয়স থেকেই হওয়া উচিত, যখন থেকে তার ভেতরে আকর্ষণশক্তি সৃষ্টি হবে।

ছেলেদের পর্দার বয়স

অনেকেই মনে করেন, ছেলেরা ১৫ বছর বয়সে বালেগ হয়। কথাটা পুরোপুরি সঠিক নয়। এমন একটা অস্পষ্ট কথার ওপর ভিত্তি করে অনেক পর্দানশীন পরিবারেও ১৫ এর কম বয়সি ছেলেদের সাথে পর্দা করা হয় না। বরং পর্দার কথা চিন্তাই করা হয় না। অথচ শরীয়তের বিধান হলো, ১৫ বছরের আগে স্বপ্নদোষ হলে কিংবা নাভির নিচের পশম ঘন হতে শুরু করলে কিংবা বীর্য নির্গত হলে যেকোনো ছেলে বালেগ হয়ে যায়। কিন্তু যে ছেলের মধ্যে এসব নিদর্শনের কোনোটিই প্রকাশ পায়নি, তার বয়স ১৫ হলে তাকে বালেগ ধরে

নেয়া হবে। মোটকথা বালেগ হওয়ার বাহ্যিক কোনো নিদর্শন না পাওয়া গেলে একটা ছেলেকে ১৫ বছর বয়সে বালেগ বলে গণ্য করা হবে। আর এর পূর্বেই যদি বালেগ হওয়ার নিদর্শনাবলির কোনোটি তার মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহলে যেদিন প্রকাশ পাবে সেদিন থেকেই ছেলেটিকে বালেগ বিবেচনা করা হবে এবং তার ব্যাপারে পর্দার বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। যদিও তখন তার বয়স পনেরোর কম হোক না কেন![৩]

উল্লেখ্য যে, বয়সের এই বিবেচনা চন্দ্র সন তথা হিজরী সন অনুযায়ী হবে। সৌরবর্ষ অনুযায়ী নয়।

এখন কথা হলো, ছেলেরা তাহলে কত বছর বয়স থেকে পর্দার অভ্যাস গড়তে শুরু করবে?

ছেলেদের পর্দায় অভ্যস্ত করে তোলার শুরুটা দশ বছর বয়স থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

'যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামাজ না পড়লে তাদেরকে শাসন করবে এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দেবে। যখন তোমাদের কেউ তার গোলাম কিংবা গৃহকর্মীকে বিয়ে করিয়ে দেবে, তখন থেকে তার সতরের অংশের দিকে তাকাবে না। আর তার সতর হলো নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত।'[৪]

এই হাদীসে ১০ বছর বয়সে বিছানা পৃথক করে দেয়ার ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বিবী রহ. বলেন, 'কেননা দশ বছর বয়সে পৌঁছার পর প্রবৃত্তির আকর্ষণ ফুটে

৩. রদ্দুল মুহতার, ৬/১৫৩-১৫৪, আলবাহরুর রায়েক, ৮/৮৫, তাবয়ীনুল হাকায়েক, ৫/২০৩
৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৭৫৬; সুনানে আবু দাউদ, ৪৯৬। সহীহ।

উঠতে থাকে।'[৫]

ফিকহের কিতাবাদিতেও একই মত রয়েছে।[৬]

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত হাদীসে পুরুষের সতরের উল্লেখ রয়েছে। পর্দার অভ্যাসের বয়স থেকে ছেলেদেরকে সতরের ব্যাপারে সচেতন করা চাই। এমনিভাবে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে মহিলারা ১০ বছর বয়সের পর বাচ্চাদের সতরের স্থান না ধরা এবং না দেখা চাই।

মেয়েদের পর্দার বয়স

মেয়েদের ক্ষেত্রে নয় বছর বয়সের কিছুটা আগ থেকেই পর্দার অভ্যাস করানো জরুরি।

আম্মাজান আয়েশা রাযি. বলেন,

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ

'কোনো মেয়ে যখন নয় বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন সে মহিলা বলে গণ্য হবে।'[৭]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আবদুর রহমান মুবারকপুরী রহ. লিখেছেন, 'আয়েশা রাযি.-এর কথার অর্থ হলো, একটি মেয়ে যখন নয় বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন সে বালেগা নারীর পর্যায়ে পৌঁছে যায়।'[৮]

ফিকহের কিতাবাদিতেও মেয়েদের জন্য নয় বছর বয়স হতে পর্দার কথা উল্লেখ রয়েছে।[৯]

নয় বছর বয়সে এসে কোনো মেয়ের যদি মাসিক শুরু হয়, তাহলে তো স্বাভাবিকভাবেই তাকে বালেগা এবং পর্দার উপযুক্ত বিবেচনা করা হবে। আর মাসিক শুরু না হলেও এ যুগের ফিতনা হিসেবে তার জন্য পর্দা শুরু করা জরুরি।

---

৫. মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৫১২
৬. রদ্দুল মুহতার, ৬/৩৮২
৭. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১১০৯।
৮. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৪/২০৮
৯. রদ্দুল মুহতার, ১/৪০৮, ৫৭৩; আহসানুল ফাতাওয়া, ৮/৩৮

এর কারণ দুটি :

প্রথমত, এখন থেকে অভ্যাস না করালে পরবর্তী সময়ে এটা অভ্যাস করাতে কষ্ট হবে। ছোটবেলায় শিশুদের যা শেখানো হয়, বড় হলে সেটা সে এমনিতেই করে ফেলে।

দ্বিতীয়ত, আর এটাই অন্যতম কারণ, ছোট অবুঝ মেয়েদের সাথে কোনো দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অযাচিত কোনো কিছু করতে চাইলে সহজেই করতে পারে। কারণ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের সাথে অযাচিত কিছু সহজেই করা যায় না, তারা বাধা দিতে পারে। কিন্তু ছোট অবুঝ শিশু তো কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই শিশুদের ভুলিয়ে ভালিয়ে অযাচিত কিছু করার ঘটনা আমাদের সমাজে অসংখ্য দেখা যায়।

এ জন্য আবশ্যক হলো, একেবারে ছোট থেকেই সন্তানকে সুন্নাহ মোতাবেক এমন পোশাক পরিধান করানো, যাতে শৈশব থেকেই সতর ও পর্দার ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মাঝে একটা নৈতিক অভ্যাস গড়ে ওঠে। অন্য কারও সামনে তাকে একেবারে বস্ত্রহীন না রাখা। বিশেষ করে মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে এটা খেয়াল রাখা জরুরি।

সন্তানকে পর্দার বিধানে অভ্যস্ত করার ক্ষেত্রে ঘরের মা-বোনদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের মহিলাগণ যদি পরিপূর্ণ পর্দা করেন, তাহলে তাদের দেখাদেখি সন্তানও পর্দায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ঘরের মহিলারা যদি গাইরে মাহরামদের সাথে পর্দা রক্ষা না করেন, তাহলে শৈশব থেকেই সন্তানের মনে এটা বসে যাবে। সন্তান বুঝবে, পরপুরুষের সাথে পর্দা বলতে কিছুই নেই। এ থেকে একটা কথা বলতেই হয়, আদর্শ জাতি গড়ে তুলবার জন্য একজন আদর্শ দ্বীনদার মায়ের প্রয়োজন। যদিও আমরা এটাকে এভাবে বলে থাকি, তুমি আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেব। কিন্তু দ্বীনহীন শিক্ষিত মা কখনোই আদর্শ জাতি তৈরি করতে পারবে না। যে শিক্ষায় দ্বীন নেই, সে শিক্ষা নিজেও আদর্শবান নয়, অন্য কাউকেও আদর্শবান বানাতে পারে না। তাই কথাটির সঠিক রূপ হলো, তুমি আমাকে একজন দ্বীনদার শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেব।

মেয়েশিশুর ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় একটি বিষয় হলো, নিজের পরিবারের লোক

ছাড়া অন্য কারও সাথে একাকী ঘুরতে যেতে না দেয়া। পাশের ফ্ল্যাটের চাচ্চু, এলাকার বড় ভাই, বাসার সামনের দোকানদার, বাড়ির কেয়ারটেকার, দূর সম্পর্কের ভাই, এদের সাথে একাকী কোথাও যেতে না দেয়াই উত্তম। হোক না মেয়ে একেবারেই ছোট।

আমাদের দেশেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ছোট শিশুর ওপরও পাশবিক নির্যাতনের সংবাদ আমরা বহুবার পড়েছি। শুধু ২০২৩ সালের এই প্রথম কয়েক মাসের সংবাদ হলো, শিশু অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠন শিশু অধিকার ফোরামের তথ্যমতে, গত পাঁচ বছরে শিশু ধর্ষণের ঘটনা বাড়ার হার আশঙ্কাজনক। গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রথম ছয় মাসে শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা এবং শিশুদের ওপর অন্যান্য যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। এ বছর জুলাই পর্যন্ত প্রথম সাত মাসে ৫৭২ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে অন্তত ২৩ জনকে। এতে বলা হয়েছে, ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে ৮৪ জন শিশুর ওপর এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৭৫ জন শিশু। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলছে, সারাদেশে চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) ৪৪৫ শিশু হত্যার শিকার হয়েছে। গত বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) শিশুর প্রতি সহিংসতা হয়েছে এক হাজার ৯৯৬টি।[১০]

এমনকি শিশুর কাজিনদের সাথেও ওঠাবসার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। নিজের আত্মীয়ের দ্বারা পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এমন শিশুর সংখ্যাও ঢের কম নয়। তাই কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগে সাবধান থাকাই উত্তম।

ছেলেদের ক্ষেত্রে ১০ বছর বয়স থেকেই গাইরে মাহরামদের সাথে পর্দা করার অভ্যাস করা উচিত, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও শরীয়তের বিধান হলো, সাবালক হওয়ার পর থেকেই পর্দার বিধান আরোপিত হবে। কিন্তু আধুনিক যুগে ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রচার এবং অশ্লীলতার মাধ্যমগুলোর সহজলভ্যতার কারণে অনেক সন্তানই এখন সাবালক হওয়ার আগেই বুঝমান হয়ে যায়। তখন থেকেই তাদের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই মোটামুটি বুঝ হওয়ার পর থেকেই গাইরে মাহরামের সামনে যাওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। এ ব্যাপারে অনেক অভিভাবক গাফলতির পরিচয় দেন। ছেলে সন্তানের বয়স ১৪-১৫

---

১০. বাংলা ট্রিবিউন, সোমবার, ০৮ মে ২০২৩, ২৫ বৈশাখ ১৪৩০

হওয়ার পরও সে তার ভাবির সাথে, মামির সাথে, কাজিনদের সাথে, পাশের বাড়ির আন্টির সাথে দেখা করছে। তাদের সাথে হাসিঠাট্টা করছে।

অনেক অভিভাবক মনে করেন, সন্তান যাদের সামনে ছোট থেকেই লালিতপালিত হলো, যাদের কোলে কোলে বড় হলো, তাদের সাথে পর্দার করার কী দরকার! এর কারণ হিসেবে ভাবা হয়, তাদের সাথে তো কোনো সমস্যা হবে না। কারণ তারা তো ছোট থেকেই ওকে নিজের সন্তানের মতো দেখে এসেছে। কিন্তু এর কারণে সন্তান পর্দার বিধানের ব্যাপারে ছাড় পেয়ে গেল; ফলে পরবর্তী সময়ে এ-সংক্রান্ত যাবতীয় গুনাহের দায়ভার অভিভাবকের ওপরও বর্তাবে। কারণ অভিভাবক হিসেবে তারা ছোট থেকেই সন্তানকে দ্বীনের অন্যতম ফরজ বিধান পর্দার ব্যাপারে গাফলতিতে রেখেছেন।

বাচ্চাকে পর্দার জন্য উৎসাহ দেয়া

অনেক দ্বীনদার বা সদ্য দ্বীনে ফেরা পরিবারে দেখা যায়, বাচ্চাদের পর্দার ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিলেও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে তারা এ ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এসব ক্ষেত্রে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে। যেমন :

১. বাচ্চাকে এ কথা বোঝানো যে, এখন থেকে পর্দা শুরু করলে তুমি আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়জনে পরিণত হতে পারবে।

২. তুমি তো মাশাআল্লাহ এখন বড় হয়ে গিয়েছ। তুমি এখন থেকে দ্বীনের ফরজ বিধানগুলো পালন করবে। নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, পর্দা করবে।

৩. তোমার জন্য লিখে রাখা জান্নাতের খালি জমিন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি একেকটা আমল করবে আর জান্নাতে তোমার জন্য একেকটা নিয়ামতের ব্যবস্থা হবে।

৪. ঘরে নিয়মিত তালিমের মাধ্যমে বাচ্চার সামনে দ্বীন মানার গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরা।

৫. নিজে নামাজ, সদকা ও দুআর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দরবারে বাচ্চার জন্য দুআ করা।

মাহরামের সামনে নারীর সতর

গাইরে মাহরামের সামনে নারীর পুরো শরীরই সতর।[১১]

আর মাহরাম পুরুষের জন্য মহিলার মাথা, চেহারা, হাত, গলদেশ ও হাঁটুর নিচের অংশ সতর নয়। তবে তাদের সামনেও যতটুকু সম্ভব আবৃত থাকাই উত্তম।[১২] বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বসরী রহ. বলেছেন, 'নিজ ভাইয়ের সামনেও নারীর ওড়না ছাড়া থাকা উচিত নয়।'[১৩]

প্রখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. বলেছেন, 'মাহরাম পুরুষের সামনে মেয়েদের মাথা ঢেকে রাখাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। অবশ্য মাহরাম তা দেখে ফেললে গুনাহ হবে না।'[১৪]

অনেক নারী নিজের ছেলে বা ভাইয়ের সামনে অযাচিত পোশাক পরিধান করেন। প্রচণ্ড গরমে কেউ কেউ শরীরের কাপড় এমনভাবে পরেন, যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। তারা মনে করেন, ঘরে তো গাইরে মাহরাম কেউ নেই।

নিজের ঘরে কাজ করার সময় নারীদের সতর্ক থাকা চাই। যাতে একটু অসতর্কতাবশত সতর উন্মুক্ত না হয়ে যায়। বসে কাজ করার সময় বা ঘর মোছার সময় সতর উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নিচে কিছু পড়ে গেলে সামনের দিকে ঝুঁকে ওঠানো ঠিক না, এতে বুকের ওপর থেকে ওড়না সরে গিয়ে সতর উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উচিত হলো, ভালোভাবে বসে এরপর তা ওঠানো।

মনে রাখতে হবে, পর্দার বিধান ছাড়াও নারীদের আরও একটি বিষয় লক্ষ রাখা আবশ্যক, তা হলো নিজের আত্মমর্যাদা ও শালীনতা। এতটুকু বোধ একজন নারীর ভেতর থাকলে সে নিজেই বুঝবে, কোন পরিবেশে কীভাবে পর্দা করতে হবে। কীভাবে নিজের শালীনতা রক্ষা করা যাবে। আর এই বুঝ যার নেই, সে-ই উদোম হয়ে চলাফেরা করতে পছন্দ করে।

এ কথাও মনে রাখতে হবে, টাখনু পর্যন্ত পা, কবজি পর্যন্ত হাতের পাতা এবং চেহারা মৌলিক সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে তা নামাজের সময় খোলা রাখা

---

১১. সূরা নূর, (২৪)৪ : ৩১; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪১০১। সহীহ। আবু বকর খাল্লাল, আহকামুন নিসা, ৩১-৩৩

১২. কিতাবুল আসল, ৩/৪৮; বাদায়েউস সানায়ে, ৪/২৯১

১৩. মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ১৭২৮১

১৪. মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ১৭২৭৯

যাবে।[১৫] কিন্তু এসব অঙ্গ পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ফলে গায়রে মাহরাম ও পরপুরুষের সামনে তা খোলা রাখা যাবে না।

চেহারার পর্দা ও কিছু কথা

পর্দা ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধান। পর্দা নারীর সতীত্ব, চরিত্র ও মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলা ও ইসলামের সুমহান আদর্শ সমুন্নত রাখার এক অনন্য অনুশাসন। বর্তমান আধুনিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে পড়ে আমাদের মুসলিম সমাজব্যবস্থায় পর্দার প্রতি উদাসীনতা উদ্বেগজনকহারে বেড়ে চলেছে। যে সকল মা-বোনেরা পর্দা করাকে জরুরি মনে করেন, তাদের অধিকাংশই আবার চেহারার পর্দার প্রতি চরম উদাসীন।

বেশ কয়েক বছর আগে বিশ্বের অন্যতম ইলমি মারকাজ, ইসলাম ও মুসলমানদের ঈমান, আমল, তরবিয়ত ও আখলাকের অতন্দ্র প্রহরী 'ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ' হতে প্রকাশিত 'মাসিক দারুল উলুম' এর জুলাই-আগস্ট ২০১৩ সংখ্যায় 'بے پردگی کے نقصانات' 'বেপর্দার ক্ষতিসমূহ' শিরোনামে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধকার হযরত মাওলানা শফিক আহমদ কাসেমী হাফিজাহুল্লাহ।

নিম্নে বাংলা ভাষার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য প্রবন্ধটির পরিশীলিত অনুবাদ তুলে ধরা হলো। পাশাপাশি মাসিক আলকাউসার পত্রিকায় প্রকাশিত নারীদের পর্দা বিষয়ক একটি প্রবন্ধের সারনির্যাসও তুলে ধরা হলো।

আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যিনি আমাদের ইসলামের মতো নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং এমন এক শরীয়ত দান করেছেন, যাতে সঠিক ধর্ম-বিশ্বাস, উত্তম চরিত্র এবং পূত-পবিত্র কর্ম-নৈপুণ্যের সুমহান শিক্ষার সন্নিবেশ রয়েছে। সেই সাথে এতে শিরক, বিদআত, দুশ্চরিত্র এবং নির্লজ্জতার প্রতি অতীব গুরুত্ব সহকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি পদে পদে ইলম, আমল ও রীতিনীতির অনুশাসনের সৎ ও পবিত্র জীবনযাপনের বিন্যাস দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার প্রভৃতির প্রতি কঠোর শৃঙ্খল আরোপ করা হয়েছে।

---

১৫. রদ্দুল মুহতার, ১/৪০৪

পাক-পবিত্র জীবন ও পরিচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীসমাজকে ঘরে রেখে ঘরোয়া দায়দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, আর পুরুষকে বাইরের দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নারী-পুরুষের পারস্পরিক মেলামেশার অপদ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে। যাতে একটি পবিত্র পরিশীলিত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিম সমাজব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যাবলি আবহমান কাল যাবৎ চলে আসছিল। কিন্তু বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ লজ্জা বিসর্জনের বিজাতীয় স্রোত, বরং আক্রমণে, আমাদের সমাজব্যবস্থা খুব খারাপভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখ ও সীমাহীন পরিতাপের বিষয় হলো, এর প্রতিবাদ, অশ্লীলতার মূলোৎপাটন বা এই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পরিবর্তে কতিপয় মুসলিম পণ্ডিত(!) এই চলাফেরাকে জায়েয আখ্যা দেয়ার চেষ্টায় ব্রত রয়েছেন। কেউ কেউ তো চেহারার পর্দাকে অপ্রয়োজনীয় বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং দ্বীনের অংশ মনে করেই এই দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছেন যে, চেহারা, হাত ও পা খোলা রাখা যায়।

বর্তমান বাস্তবতার এই করুণ দৃশ্যপটের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে চেহারার পর্দা-বিষয়ক কিছু তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করছি।

কুরআনের আলোকে চেহারার পর্দা

১. পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে যথাক্রমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ
اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ
اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ
اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ
اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا

يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

'(পুরুষ) মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে তা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক—যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ—তাদের ব্যতীত কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[১৬]

উপরিউক্ত আয়াত দুটির প্রথমটিতে বলা হয়েছে, 'يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ' অর্থাৎ মুমিন পুরুষগণ যেন তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ' অর্থাৎ মুমিন নারীগণ যেন তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

উপরিউক্ত বাক্যদ্বয় দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি পর্দার বিধান আরোপ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীসে অধিকহারে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা সর্বজন জ্ঞাত যে, যৌনাঙ্গের হেফাজত কেবল চেহারার পর্দা দ্বারাই হতে পারে। আর সতীত্ব হরণের সূত্রপাত চেহারার বেপর্দা থেকে শুরু হয়ে ব্যভিচার পর্যন্ত গড়ায়।

প্রসিদ্ধ এক হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

১৬. সূরা নূর, (২৪) : ৩০-৩১

الْعَيْنَـانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَـدَانِ تَزْنِيَـانِ، وَالْفَرْجُ يُصَـدِّقُ ذَلِكَ، أَوْ يُكَذِّبُهُ

'চক্ষুদ্বয়ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয় (কুদৃষ্টি দেয়), দুই হাতও ব্যভিচারে লিপ্ত হয় (হারামভাবে স্পর্শ করে), আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়ন করে (বাস্তবে রূপ দেয়) অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (বাস্তবে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়)।'[১৭]

২. সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে, 'وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ' অর্থাৎ তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশের ওপর ফেলে রাখে। উদ্দেশ্য হলো, মাথার ওড়না দ্বারা যেন মাথা থেকে শুরু করে চেহারা এবং গলা ঢেকে বুকও ভালোভাবে ঢেকে রাখে। আয়াতের দ্বারা যদি শুধু বুক ঢাকাও উদ্দেশ্য হয়, তবুও ইঙ্গিতবহ অর্থের দরুন উত্তমরূপেই চেহারার পর্দা প্রমাণিত হয়। কেননা, চেহারাই মূল সৌন্দর্য এবং ক্ষতির বস্তু। রূপবতী কিংবা কুৎসিত হবার মাপকাঠি তো ওই চেহারাই। সুতরাং চেহারার পর্দা খুব ভালোভাবেই প্রমাণিত।

৩. উল্লেখিত আয়াতের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا' অর্থাৎ তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। অপর জায়গায় মাহরাম ও পর্দার হুকুম-বহির্ভূতদের তালিকা বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয়েছে, 'وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ' অর্থাৎ তারা যেন উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কারও কাছে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর তাফসীর অনুযায়ী لا ما ظهر منها বাক্য দ্বারা বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেটা আল্লাহর দেয়া সৌন্দর্য, যেমন : চেহারা, হাত ইত্যাদি। বা কৃত্রিম সৌন্দর্য, যেমন : দৃষ্টিনন্দন পোশাক কিংবা বোরকা যা-ই হোক না কেন।

আর 'وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ' বাক্য দ্বারা ভেতরের সৌন্দর্য বোঝানো হয়েছে।[১৮]

অর্থাৎ সার্বিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরিচিত বা গাইরে মাহরামের সামনে বাহ্যিক সৌন্দর্য, যেমন : পোশাকি সাজসজ্জা, চেহারা বা

---

১৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৫৩৯; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৭

১৮. আহকামুল কুরআন যাসসাস, ৩/৪০৮। ইবনে মাসউদ রাযি. হতে।

হাত-পা প্রকাশ হয়ে গেলে তা মাফ। এবং ভেতরের সৌন্দর্যকে গোপনের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাহরাম কিংবা আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের সামনে অনিচ্ছাকৃত বা অতিপ্রয়োজনে তা প্রকাশ পেলে মাফ।

উল্লেখ্য যে, 'إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا' এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যেন প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ সতর্ক থাকবে। এখানে 'إِلَّا مَا اظْهَرْنَ' অর্থাৎ 'তারা যেন প্রকাশ না করে' জাতীয় বাক্য না এনে সদা সতর্ক থাকার জন্য প্রথমোক্ত বাক্যটি দ্বারা নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই।

৪. উল্লেখিত আয়াতের শেষ দিকে আরও বলা হয়েছে,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

অর্থাৎ তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশের জন্য জোরে পদচারণা না করে।

মেয়েদেরকে সজোরে পদচারণায় জমিনে চলতে নিষেধ করার কারণ হলো নূপুর-নিক্কণ ইত্যাদির মধুর ঝংকারে কেউ যেন আকৃষ্ট না হয়।[১৯] এখন কথা হলো সজোরে পদচারণায় চলা নারী কালো-ফরসা, যুবতি-বৃদ্ধা এবং রূপসি বা কুৎসিত যেকোনো ধরনেরই হতে পারে। যদি পায়ের আওয়াজকেই পর্দায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে একজন সুন্দরী, রূপসি, যুবতি মেয়ে মেকআপ, পাউডার ও অন্যান্য স্পর্শকাতর সাজসজ্জাসহ উন্মুক্ত চেহারায় ঘোরাফেরা করা জায়েয হবে? অসম্ভব, এটা কখনোই হতে পারে না।

৫. সূরা নূরের ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ؕ وَأَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না

১৯. তাফসীরে আবদুর রাজ্জাক, ২০৩৪; তাফসিরে ইবনে কাসীর, ৬/৪৬

করে তাদের (পর্দার) বস্ত্র খুলে রাখে, তাদের জন্য দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[২০]

আয়াতটিতে বৃদ্ধা রমণী, যাদের বয়স বলতে গেলে শেষ এবং তাদের মধ্যে কোনোরূপ আবেদনও আর বাকি নেই[২১], পবিত্র কুরআনে শুধু তাদেরকে 'فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ' 'তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে (পর্দার) বস্ত্র খুলে রাখে, তাদের জন্য দোষ নেই।' বাক্য দ্বারা একটি বয়সে এবং শর্তসাপেক্ষে চেহারা খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[২২] কিন্তু এর পরের অংশেই বলা হয়েছে, 'وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ' 'তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।' এই বাক্যে বৃদ্ধা রমণীদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, চেহারা ঢেকে রাখাই তোমাদের জন্য সার্বিকভাবে উত্তম।[২৩] তা ছাড়া উক্ত আয়াতে 'اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ' (চেহারা খোলা রাখার অনুমতি) দ্বারা সম্পূর্ণ কিংবা অর্ধেক কাপড় খোলা রাখার অনুমতি কুরআনে তো দেয়ইনি, বরং সমাজও দেয়নি। এমনকি কোনো ব্যক্তি এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা করেনি, এখানে শুধু চেহারা খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বৃদ্ধা, শুধু বৃদ্ধা রমণীদের চেহারা খোলা রাখার অনুমতি দেয়ায় এ কথা স্পষ্ট যে, এর চেয়ে কম বয়সি ন্যূনতম আবেদনের অধিকারিণী কোনো নারীর জন্য কোনোভাবেই চেহারা খোলা রাখা জায়েয নেই।

৬. উপরোল্লেখিত পর্দা-বিষয়ক আয়াতসমূহের তাফসীরে রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, মুসলমান নারীকে যখন কোনো অপারগতার দরুন বাইরে যেতে হয়, তখন তিনি 'জিলবাব' অর্থাৎ বড় চাদর জাতীয় কাপড় মাথার ওপর থেকে এমনভাবে জড়িয়ে নেবেন, যেন তার চেহারা, ঘাড়, গলা ও বুক পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যায়। রাস্তা দেখার জন্য (প্রয়োজনে) একটি মাত্র চোখ খোলা রাখতে পারবেন।[২৪] কারণ শরীয়াহর

---

২০. সূরা নূর, (২৪) : ৬০

২১. বয়সের কারণে যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা আর বিবাহের উপযুক্ত নেই। তাফসীরে আবদুর রাজ্জাক, ২০৫৮; তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ১৪৮৩১

২২. তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ১৪৮৪৪-৪৮

২৩. তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ১৪৮৫৩-৫৭

২৪. দ্রষ্টব্য : তাফসীরে তাবারী, ২০/৩২৪; তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ১৭৭৮৩; তাফসীরে ইসহাক আল-বুসতী, ১/১০৭

একটি মূলনীতি হলো, 'أَنَّ الضَّرُورَةَ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا' 'প্রয়োজন সব সময় তার পরিমাণ অনুযায়ী বৈধতা রাখে।'[২৫]

সাহাবীগণের তাফসীর শুধু প্রমাণই নয়, বরং কোনো কোনো আলেমের মতে তা উঁচু মানের নির্ভরযোগ্য হাদীসের মর্যাদা রাখে।[২৬] হযরত উম্মে সালমা রাযি. থেকে বর্ণিত, যখন পর্দার আয়াত নাযিল হলো, তখন আনসারী মহিলাগণ এত বিনয় ও নম্রতার সাথে মাথায় চাদর (নেকাব) পরে বের হতেন, যেন তাদের মাথার ওপর কাক বসে আছে এবং তা সামান্য নড়াচড়াতেই উড়ে যাবে।[২৭]

৩. সূরা আহযাবে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ব্যাপারে আদেশ করেছেন,

> وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .
>
> যখন তোমরা নবী-পত্নীদের কাছে কোনো সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।[২৮]

প্রখ্যাত মুফাসসির যাজ্জাজ রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত দ্বারা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে।[২৯]

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার আদেশ সরাসরি নবী-পত্নীগণের ব্যাপারে হলেও অন্যান্য নারীদের ক্ষেত্রেও এই আদেশ প্রযোজ্য। আল্লামা জাসসাস রহ. বলেন, এ বিধানটি যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বিবিগণের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, তবে বিধানটি সবার ক্ষেত্রে সমান। কেননা আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণে আদিষ্ট। তবে যা তাঁর জন্য খাছ সেটি ভিন্ন বিষয়।[৩০]

---

২৫. নিহায়া, ২০/১৯৮; আল-মুহাযযাব, ৪/১৭৩১
২৬. মুসতাদরাকে হাকিম, ১৯৮৮, ৩০২১; মুকাদ্দামায়ে ইবনে সালাহ, ১২৪
২৭. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১০১। হাসান সহীহ।
২৮. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৫৩
২৯. মাআনিল কুরআন, যাজ্জাজ, ৪/২৩৫
৩০. আহকামুল কুরআন, জাসসাস, ৩/৭১

ইমাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম রাহ. বলেন, এ আয়াত দ্বারা নবী-পত্নীগণ ও সকল নারীকে পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে।[৩১]

অনেকেই বলেন, এই আয়াত শুধু নবী-পত্নীদের জন্যই খাস ছিল। জবাবে প্রখ্যাত মুফাসসিরগণের মত উল্লেখ করা ছাড়াও আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো, আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, পর্দার এই হুকুমটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতার পবিত্র। অর্থাৎ এই হুকুম ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য অধিকতর সহায়ক হবে। আর এটা তো বলাই বাহুল্য যে, উম্মাহাতুল মুমিনীনগণ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী ছিলেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সুহবত পেয়েছেন। তাই তাদের জন্য ফিতনায় পতিত হওয়া এতটা সহজ ছিল না। উপরন্তু আমাদের ঈমান ও তাকওয়ার চেয়ে তাঁদের ঈমান ও তাকওয়ার স্তর ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। সুতরাং তাঁদেরকেই যদি পুরোপুরি পর্দায় থাকার আদেশ দেয়া হয়, গাইরে মাহরামের সামনে চেহারা খোলা রেখে নয়; বরং পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার আদেশ দেয়া হয়, তাহলে এই ফিতনার যুগে এই আদেশ তো আরও কঠোরভাবে পালন করা উচিত।

৪. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ.

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের (জিলবাব) চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়।[৩২]

লক্ষ করুন, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমনটা বলেননি যে, নারীরা যেন জিলবাব পড়ে। বরং তিনি ইরশাদ করেছেন, তারা যেন জিলবাবের কিছু অংশ মুখের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, নারীদের চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত।

আর এই আয়াত শুধু উম্মাহাতুল মুমিনীনদের উদ্দেশে নাযিল হয়নি; বরং উম্মতের সমস্ত নারীকেই এই আদেশ দেয়া হয়েছে।

---

৩১. তাফসীরে ইবনে আব্দুস সালাম, ৫/৫৭

৩২. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৫৯

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাযি. বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ মুমিনদের নারীদেরকে আদেশ দিয়েছেন, তারা যখন ঘর থেকে বের হবে তখন তারা পুরো চেহারা ঢেকে বের হবে। তবে শুধু এক চোখ খোলা রাখবে।[৩৩]

এর দ্বারা আমরা বুঝলাম, সাহাবায়ে কেরামের যুগেও চেহারা ঢেকে রাখাকে পর্দার অংশ হিসেবে গণ্য করা হতো। এখন আমরা তাঁদের পরবর্তী যুগ অর্থাৎ তাবিয়ীদের মতামত দেখতে পারি।

এই আয়াতের ব্যাপারে তাবিয়ীগণের তাফসীর

১. বিখ্যাত তাবিয়ী আবীদা আস সালমানী রহ.। যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দুই বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেননি। পরবর্তীকালে তিনি আলী রাযি. ও ইবনে মাসউদ রাযি.-এর কাছে ইলম অর্জন করেন। এবং তাঁদের সেরা ছাত্রও ছিলেন। মোটকথা সাহাবীদের পরে তিনি ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। আরেক বিখ্যাত তাবিয়ী ইবনে সীরীন রহ. তাকে ওপরে বর্ণিত আয়াত অর্থাৎ নারীরা কীভাবে জিলবাব তাদের চেহারার ওপর ঝুলাবে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আবীদা রহ. নিজের মাথা ও চেহারা থেকে শুধু বাম চোখ খোলা রেখে দেখিয়ে দেন।[৩৪]

২. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. বিখ্যাত তাবিয়ী ছিলেন। উম্মাহাতুল মুমিনীনদের কোলে বড় হয়েছেন। বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছে। তাকে বসরা নগরীর শ্রেষ্ঠ তাবিয়ীও বলা হয়। তিনি এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন,

নারীরা বের হওয়ার সময় এক চোখ ছাড়া পুরো চেহারা ঢেকে নেবে।[৩৫]

৩. সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের অন্যতম আরেক ছাত্র তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে জুবায়ের। ইলম, আমল, প্রজ্ঞায় তিনি যুগশ্রেষ্ঠ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন,

---

৩৩. তাফসীরে তবারী, ২০/৩২৪
৩৪. তাফসীরে তবারী, ২০/৩২৫
৩৫. মাআনিল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৩৪৯

তারা নিজেদের ওপর জিলবাবের কিছু অংশ ওড়নার ওপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেবে। কোনো নারীর জন্য এটা বৈধ নয় যে, এভাবে ওড়নার ওপর থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া ছাড়া পরপুরুষ তাকে দেখবে। কাপড়টি দিয়ে সে তার মাথা ও গলা ভালোভাবে বেঁধে নেবে।[৩৬]

লক্ষ করি, তিনি বলেছেন, ওড়নার ওপর থেকে চাদর ঝুলিয়ে দেবে। এরপর মাথা ও গলা বেঁধে নেবে। অর্থাৎ, চাদরটি মাথার ওপর থেকে ঝুলিয়ে গলা পর্যন্ত আসবে। আর এতেই তো পুরো চেহারা ঢাকা হয়ে গেল।

পরবর্তী মুফাসসিরগণের তাফসীর

১. প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা যামাখশারী রাহ. বলেন,

আয়াতের অর্থ হলো, তারা নিজেদের ওপর জিলবাব ঝুলিয়ে দেবে এবং চেহারা ঢেকে নেবে।[৩৭]

২. আবু হাইয়ান রাহ. বলেন, জিলবাব ঝুলিয়ে দেয়া মানে, পুরো শরীর ঢেকে নেয়া। অথবা উদ্দেশ্য হলো, চেহারা ঢাকা। কারণ, জাহেলী যুগে নারীদের চেহারাই খোলা থাকত।[৩৮]

৩. আল্লামা বায়যাবী রাহ. বলেন, প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে তারা তাদের চাদর দিয়ে নিজেদের চেহারা ও শরীর ঢেকে নেবে।[৩৯]

এখানে অল্পকিছু তাফসীর উল্লেখ করা হলো, অন্যথায় সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী মুফসসীরগণের তাফসীর উল্লেখ করতে গেলে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি বই হয়ে যাবে।

হাদীসের আলোকে চেহারার পর্দা

১. খায়বার যুদ্ধের পর যখন দাস-দাসী বণ্টন হয়, তখন সাহাবী দিহইয়া রাযি.-এর ভাগে একজন সুশ্রী নারী আসে। সে ছিল খায়বার গোত্রপতির মেয়ে। নাম হলো সাফিয়্যাহ। যেহেতু গোত্রপতির মেয়ে, তাই বিজয়ীদের প্রধানের ঘরে

---

৩৬. তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, ১৩/১০৪

৩৭. তাফসীরে কাশশাফ, ৩/৫৬০

৩৮. আলবাহরুল মুহীত, ৭/২৫০

৩৯. তাফসীরে বায়যাবী, ৪/৩৮৬

গেলেই তার সম্মান। তাই সাহাবায়ে কেরাম নবীজীকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন সেই নারীকে দিহইয়া থেকে কিনে নেন। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিহইয়া থেকে কিনে নিলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর বলতে লাগলেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাঁদি হিসেবে গ্রহণ করবেন, নাকি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবেন? এরপর নিজেরাই বলতে লাগলেন, যদি তিনি তাকে পর্দার আড়াল করেন, তাহলে তিনি উম্মুল মুমিনীনদের একজন; আর পর্দার আড়াল না করলে দাসী।

কারণ, দাসীদের চেহারার পর্দা আবশ্যক নয়। এরপর যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় রওয়ানা করেন, তখন তাকে তাঁর বাহনের পিছনে উঠান এবং পর্দা টেনে নেন।

মদীনার কাছাকাছি যাওয়ার পর তাদের বাহন পা পিছলে পড়ে যায়, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত সাফিয়্যা রাযি. উভয়েই পড়ে যান। বর্ণনাকারী সাহাবী আনাস রাযি. বলেন, তখন আমাদের কেউ না নবীজীর দিকে তাকিয়েছে, না সাফিয়্যার দিকে।

পড়ে যাওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত উঠে যান এবং সাফিয়্যাকে ঢেকে দেন। এরপর আমরা নবীজীর কাছে এগিয়ে আসি। তখন তিনি বললেন, না, আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি।[৪০]

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বাহনে ওঠানোর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা রাযি.-কে পর্দায় ঢেকে দেন। যখন বাহন থেকে পড়ে যান তখনো তিনি দ্রুত উঠে গিয়ে সাফিয়্যাকে ঢেকে দেন। ভাবনার বিষয়, পরপুরুষের সামনে নারীদের চেহারা ঢাকার গুরুত্ব ও বিধান কেমন ছিল? দুর্ঘটনার সময়ও নবীজী সর্বপ্রথম স্ত্রীকে পর্দায় আবৃত করে নিলেন। আর সাহাবীরাও উম্মুল মুমিনীনের দিকে তাকাননি। নারীদের চেহারা যদি পর্দার অন্তর্ভুক্ত না-ই হতো, তাহলে দুর্ঘটনার সময়ও তড়িঘড়ি করে চেহারা ঢাকার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

২. ইফকের ঘটনা কুরআন ও হাদীসে প্রসিদ্ধ। হাদীসের বহু কিতাবে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেই ঘটনার একটি অংশ হলো, আয়েশা রাযি. যখন কাফেলা

---

৪০. সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৭১, ৪২১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৪৯৭, ৩৫০০

হারিয়ে নির্জন প্রান্তরে একা ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন সকাল বেলা সাফওয়ান ইবনে মুওয়াত্তাল রাযি. সেখানে পৌঁছেন। যাকে সৈন্যদলের পেছনে চলার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। যাতে তিনি কাফেলা থেকে পড়ে যাওয়া কোনো জিনিস তুলে নিতে পারেন। তখনকার পরিস্থিতির ব্যাপারে আয়েশা রাযি. নিজেই বলেছেন,

তিনি এগিয়ে আসেন এবং আমাকে দেখেই চিনতে পারেন। কেননা, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছেন। আমাকে দেখেই 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েন। আমি তার 'ইন্না লিল্লাহ' শুনে জেগে যাই। তাকে দেখামাত্রই আমি জিলবাব দ্বারা আমার চেহারা ঢেকে ফেলি।[৪১]

চেহারা যদি পর্দার অন্তর্ভুক্ত না হতো, তাহলে এত বিপদের মুহূর্তেও আয়েশা রাযি. জিলবাব দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলতেন না। আরও ভাবনার বিষয় হলো, আয়েশা রাযি. বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেছে, সে হিসেবে আমাকে চিনেছে।

তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরনারীরা পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখত না।

৩. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা মুহাজির নারীদের প্রতি রহম করুন। যখন এ আয়াত নাযিল হয়,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ.

> তারা (নারীরা) যেন তাদের জামার গলার কাটা অংশে খিমার তথা ওড়নার আঁচল নামিয়ে দেয়।[৪২]

তখন তারা বড় চাদর কেটে ওড়না বানিয়ে ওইভাবে পরে।[৪৩]

নারী সাহাবীগণ ওড়না কীভাবে পরতেন, হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, তারা তাদের চেহারা ঢেকে নেন।[৪৪]

---

৪১. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৭০
৪২. সূরা নূর, (২৪) : ৩১
৪৩. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৫৯
৪৪. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ৮/৪৯০

আল্লামা আইনী রাহ. বলেন, তারা ওই কাটা কাপড় দিয়ে তাদের চেহারা ঢেকে নেন।[৪৫]

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আল-আনসারী রাহ. বলেন, তাদের প্রত্যেকে সে কাটা কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে নেন।[৪৬]

এ হাদীসে যে আয়াত উল্লেখিত হয়েছে, তা নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট হিসেবে ইমাম ফাররা বলেন, জাহেলী যুগের নারীরা ওড়না পরে পেছনে ঝুলিয়ে দিত আর তাদের সম্মুখভাগ খোলা থাকত। এ আয়াতে তাদেরকে ঢেকে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে।[৪৭]

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

'যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে, তখন তার জন্য ওই নারীকে দেখা দূষণীয় নয়।'[৪৮]

এই হাদীসে শুধু বিবাহের প্রস্তাব দানকারী পুরুষের জন্য অপরিচিতা নারীকে দেখা দোষমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্যদের দেখা এবং দেখানো উভয়ই গুনাহ। এটাও স্পষ্ট যে, বিবাহের প্রস্তাবে শুধু চেহারাই দেখা যায়।[৪৯]

৫. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, উম্মু আতিয়্যাহ রাযি. বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

---

৪৫. উমদাতুল কারী, ১৯/৯২
৪৬. মিনহাতুল বারী, ৮/৬৭
৪৭. মাআনিল কুরআন, ২/৭৫৩
৪৮. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৩৬০২। সহীহ।
৪৯. এখানে দেখার উদ্দেশ্য মূলত সুন্নাত আদায়। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা নয়। বিনায়াহ, ১২/১৩৮

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিলেন আমরা যেন সাবালিকা, ঋতুমতী ও গৃহবাসী নারীদের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ঈদগাহে নিয়ে যাই। তবে ঋতুমতী মহিলারা ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। তারা (অন্যান্য) সাওয়াবের কাজে এবং মুসলিমদের দুআতে অংশগ্রহণ করবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের কারও কারও 'জিলবাব' (তথা নিজেকে ঢাকার মতো বড়) ওড়না থাকে না (সে কী করবে?)। তিনি বললেন, তার বোন তাকে ওড়না পরিধান করতে দিয়ে সাহায্য করবে।[৫০]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলা সাহাবীগণ রাযি. পর্দা ছাড়া বের হতেন না।[৫১]

৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُـــولُ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَـــهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُـــرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَـــةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَـــلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَـــاءُ بِذُيُولِهِـــنَّ؟ قَـــالَ: يُرْخِينَ شِـــبْرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِـــفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَـــالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا يَـــزِدْنَ عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেবেন না। এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালমা রাযি. বললেন, নারীগণ চাদরের নিম্নাংশ কতটুকু ঝুলিয়ে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অর্ধহাত পরিমাণ। উম্মে সালমা রাযি. বললেন, এতে তো তাদের পা খোলা থাকবে (অর্থাৎ দেখা যাবে)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এক হাত, এর বেশি নয়।[৫২]

পা ঢেকে রাখার ব্যাপারে সৌন্দর্য প্রকাশের সুযোগ না থাকায় যেখানে কাপড় লম্বা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে চেহারা খোলা রাখার অনুমতি থাকে কী করে?

---

৫০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৮৩; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৪
৫১. দ্রষ্টব্য : ইকমালুল মু'লিম, ৩/৩০২
৫২. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৭৩১; সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ৫৩৩৬। সহীহ।

নাসায়ী শরীফ ছাড়াও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে পর্দার নির্দেশ রয়েছে, ওপরের আলোচনার পর এটা আর অস্পষ্ট নেই।

এমনকি হযরত আয়েশা রাযি. হতে ইহরাম অবস্থায় হাদীস বর্ণিত আছে যে, যখন পুরুষরা নারীদের অতিক্রম করত, তখন আমরা মহিলারা চেহারা ঢেকে রাখতাম।[৫৩]

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাধারণ অবস্থায় নারীগণ মুখের ওপর নেকাব ও হাতমোজা পরিধান করতেন, যা সহীহ বুখারীর একটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.

ইহরাম অবস্থায় নারী নেকাব পরিধান করবে না এবং হাতমোজা পরবে না।[৫৪]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এই হাদীসের চমৎকার একটি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সে যুগে ইহরাম ছাড়া অন্য সময় নারীরা নেকাব ও হাতমোজা ব্যবহার করা প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। যার দ্বারা বোঝা যায়, নারীরা হাত ও চেহারা ঢেকে রাখতেন।[৫৫]

এখানে শুধু কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো, অন্যথায় এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রয়েছে।

দ্বীনের এই পবিত্র শিক্ষা ও নির্দেশনার ওপর আমাদের প্রাণপণ আমল করা উচিত। অথচ আমরাই কি না নির্লজ্জতা ও বেপর্দা চলাফেরা জায়েয করার নষ্ট অভিলাষে লিপ্ত হয়েছি!

নিজেদের সরলতা ও বিজাতীয়দের প্রতারণা লক্ষ করুন

এতদ্ব্যতীত বিজাতীয়রা আমাদের অপবিত্র ও অশ্লীলতার কাদাজলে নিমজ্জিত

---

৫৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮৩৩। এই হাদীসের সনদ দুর্বল, তবে আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর বোন আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. হতে সহীহ সনদে সমার্থক হাদীস রয়েছে। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ১৬৬৮। সনদ সহীহ।

৫৪. সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৩৮

৫৫. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ১৫/৩৭২

করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। চলুন সেদিকে একবার দৃষ্টি ফেরানো যাক।

বর্তমানে স্কুলগুলোতে সহশিক্ষা ও এমন সব ইউনিফর্মের প্রচলন ঘটানো হয়েছে, যেখানে অর্ধ-উলঙ্গ হওয়ার পাশপাশি নির্লজ্জতা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। সহশিক্ষা ও নির্লজ্জ এ সকল পোশাকআশাকের বিরোধিতাকারীদের পশ্চাৎপদ ও প্রাচীনপন্থী আখ্যা দেয়া হয়।

এমনিভাবে স্কুলের নির্লজ্জ পরিবেশে বেড়ে ওঠার পর কলেজ ও ইউনিভার্সিটির গণ্ডিতে পা রাখতে রাখতে মুসলিম বাচ্চাদের চালচলন পুরোপুরি নির্লজ্জতায় পর্যবসিত হয়। সেই সাথে লজ্জা বিসর্জন ও অশ্লীলতার এমন বীভৎস চিত্র ফুটে ওঠে, যা দেখে মানবতাও লজ্জাশরম মাথা ঠুকে মরে।

প্রশ্ন হলো, শিক্ষার জন্য সহশিক্ষাব্যবস্থা কি খুব জরুরি?

বেপর্দা ও অর্ধ-উলঙ্গ চালচলন ছাড়া কি কোনো বক্তব্য বুঝে আসবে না? কোনো বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে সাজগোজ করা চেহারা কি অতি প্রয়োজনীয়? ছোট এবং আঁটোসাঁটো পোশাক ছাড়া কি কোনো পুস্তক বোধগম্য নয়? সংস্কৃতি চর্চার নামে অভিভাবকের সামনে মেয়েদেরকে মঞ্চে উঠিয়ে অশ্লীল পোশাকে নাচগান করানো কি বিদ্যার্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়?

বর্তমানে মুসলিম সমাজও এ ধরনের নির্লজ্জ অপকর্মে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ এইডস জাতীয় যৌনবাহিত রোগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, এ আর আশ্চর্যের কী? এমনিভাবে প্রেম-ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে যুবক-যুবতিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে, এতে বিস্ময়ের কী আছে? পাশাপাশি অবৈধ কিংবা অকাল গর্ভপাতে অসংখ্য প্রাণ বিনষ্ট হওয়াই বা অসম্ভবের কী?

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের বিধানকে উপহাস করা আর দ্বীনের রীতিনীতির বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণার পরিণাম এমনটাই হওয়া উচিত নয় কি?

আল্লাহ পাক আমাদের সুষ্ঠু বোধ দান করার পাশাপাশি তার সকল নির্দেশ মেনে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কবি আকবর এলাহাবাদী বলেন,

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں
اکبر وہیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا
پوچھا جو ان سے آپ کے پردہ کا کیا ہوا
کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا

(ভাবানুবাদ)

বেপর্দার চোরাস্রোত ধীরে ধীরে বেড়ে
দ্বীনের শিকড়ে হেনেছে নগ্ন কুঠার
কী হলো পর্দা তোমার? শুধালে বলে
বিবেকে ছেয়েছে হায় ঘৃণ্য আঁধার।

গ্রামগঞ্জে পর্দার বেহাল দশা

শহরের তুলনায় গ্রামে অশ্লীলতার পরিমাণ অনেকটাই কম। সেখানে এখনো এতটা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। তাই এখনো গ্রামে ভোরের মৃদুমন্দ হাওয়ায় ভেসে আসে কুরআনের সুমধুর ধ্বনি, যখন শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাই ঘুমে বিভোর থাকে। শহরে যেমন আধুনিকতার ছোবলে পরনের কাপড় ছোট হয়ে গিয়েছে, খুলে গিয়েছে দেহের অধিকাংশ, সেখানে এখনো গ্রামের লোকেরা এসব পোশাক দেখলেই নাক সিটকান। অশ্লীলতাকে তারা এখনো জায়গা দেননি তাদের মনের ভেতর। তবে এরপরও গ্রামে বেপর্দা সয়লাব হয়ে আছে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা পর্দার বিধানকে মানছেন না।

উন্মুক্ত স্থানে গোসল করা

এই সমস্যাটা যেন গ্রামে মহামারিতে রূপ নিয়েছে। পুকুর বা নদীতে মহিলারা প্রকাশ্যেই গোসল করেন। পাশ দিয়ে পরপুরুষ যাতায়াত করে, সামনে দিয়ে নৌকাভর্তি যাত্রীদের আসা-যাওয়া হয়, একসাথেই পরপুরুষরা গোসল করে—এসব যেন সেখানকার নিত্যদিনের দৃশ্য। অথচ এটা যেমন পর্দার বিধানের মারাত্মক লঙ্ঘন, তেমনিভাবে চরম মাত্রার দৃষ্টিকটু কাজ।

এখানে এসে আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনটি ঘটনা তুলে ধরছি, যা

গ্রামীণ পুকুর, খাল, নদী বা উন্মুক্ত স্থানে গোসলের খারাপ দিকটা বুঝতে সাহায্য করবে।

ঘটনা : ১

২০০০ সাল। দাওয়াত ও তাবলীগের জামাতের সাথে আমরা গেলাম উত্তরবঙ্গের নীলফামারি জেলায়। তাবলীগের মেহনতের জন্য দেয়া রোখ তথা নির্ধারিত এলাকায় পৌঁছার পর স্থানীয় একজন প্রবীণ মুবাল্লিগ আসলেন আমাদের সাথে দেখা করতে। এলাকায় কীভাবে দাওয়াতের মেহনত করা যায় সে সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিতে গিয়ে একসময় তিনি এলাকার পুকুর-জলাশয় ব্যবহারের আলোচনায় গোসল প্রসঙ্গে আসলেন। এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে একপর্যায়ে তিনি কান্নামাখা কণ্ঠে বললেন, ভাইয়েরা, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা মসজিদের টিউবওয়েলে গোসল করবেন। যেসব মসজিদের নিজস্ব পুকুর আছে সেসব মসজিদে পুকুরে গোসল করবেন। আমাদের দ্বীনের মেহনত এতটাই দুর্বল যে, আমরা আমাদের অঞ্চলের মা-বোনদের পর্দা, সতর এমনকি পরপুরুষের সামনে যাচ্ছেতাই ভাবে চলাফেরা করে গোসলের খারাপ দিকটা বোঝাতে পারিনি। তাই আমি চাই না, আপনারা আমাদের মা-বোনদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরে যান। অন্তত আপনাদের পরহেজগারী ও সতর্কতা যেন সমাজে এই বার্তা দেয় যে, মা-বোনদের খোলা জায়গায় গোসল ও যত্রতত্র পোশাক পরিবর্তনের বিজাতীয় রীতি ত্যাগ করা উচিত।

ঘটনা : ২

২০০২ সাল। আমরা গেলাম লক্ষ্মীপুর। লক্ষ্মীপুর সদরের এক ঐতিহাসিক মসজিদে জামাত উঠল। তালিমের সময় কয়েকজন গাশতে বের হলাম। মসজিদের পশ্চিম পাশেই বিশাল পুকুর। মসজিদের পশ্চিম-উত্তর কোণে মসজিদের ঘাট। ঘাট ঘেঁষে মসজিদের দোতলার দিকে একটা সরু সিঁড়ি উঠে গেছে। সম্ভবত ইমাম সাহেবের বাসস্থান। সেই সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে উঠে কয়েকজন কিশোর বসে আছে। সবার দৃষ্টি পুকুরের অপর পাড়ে। সেদিকেও অবশ্য একটি ঘাট আছে। তবে সেই ঘাটে মা-বোনদের গোসলের জন্য দেয়াল তুলে আড়াল তোলা হয়েছে। সময়টা ছিল শীতকাল। পুকুরের পানির স্তর নেমে যাওয়ায় পানি দেয়ালের নিচের অংশ থেকেও কিছুটা নিচে নেমে এসেছে।

এই ফাঁকা জায়গা দিয়ে উঠতি কিশোরের ছোট দলটি ওপারের মা-বোনদের গোসলের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছে। আমরা তাদের কাছে গিয়ে সেদিকে চোখ পড়তেই দৃশ্য দেখে চমকে গেলাম! আসতাগফিরুল্লাহ! লা-হাওলা পড়ে তাদের দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে আসলাম। স্থানীয় কয়েকজন সাথিকেও বিষয়টা জানিয়ে আসলাম।

ঘটনা : ৩

২০০৫ সাল। এবারের সফর ফরিদপুর ভাঙ্গা থানায়। এক মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করতে বের হলাম। মসজিদের পাশ ঘেঁষেই পাটখড়ি আর টিন দিয়ে তোলা ইমাম সাহেবের রুম। রুমের দরজা খোলা। কয়েকবার সালাম দিয়ে সাড়া না পেয়ে স্থানীয় রাহবারকে নিয়ে রুমে ঢুকে গেলাম। ঢুকে দেখি ইমাম সাহেব নেই। বের হয়ে আসার সময় একটা জিনিস লক্ষ করলাম। রুমের এক কোনায় এক মানুষ উচ্চতায় দুই পাটখড়ির মাঝে মাটির টুকরো গুঁজে দিয়ে হালকা ফাঁকা করা হয়েছে। বিষয়টা তখন বুঝে আসেনি। জোহরের সময় ইমাম সাহেব আসলেন। নামাজ পড়িয়ে রুমে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেবকে খানায় শরিক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিতে গেলাম। রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি ইমাম সাহেব পাটখড়ির ফাঁকা দিয়ে কিছু একটা দেখছেন! আমাদের সালাম শুনে চমকে সরে আসলেন। তখন ওপাশের পুকুর থেকে মা-বোনদের আওয়াজ ভেসে আসছে। বোঝাই যাচ্ছে ওনারা গোসল করছিলেন। পরে জানলাম, ইমাম সাহেব হাফেজ বা আলেম কিছুই না। কিছুদূর পড়েছেন।

ঘটনা তিনটি এখানেই শেষ। এবার আলোচনায় ফেরা যাক।

এখন যদিও বেশির ভাগ বাড়িতে টিউবওয়েলসহ নানা ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু সেখানেও পর্দার কোনো বালাই থাকে না। একই কল থেকে মহিলারাও গোসল করছে, আবার সেখান থেকে পুরুষরাও নিজেদের কাজকর্ম সারছে। বা শুধু মহিলারা গোসল করলেও গোসলের স্থানে পর্যাপ্ত পর্দার ব্যবস্থা না থাকায় পাশের পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পুরুষদের চোখে পড়ছে।

এই সমস্যা দূরীকরণে কিছু কাজ করা যেতে পারে :

প্রথমত, সম্ভব হলে ঘরের ভেতরে বা বাইরে আলাদা গোসলখানার ব্যবস্থা করা। যেখানে ঘরের মহিলারা পর্দার সাথে ওযু-গোসল করতে পারবেন। এতে

খুব বেশি খরচ হওয়ার কথা না। শুধু টিন বা মোটা কাপড় দিয়ে নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারবে এমন সুন্দর গোসলখানা। নিজের মা-বোন, স্ত্রীকে পর্দায় রাখা তো পুরুষদের জন্য ফরজ, তাই এ কাজটুকু হিম্মত করে করলেই হয়ে যাবে। পাশাপাশি এটাও লক্ষ রাখতে হবে যে, গ্রামের বা শহরতলির কলপাড়ে বানানো গোসলখানায় যেন ছাদ থাকে। অর্থাৎ ওপরেও ঢাকা থাকে। তা না হলে আশপাশের কিছু উঁচু ভবন থেকে কিংবা আজকালকার ড্রোন ব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রেও পর্দা নষ্টের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

হ্যাঁ, এখানে একটু কথা থাকতে পারে যে, সব গ্রামে তো এমন পানির লাইন নিয়ে আলাদা গোসলখানা বানানো সম্ভব না। অনেক গ্রামেই পুকুরে বা নদীতে গিয়েই গোসল করতে হয়। এরও সমাধান রয়েছে। ঘরের পুরুষরা বা মহিলারা ওযু-গোসলের জন্য এই নির্দিষ্ট গোসলখানায় বড় একটি ড্রাম রাখতে পারেন, সেটি ভরে রাখলেই ঘরের মহিলারা দুই-তিন দিন ওযু-গোসল সব সারতে পারবেন অনায়াসেই। পানি টেনে আনা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তবে বুদ্ধি খাটালে এটাও তেমন কিছু নয়। ঘরের লোকেরা পুকুরে বা নদীতে দিনে কয়েকবারই যাতায়াত করেন। কখনো হাত-পা ধুতে, কখনো বাসন পরিষ্কার করতে, কখনো অন্য কোনো কাজে। প্রত্যেকবার আসার সময় যদি ছোট্ট একটা বালতি দিয়ে পানি এনে সেই ড্রামে রাখার অভ্যাস করা হয়, তাহলে এটা গায়েই লাগবে না। একটি ফরজ বিধান পালনের জন্য, নিজের মা-বোন-স্ত্রীকে পর্দায় রাখার জন্য এটুকু কষ্ট তো মেনে নেয়াই যায়।

দ্বিতীয়ত, যদি ঘরের পাশে ভিন্ন গোসলখানা তৈরির করা সম্ভব না হয়, তাহলে পুকুর বা ডিপকলেই এর ব্যবস্থা করা যায়। পুকুরে সাধারণত একটি ঘাট থাকে, যেখান নারী-পুরুষ সবাই যার যার কাজ সারে। কিন্তু মহিলাদের জন্য আলাদা ঘাট তৈরি করা জরুরি। যেখানে চতুর্দিক দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা থাকবে। এমন ঘাটও অনেক পুকুরে দেখা যায়। এবং মহিলাদের গোসলের সময়ও নির্দিষ্ট থাকা চাই। দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় বাড়ির মহিলারা সেখানে পর্দার সাথে গোসল করবেন। এরপর সেখানেই কাপড় পরিবর্তন করে পর্দার সাথে ঘরে ফিরবেন। এ ক্ষেত্রে অনেকেই গাফলতি করেন। পর্দার সাথে গোসল করে ভেজা কাপড়-সহই বাড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে ঘরে ফেরেন। এতে কী লাভ হলো, পর্দার সাথে গোসল করে আরও বেপর্দার সাথেই তো ঘরে ফেরা হলো! তাই গোসলের স্থানের সাথেই

আরেকটি পর্দাঘেরা জায়গা থাকা উচিত, যেখানে মা-বোনেরা কাপড় পরিবর্তন করে পর্দার সাথে ঘরে ফিরতে পারবেন।

পুকুরে বা খাল-বিলে মা-বোনদের জন্য পর্দাঘেরা গোসলের ব্যবস্থা করার সময় দুই নং ঘটনাটি মাথায় রাখা চাই। সে ক্ষেত্রে পানির স্তর দেয়াল, টিন বা কাপড় থেকে নেমে গেলে সেখানে অস্থায়ীভাবে চট বা ত্রিপল দিয়ে সতর্কতা বজায় রাখা চাই।

ডিপকলে বা পুকুরে পানি আনতে গিয়েও অনেক সময় পর্দার খেলাফ হয়ে যায়। এ সময় মা-বোনেরা একটু অপেক্ষা করতে পারেন। সেখান থেকে পুরুষেরা চলে গেলে এরপর পানি আনতে পারেন, বেশি জরুরি হলে দূর থেকে কাশি দিয়ে বা কোনো শিশুকে দিয়ে বললে পুরুষ সরার পর এরপর কাজ সারতে পারেন।

দোচালা টিনের ঘরে পর্দা

গ্রামের অনেক ঘরে পর্দার ব্যবস্থা থাকে না। সকাল থেকে রাত অবধি সদর দরজা উন্মুক্ত থাকে। বাজারের মতো সবাই যখন ইচ্ছা ঘরে ঢুকে পড়ে। মাহরাম-গাইরে মাহরামের কোনো বালাই থাকে না। গ্রামগুলোতে পর্দার এই বেহাল দশা মহামারির মতো। যেন তারা পর্দার বিধান জানেনই না। অথবা জানলেও তারা মনে করেন, এত বছর যাদের সাথে একই গ্রামে থাকলাম, তাদের সাথে আবার কিসের পর্দা! অথচ তারা কিন্তু পর্দার বিধানকে অস্বীকার করেন না, অথবা শহুরে লোকদের মতো উচ্ছৃঙ্খল জীবনও যাপন করেন না। মূল কারণ হলো, ছোট থেকেই তারা এমন পরিবেশে বড় হয়েছেন। বাস্তব জীবনে তাদের মধ্যে অশ্লীলতার ছোঁয়া কম থাকলেও অযাচিত ঘটনাও কম নয়। কোনো সমস্যাই না থাকুক, আল্লাহপ্রদত্ত ফরজ বিধানের ব্যাপারে এতটা অবহেলা মারাত্মক অশনি-সংকেতই বয়ে আনে।

গ্রামের পর্দার গাফলতির একটি বাস্তব চিত্র বলি। গ্রামের যেসব লোক শহরে বসবাস করেন, তাদের কেউ কেউ যখন দীর্ঘদিন পর গ্রামে ফেরেন, তখন তাকে দেখতে আশেপাশে অনেক মহিলা চলে আসেন। সম্পর্কে তাদের কেউ ভাবি হন, কেউ মামি হন, কেউ দূর পাড়ার চাচি হন—মোটকথা গাইরে মাহরাম মহিলা দিয়ে ঘর ভরে যায়। তখন শহর থেকে আগন্তুক ব্যক্তিটির সামনে না আসতে চাইলেও তারা রাগ করেন। কানাঘুষা করেন। অর্থাৎ তারা মনে করেন,

খুব পরিচিত লোকদের সাথে কোনো পর্দা নেই, পর্দার বিধান কেবল এমন অপরিচিত লোকদের সাথেই, যাদের দ্বারা কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এমন বেপর্দা পরিবেশের কারণে গ্রামের লোকদের থেকে হায়া ও শরম দিনদিন কমে যাচ্ছে। অনেক মহিলা প্রকাশ্যে এমনভাবে কাপড় বা শাড়ি পরে ঘোরেন যে, দেহের অনেকাংশই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

তাই গ্রামে যেভাবেই হোক পরিপূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঘরের সদর দরজায় একটি পর্দা টাঙালেই এটা সহজ হয়ে যায়। প্রত্যেক জানালাতে একটি করে পর্দা থাকবে। মূল ঘরের দরজা ভেজানো থাকবে। প্রয়োজনে ঘরের দরজায় লেখা থাকবে, অনুগ্রহ করে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকুন। এতে সবাই বুঝতে পারবে, এই ঘরে পর্দার বিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করা হয়। বাস্তবেও পর্দার বিধান মেনে চলুন। গাইরে মাহরামদের সামনে আসা থেকে বিরত থাকুন। প্রথম প্রথম লোকজন কিছু বলাবলি করলেও ধীরে ধীরে পরিবেশ অনুকূল হয়ে যাবে। এমনকি আশেপাশের পরিবেশও আপনার কারণে অনেকটাই বদলে যাবে। গ্রামের পরিবেশটা মূলত এমন যে, কেউ পর্দা করতে চাইলেও পরিবেশ না থাকার কারণে করতে পারে না।

গ্রামের বাড়িতে পরিপূর্ণ পর্দার একটি উত্তম পদ্ধতি হলো, সম্ভব হলে বাড়ির চতুষ্পার্শ্বে টিন দিয়ে বেড়া দিয়ে দেয়া অথবা কাপড় লাগিয়ে দেয়া। যাতে পথচারীদের দৃষ্টি বাড়ির ভেতরে না পড়ে। অনেক বাড়ির রান্নার চুলো থাকে বাড়ির সামনেই। এতে করে পথচারীদের দৃষ্টি সহজেই মহিলাদের ওপর পড়ে। এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকা চাই। রান্নার জায়গাটুকু বেড়া অথবা টিন দিয়ে ঘিরে রাখলে সবচেয়ে ভালো। সম্ভব না হলে এমন জায়গায় চুলো বসাতে হবে, যেখানে কারও দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে পড়ে না।

গ্রামে কাপড় শুকানোর ঝামেলা

গ্রামে অনেকেই বাড়ির উঠোন বা পথের পাশের মাচার ওপর কাপড় শুকাতে দেন। মহিলাদের কাপড় এভাবে প্রকাশ্যে শুকাতে দেয়া অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। বাড়ি যদি পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে, তাহলে বাড়ির ভেতরেই কাপড় রোদে দেয়া যাবে। ঘর যদি দোচালা হয়, তাহলে এসব ঘরের ওপর তলায় ছোট্ট একটা বারান্দা থাকে, সেখানেও কাপড় রোদে দেয়া যায়। কাপড় শুকানোর ব্যাপারে আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

গ্রামের বাড়িতে গলার আওয়াজ যেমন থাকবে

সাধারণত গ্রামের বাড়িঘরগুলো নীরব পরিবেশে হয়। সামান্য শব্দ দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এক ঘরের কথা অন্য ঘরে অনায়াসেই পৌঁছে যায়। তাই কথার আওয়াজের ক্ষেত্রে সাবধান থাকা চাই। যতটুকু শব্দ করে বলতে হবে, ততটুকু শব্দেই বলা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গ্রামের অনেক মহিলার মাঝে বৈপরীত্য দেখা যায়। অনেকেরেই গলার আওয়াজ পুরুষদের চেয়েও বড় থাকে। আওয়াজের কোনো সীমারেখার তারা ধার ধারেন না। গ্রামের বেশির ভাগ বাড়ি টিনের তৈরি, ফলে এক ঘরের কথা অন্য ঘরে অনায়াসেই চলে যায়। তাই ব্যক্তিগত কথা বলার সময় নিম্নস্বরে বলা আবশ্যক।

উঠোনজুড়ে ডাকাডাকি

বাড়ির উঠোন থেকে কাউকে উচ্চ আওয়াজে ডাকাডাকি করা গ্রামের প্রতিদিনকার দৃশ্য। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যদিও মহিলাদের কণ্ঠ সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সভ্য ও ভদ্র নারীর আলামত হলো, তাদের কণ্ঠস্বর থাকবে নিচু। পুরুষদের মতো উচ্চ আওয়াজে কথা বলা, হাঁকডাক দেয়া মা-বোনদের সাথে যায় না। এটাকে সামাজিক দৃষ্টিতেও দূষণীয় ধরা হয়। আর প্রয়োজন ব্যতীত মহিলাদের জন্য জোরে কথা বলাও জায়েয নেই।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে গ্রামে বাচ্চাদের ডাকার উপায় কী? গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে দূরদূরান্তে থাকে। এ ক্ষেত্রে একটি উপায় হলো, অন্য কোনো ছেলেকে দিয়ে বাচ্চাকে ডাকানো। জোরে ডাকতে হলে ঘরের পুরুষ দিয়েই ডাকানো। টিন-জাতীয় কিছুর মধ্যে লাঠি দিয়ে শব্দ করে ডাকার রেওয়াজও পর্দানশীন পরিবারে রয়েছে। বাচ্চা নিজেই বুঝতে পারে তাকে ডাকা হচ্ছে।

গ্রামে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কীভাবে করবে?

শহরের আবদ্ধ ফ্ল্যাটে যেসব কাজ পর্দার সাথে করা যায়, গ্রামে সেভাবে করা সম্ভব হয় না। আবার গ্রামের এমন কিছু কাজও রয়েছে, যেগুলো বাইরে বসেই করতে হয়। যেমন : ঘর লেপা, ধান মাড়াই করা, ধান সিদ্ধ করা, ধান শুকানো, ধান ওড়ানো, পুকুর বা কলে ঘরোয়া কাজকর্ম সারা ইত্যাদি কাজগুলো ঘরের

বাইরেই করতে হয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পর্দার বিধানের লঙ্ঘন চোখে পড়ে অহরহই। যেন এসব ক্ষেত্রে পর্দার বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর থেকে উত্তরণের উপায় কী?

প্রথম কথা হলো, নিজে পর্দার গুরুত্ব বুঝতে হবে, তাহলে সব ক্ষেত্রেই পর্দার সুরত বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় কথা হলো, যেসব কাজ পুরুষদের জন্য করা সম্ভব, সেসব কাজ পুরুষগণ করবেন। এ ছাড়া অন্যান্য কাজ, যেমন ঘর লেপা, বাসন-পত্র ধোয়া, ধান ওড়ানো ইত্যাদি কাজগুলো পূর্ণ পর্দার সাথেই করতে হবে।

এর আরও একটি পদ্ধতি আমরা আগেও বলেছি যে, সম্ভব হলে ঘরের আঙিনাতেই পর্দার ভেতরে সবকিছুর ব্যবস্থা করা। যাতে মহিলারা পর্দার সাথে সবকিছু করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এসব কাজ করা তখনই সহজ মনে হবে, যখন নিজের ভেতরে গুরুত্ব ঢুকবে, আল্লাহ তাআলার আদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে, তখন পর্দা করা সহজ হয়ে যাবে। অন্যথায় বহু বছর ধরে চলে আসা প্রচলনকে ত্যাগ করতে কষ্টই হবে। এমনকি গ্রামের কেউ কেউ তো বলেই ফেলেন, আরে ধুরো! এত পর্দা করলে আবার কাজ করা যায় নাকি? ঘেমেই কুল পাই না, আবার ওড়না দিয়ে শরীর ঢেকে রাখব!

এই ধরনের কথাবার্তা শরীয়তের ফরজ বিধান পর্দাকে তুচ্ছ করারই শামিল। শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে এ ধরনের কথাবার্তা দ্বীন-ঈমানের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর।

গ্রামে কোনো কোনো নারী দূরদূরান্তের বাজারেও যান। এটাও অনুচিত কাজ। বাজারসদাই করবেন ঘরের পুরুষেরা। যদি ঘরে কোনো পুরুষ না থাকে, তাহলে পাশের ঘরের মহিলার সাথে আলাপ করে রাখা, যাতে তাদের ঘরের পুরুষ যখন বাজারে যাবে, তখন তার বাজারও যেন একসাথে নিয়ে আসে।

আর যদি বাজারে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজনই হয়, তাহলে পরিপূর্ণ পর্দার সাথেই যেতে হবে।

গ্রামীণ পরিবেশে পর্দার ব্যাপারে অনেক কথাই বলা হলো। তবে মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলে নিজ বাড়িতে ও সমাজে পর্দার পরিবেশ তৈরিতে কিছু করণীয় আছে। যেমন :

১. এ ক্ষেত্রে আলেম, তালিবুল ইলম ও দ্বীনের দাঈগণের ভূমিকা রাখা অপরিহার্য। অনেক সমাজে মসজিদের ইমাম, আলেম, তালিবুল ইলম ও দ্বীনের দাঈদের মধ্যে পর্দার ব্যাপারে বেশ শিথিলতা দেখা যায়। দ্বীনের এই প্রথম সারির লোকজনের মধ্যে একটি ফরজ বিধানের ব্যাপারে লাগামহীন শিথিলতা সমাজে পর্দার গুরুত্বকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। তাই প্রতিটি সমাজের ইমাম, সমাজে বসবাসকারী আলেম, তালিবুল ইলম ও দ্বীনের দাঈদের এ ব্যাপারে তাকওয়ার মাসআলা অবলম্বন করা জরুরি। নিজেরা পর্দার সমস্ত মাসআলা-মাসায়েলের ওপর যথাযথ আমলের পাশাপাশি নিজ নিজ পরিবারেও পর্দার পরিবেশ কায়েম করা চাই। দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রগামী এসব ব্যক্তির এবং তাদের পরিবারে পর্দা প্রতিষ্ঠিত হলে বাকি সমাজে পর্দার পরিবেশ তৈরি হওয়া সহজ হয়ে যাবে।

২. পর্দার বুঝ-জ্ঞান পাওয়া প্রতিটি নারী এবং পুরুষকে নিজের পর্দার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা চাই। সেই সাথে পরিবারেও পরিবেশ কায়েমের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অন্তত সমাজের মধ্যে নিজের এবং পরিবারের এমন একটা অবস্থান তৈরি করতে হবে, যাতে সমাজের মানুষ আপনার সাথে এবং আপনার পরিবারের সাথে পর্দার বিধি-বিধান মেনে চলে। আমরা পাবনা ও ভোলাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সফরে এমন অনেক পরিবার পেয়েছি, যাদের সমাজের লোকজন তাদেরকে পর্দানশীন পরিবার হিসেবে জানে। এবং এ কারণে গ্রামের পুরুষলোকেরা সহজে সেসব বাড়ির আশেপাশে ভেড়ে না। এমনকি পুরুষ ভিখারিরাও সেসব বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে যায় না। আর গেলেও বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে; ভেতরে প্রবেশ করে না।

৩. পুরো বাড়ি বা পরিবারে পর্দার পরিবেশ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত কুরবানী ও মুজাহাদার সাথে নিজের পর্দাকে ঠিক রাখা। আমরা এমন অনেক মা-বোনের অবস্থা জানি, যারা পর্দা শুরুর পর প্রথম প্রথম পানি আনতে, বাথরুমে, রান্নাঘর ইত্যাদিতেও বোরকা পরে যাতায়াত করেছেন। তাদের এসব কুরবানীর বরকতে আল্লাহ তাআলা পুরো বাড়িতে পর্দার পরিবেশ কায়েম করে দিয়েছেন।

পঞ্চগড় তেঁতুলিয়ার একটি ঘটনা বলি। ২০০৯ সালে পাকিস্তানি এক জামাতের সাথে আমরা অল্প কিছুদিন তেঁতুলিয়ায় ছিলাম। সেখানে একবার পাথর ভাঙা শ্রমিকদের মাঝে দাওয়াত দিতে গিয়ে লক্ষ করলাম, অদূরে এক মা পাথর

ভাঙছেন। তার পরনে আপাদমস্তক বোরকা। হাতে-পায়ে মোজা! পাকিস্তানি সাথি একজনকে ওই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বলা হলো, মহিলাটি বিধবা। ঘরে নাবালক সন্তান আছে। উপার্জনক্ষম কোনো পুরুষ নেই। মহিলার স্বামী দ্বীনদার ছিলেন। মহিলা বাধ্য হয়ে পাথর ভাঙতে এসেছেন। কিন্তু পর্দা ছাড়েননি। পাকিস্তানি সাথি জিজ্ঞাসা করল, কেউ ওনাকে বিরক্ত করে না? লোকজন বলল, নাহ, কেউ এমন কল্পনাও করে না।

পাকিস্তানি সাথি দুআ করলেন, আয় আল্লাহ! আপনার এক বান্দি আপনার সন্তুষ্টির আশায়, আপনার আজাবের ভয়ে এই গরমের মধ্যে পুরোপুরি পর্দার সাথে রিজিকের তালাশে নেমেছেন। আপনি মেহেরবান রব, করনেওয়ালা জাত, আপনি আপনার এই বান্দির দুনিয়া ও আখিরাতকে সুন্দর করে দিন। দুনিয়াতে তার জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে দিন। আখিরাতে সাহাবিয়াদের প্রতিবেশী বানিয়ে দিন। আয় আল্লাহ! আপনার এই বান্দির দ্বীনদারী আর কুরবানীকে আমাদের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমরা বললাম, আমীন!

হুটহাট কারও ঘরে না যাওয়া

শহরের ফ্ল্যাটবাসায় সাধারণত দরজা সব সময় বন্ধই থাকে, তাই হুট করেই কারও ঘরে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। কিন্তু গ্রামের ঘরগুলোতে সাধারণত দরজা খোলাই থাকে, তাই খুব বাজে একটি বদভ্যাস হলো, কারও ঘরে অনুমতি ছাড়াই হুটহাট ঢুকে যাওয়া। অনুমতি ছাড়া কারও ঘরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন। অনেকেই এই ব্যাপারটিকে সহজ মনে করেন, পাত্তা দেন না। তারা মনে করেন, আরে আমার বন্ধুর ঘরই তো, ভাইয়েরই তো ঘর! অনুমতি লাগবে কেন আবার! অথচ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিজের বাবা-মায়ের ঘরে ঢুকতে হলেও অনুমতি নেয়া আবশ্যক।

একজন বুদ্ধিমান মানুষের এ কথা সহজেই বোঝার কথা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে তার একান্ত জীবনটি যাপন করে। এই জীবনযাপন যাতে নির্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব হয়, সে জন্য ইসলাম কিছু নীতি ও বিধান দান করেছে, যার চর্চা ও অনুশীলন একটি সভ্য সমাজের জন্য অতি প্রয়োজন। এর অন্যতম একটি হলো, অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়া। বিধানটি যে সভ্যতা ও শান্তির

এক বড় অনুষঙ্গ, তা সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যায়।

একে অপরের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে বহু রকমের বিব্রতকর ও বিরক্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এই যেমন ধরুন :

১. ঘরে কখনো একান্ত ব্যক্তিগত এমন কিছু কাজ করা হয়, যা অন্য কারও দৃষ্টিগোচর হোক ঘরের লোকেরা তা চায় না।

২. কখনো একান্ত জরুরি কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় খুলে রাখা হয় (বা খুলে যায়)। এ অবস্থায় বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করে ফেললে আগন্তুক ও ঘরের লোক উভয়ই বিব্রত বোধ করে।

৩. কখনো ঘরে কোনো কাজ গভীর মনোযোগের সাথে করা হচ্ছে, এমন সময় কেউ হঠাৎ করেই এসে পড়লে সে চমকে ওঠে। এর ফলে দিল-দেমাগের ওপর চোট পড়ার আশঙ্কা থাকে। এতে কাজের ব্যাঘাতও হয়। আর এই সমস্যাগুলো কারও একান্ত কক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের দ্বারা ঘটতে পারে।

৪. ঘরে-বাড়িতে হঠাৎ কেউ ঢুকে গেলে গাইরে মাহরাম পুরুষ বা মহিলার ওপরও দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক।

আরেকটি বিষয় হলো, কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাকে তো সাক্ষাৎদানের জন্য অন্তত মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত। আর সাক্ষাতের বাইরে অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে তো কথাই নেই।

মোটকথা, অনুমতি ছাড়া কারও বাড়িতে বা ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ হতে পারে পর্দা নষ্টের কারণ কিংবা বিরক্তি ও কষ্টের কারণ। তাই অন্যের ঘরে বা কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নাজায়েয এবং সাধারণ ভদ্রতা ও সুরুচিরও পরিপন্থী।

অনুমতির বিষয়টি কেমন গুরুত্বপূর্ণ তা এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তা শুধু মৌখিক ও আমলগতভাবেই শিক্ষা দেননি; বরং এ ক্ষেত্রে কারও ভুল হলে তৎক্ষণাৎ তাকে সতর্ক করেছেন। এখানে সেসব শিক্ষা-নির্দেশনার মধ্য থেকে জরুরি কিছু বিষয় আলোচনা করা হলো, যেগুলো যথাযথ চর্চা ও অনুসরণ করা হলে আমাদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হবে আনন্দপূর্ণ ও কল্যাণকর।

অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

'হে মুমিনগণ, নিজ ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ কোরো না, যতক্ষণ না অনুমতি নাও এবং তার অধিবাসীদের সালাম দাও। এ পন্থাই তোমাদের জন্য উত্তম। হয়তো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।'[৫৬]

এখানে দুটো কাজ করা ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। একটি হলো ঘরের বাসিন্দার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া আর দ্বিতীয়টি সালাম দেয়া। হাদীস ও খাইরুল কুরুনের আমল থেকে জানা যায়, উত্তম হলো আগন্তুক বাইরে দাঁড়িয়ে আগে সালাম দেবে, তারপর প্রবেশের অনুমতি চাইবে।

কালাদা ইবনে হাম্বল রাযি. থেকে বর্ণিত, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাযি. তাকে দুধ, হরিণের বাচ্চা ও দুগবূস (একপ্রকার শস্য) দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু সালাম দিইনি এবং অনুমতিও নিইনি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি বেরিয়ে সালাম দাও, তারপর এভাবে বলো, আমি কি প্রবেশ করব?[৫৭]

অপর এক হাদীসে আছে, আমের গোত্রের এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইতে গিয়ে বলল, 'أَلِجُ' (আ-আলিজু) 'আমি কি আসব?' (এ শব্দটি আরবীতে কোনো সংকীর্ণ স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমকে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দাও। তাকে বলো, তুমি সালাম দিয়ে বলবে, 'أَأَدْخُلُ' (আ-আদখুলু?) 'আমি কি প্রবেশ করব?' লোকটি বাইরে থেকে তা শুনে সালাম দিয়ে বলল, 'আ-আদখুলু?' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর সে প্রবেশ করল।[৫৮]

---

৫৬. সূরা নূর, (২৪) : ২৭

৫৭. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৭১০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৭৬। হাসান।

৫৮. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৭৭। সহীহ।

কলিংবেল দেয়া ও দরজায় নক করা

যদি মনে হয় সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজ ভেতর থেকে শুনবে না, তাহলে কলিংবেল থাকলে সেটা চাপবে অথবা দরজায় নক করবে। তারপর কেউ সামনে এলে সালাম দিয়ে অনুমতি চাইবে।

কলিংবেল দেয়া, দরজায় নক করা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অনেকের মাত্রাজ্ঞানের অভাব থাকে। বারবার বেল চাপতে থাকে বা খুব জোরে দরজায় আওয়াজ করে, যা অনেক সময় ঘরের লোকদের চমকে ওঠার কারণ হয়। বেল চাপার পর অপেক্ষা করা উচিত। তেমনি দরজায় নক করার ক্ষেত্রে এটুকুই যথেষ্ট, যার দ্বারা যথাস্থানে আওয়াজ পৌঁছায়। বিশেষত আলেম-বুযুর্গ ও বড়দের কাছে গেলে এ বিষয়ে খেয়াল রাখা খুব জরুরি। দেখুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আদব কেমন ছিল। নবীজীর খাদেম আনাস রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় নখ দ্বারা আওয়াজ করা হতো।[৫৯] এটা বস্তুত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের উচ্চতর আদব, সম্মান ও মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ।

নাম-পরিচয় উল্লেখ

কখনো তো সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজ থেকেই ঘরের বাসিন্দা অনুমতিপ্রার্থীকে চিনে ফেলে। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে ভেতর থেকে নাম-পরিচয় জানতে চাইলে তা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। কারণ নাম-পরিচয় জানতে চাওয়ার অর্থই হলো সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজ থেকে আগন্তুককে চেনা যায়নি। আর না চিনলে অনুমতি দিতেও দ্বিধা হয়। এ জন্য উত্তম হলো সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার সাথেই নাম-পরিচয় বলে দেয়া।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, উমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সালাম দিয়ে বললেন, উমর কি প্রবেশ করবে?[৬০]

একদিন প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু মুসা আশআরী রাযি. উমর রাযি.-এর কাছে

---

৫৯. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১০৮০। সহীহ।

৬০. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭৫৬। সহীহ। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস, ৫২০১; সহীহ বুখারী, হাদীস, ৭২৬৩

এসে সালাম দিয়ে বললেন, এ (আগন্তুক) আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস। জবাব না আসায় দ্বিতীয়বার সালাম দিয়ে বললেন, এই আগন্তুক আবু মুসা। এবারও জবাব না আসায় তৃতীয়বার সালাম দিয়ে বললেন, এই ব্যক্তি আশআরী। এরপর (জবাব না পেয়ে) তিনি ফিরে গেলেন। তখন উমার রাযি. বললেন, (তাকে) আমার কাছে ফিরিয়ে আনো, আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। ফিরে এলে তিনি বললেন, হে আবু মুসা, তোমাকে ফিরিয়ে দিল কিসে? আমরা তো কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অনুমতি তিনবার চাইতে হয়। এর মধ্যে তোমাকে অনুমতি দেয়া হলে তো দিল, অন্যথায় ফিরে যাও।[৬১]

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথমবার তিনি শুধু নাম বলেছেন। কিন্তু জবাব না আসায় এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, ভেতর থেকে হয়তো চেনেনি। তাই দ্বিতীয়বার যে নামে বেশি প্রসিদ্ধ সেটা বললেন—আবু মুসা (উপনাম)। এবারও জবাব না আসায় আরও পরিচয় দেন—আশআরী।

‘আমি আমি’ বলা অনুচিত

ঘরের বাসিন্দার জন্য এক বিরক্তিকর ব্যাপার হলো, যখন আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাওয়ার পরও নাম-পরিচয় না বলে শুধু ‘আমি আমি’ করে কিংবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আমি করলে বা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে তো প্রশ্নের উত্তর হয় না। যখন সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজে আগন্তুককে চেনা যায়নি তখন শুধু ‘আমি’ বললে কীভাবে চিনবে?

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতার ঋণের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় এসে হালকা শব্দ করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? বললাম, আমি। তিনি অসন্তুষ্টির স্বরে বললেন, ‘আমি আমি!’ (অর্থাৎ জানতে চাওয়া হয়েছে নাম-পরিচয় আর তুমি বলছ ‘আমি’!)[৬২]

---

৬১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫৪; সহীহ বুখারী, হাদীস, ২০৬২
৬২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫৫

দরজায় দাঁড়ানোর নিয়ম

অনুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একেবারে দরজা বরাবর দাঁড়ানো সমীচীন নয়; বরং ডানে-বামে কিছুটা সরে দাঁড়ানো কর্তব্য। দরজা-জানালা বা অন্য কোনোভাবে ঘরের ভেতর উঁকি দেয়া তো খুবই আপত্তিকর। উঁকি দিলে বা দরজা বরাবর দাঁড়ালে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু নজরে পড়ে যেতে পারে।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারও দরজায় আসতেন তখন একেবারে দরজা বরাবর দাঁড়াতেন না। বরং ডান দিকে বা বাম দিকে দাঁড়াতেন এবং সালাম দিতেন।[৬৩]

কারও বাড়ি বা রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে কিংবা জানালা ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে উঁকি দেয়া খুবই গর্হিত কাজ। অনেকেই অতি কৌতূহল কিংবা অভ্যাসবশে এই কাজটা করে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরায় উঁকি দিল। তাঁর সঙ্গে তখন চিরুনি জাতীয় একটি জিনিস ছিল। তিনি বললেন,

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

'আমি যদি জানতাম তুমি (ভেতরে) দৃষ্টি দেবে, তবে এটা দিয়ে তোমার চোখে খোঁচা মারতাম। অনুমতি চাওয়ার বিধান তো দৃষ্টির কারণেই।' অর্থাৎ যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছুর ওপর দৃষ্টি না পড়ে যায়।[৬৪]

অপর এক হাদীসে এসেছে, কোনো মুসলিমের জন্য অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত অন্যের ঘরের ভেতর দৃষ্টি দেয়া জায়েয নয়। যদি দৃষ্টি দেয়, তবে তো সে ঢুকেই পড়ল।[৬৫]

---

৬৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৮৬। সহীহ। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস, ১৭৬৯২

৬৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস, ২১৫৬

৬৫. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৭, হাসান; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস, ৯০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২৪১৫।

ঘর থেকে কোনো জবাব না এলে

একবার অনুমতি চাওয়ার পর ভেতর থেকে কোনো জবাব না এলে দ্বিতীয়বার চাওয়া যাবে। দ্বিতীয়বার না এলে তৃতীয়বারও চাওয়া যাবে। কিন্তু তৃতীয়বার জবাব না এলে ফিরে আসতে হবে।

তিনবার অনুমতি চাওয়ায় এটা তো মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ভেতরে আওয়াজ পৌঁছেছে। কিন্তু ঘরে হয়তো কেউ নেই। অথবা থাকলেও এমন কোনো অবস্থায় আছে যে, অনুমতি দিতে পারছে না (যেমন : নামাজ পড়ছে বা গোসল করছে) অথবা এ মুহূর্তে অনুমতি দেয়া তার পছন্দ নয়, কিন্তু সরাসরি অস্বীকৃতি জানাতে সংকোচ বোধ করছে কিংবা খবর পাঠানোর জন্য কাউকে পাচ্ছে না ইত্যাদি।

আর এ সকল অবস্থায় সে মাযূর ও অপারগ। সক্ষমতা-অসক্ষমতা মিলিয়েই মানুষের জীবন। কখনো সে অপারগ হয়—না বাইরে আসতে পারে, না আগন্তুককে ভেতরে ডাকতে পারে। তাই পরস্পরের ওযর-সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে হবে এবং সহজভাবে নিতে হবে। এতে নারাজ হওয়া বা তা অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। সুতরাং তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও জবাব না এলে ফিরে আসতে হবে। আর সরাসরি ফিরে যেতে বললে তো কোনো কথাই নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দ্ব্যর্থহীন ইরশাদ :

> فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

> ‘তোমরা যদি তাতে (গৃহে) কাউকে না পাও, তবু যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়, তাতে প্রবেশ কোরো না। তোমাদের যদি বলা হয়, ফিরে যাও, তবে ফিরে যাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।’[৬৬]

আবু মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

৬৬. সূরা নূর, (২৪) : ২৮

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অনুমতি তিনবার চাইতে হয়। এর মধ্যে তোমাকে অনুমতি দেয়া হলে তো দিল, অন্যথায় ফিরে যাও।[৬৭]

এখানে দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য ও ভারসাম্য লক্ষণীয়। সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বলা হচ্ছে, সে যেন যার সাক্ষাতে যায় পুরোপুরি তার সুবিধা-অসুবিধাকে প্রাধান্য দেয়, প্রবেশের আগে অনুমতি তলব করে, তা গৃহীত হলে প্রবেশ করে; অন্যথায় খুশি মনে ফিরে আসে ইত্যাদি। অন্যদিকে যার সাক্ষাৎ কাম্য তাকে বলা হচ্ছে,

إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

'তোমার ওপর তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থীরও কিছু হক (দেখা-সাক্ষাতের অধিকার) রয়েছে।'[৬৮]

যেমন তাকে ভেতরে ডাকা বা বাইরে এসে সাক্ষাৎ করা। তার সম্মান করা, কথা শোনা। বিশেষ ওযর ছাড়া অস্বীকৃতি না জানানো। কোনো প্রয়োজনে এলে সামর্থ্য থাকলে তা পূরণের চেষ্টা করা ইত্যাদি।

মাহরামের ঘরে গেলে অনুমতি লাগবে?

মাহরাম আত্মীয়দের (যাদের পারস্পরিক বিবাহ হারাম) পরস্পরের মধ্যে পর্দার বিধান না থাকলেও একে অপরের 'সতর' দেখা নাজায়েয। আর ব্যক্তিগত কাজ, অবস্থা ও অবস্থান তো প্রত্যেকেরই কমবেশি থাকে। এ কারণে প্রাপ্তবয়স্ক মাহরামদেরও একে অন্যের ঘরে গেলে সর্বদা অনুমতি নেয়া উচিত। পিতা-মাতা, প্রাপ্তবয়স্ক ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে সকল মাহরামের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য।

তবে সাবালকত্বে পৌঁছেনি এমন শিশুরা যেহেতু সাধারণত ঘরে ছোটাছুটি করে, তাই তারা শুধু ওই সময়গুলোতে অনুমতি নেবে, যে সময়গুলোতে বড়রা বিশ্রাম ও একান্তে অবস্থান করে। এ ছাড়া অন্য সময়ে তাদের অনুমতি নিতে হবে না। বড়দের কর্তব্য নিজেদের বিশ্রাম ও একান্তে অবস্থানের

---

৬৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫৪; সহীহ বুখারী, হাদীস, ৬২৪৫
৬৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৭৫

সময়গুলোতে শিশুদের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার শিক্ষা দেয়া ও উদ্বুদ্ধ করা। যাতে এ সময়গুলোতে তারাও অনুমতি ছাড়া বড়দের ঘরে প্রবেশ না করে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ
وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ
ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ
ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَـٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ
بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ
لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَـٰلُ مِنكُمُ
ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

‘হে মুমিনগণ, তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনো সাবালকত্বে পৌঁছেনি সেই শিশুরা যেন তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে—ফজরের নামাজের আগে, দুপুর বেলা যখন তোমরা (বিশ্রামের উদ্দেশ্যে) পোশাক খুলে রাখো এবং এশার নামাজের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে তোমাদের ও তাদের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তো সার্বক্ষণিক যাতায়াত থাকেই। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের শিশুরা সাবালক হয়ে গেলে যেন অনুমতি গ্রহণ করে, যেমন তাদের আগের বয়ঃপ্রাপ্তরা অনুমতি গ্রহণ করে আসছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’[৬৯]

এখানে বিশেষ তিনটি সময়ে শিশুদেরও অনুমতি নিয়ে প্রবেশের আদেশ করা হয়েছে। কারণ, এ সময়গুলোতে সাধারণত মানুষ একটু খোলামেলা থাকতে

৬৯. সূরা নূর, (২৪) : ৫৮-৫৯

পছন্দ করে। এ অবস্থায় হঠাৎ কেউ উপস্থিত হয়ে গেলে পর্দাহীনতার আশঙ্কা থাকে আর আরাম-বিশ্রামের তো বিঘ্ন ঘটেই। আর অন্য সময়ে যেহেতু এসব ভয় থাকে না, আবার তারা বেশি বেশি যাতায়াতও করে, তাই তখন তারা বিনা অনুমতিতেও প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু সাবালকত্বে পৌঁছে যাওয়া ছেলে-মেয়ে এবং বড়দের অনুমতির বিষয়টি এ তিন সময়ে সীমাবদ্ধ না করে তাদেরকে সাধারণভাবে অনুমতি নেয়ার আদেশ করা হয়েছে।

আলকামা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি মায়ের কাছে গেলে অনুমতি নেব? তিনি বললেন, সব (যেকোনো) অবস্থায় তাকে দেখা তো আর তোমার পছন্দ হবে না।[৭০]

আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত, আমি ইবনে আব্বাস রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, বোনের ঘরে প্রবেশ করতে কি আমি তার অনুমতি নেব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দুই বোন আমার অধীনে (দায়িত্বে) রয়েছে। আমি তাদের দেখাশোনা করি এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করি। তাদের ঘরে যেতেও কি আমার অনুমতি নিতে হবে? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। তোমার কি তাদের বিবস্ত্র (অস্বস্তিকর অবস্থায়) দেখতে ভালো লাগবে? এরপর তিনি (উপরোল্লেখিত) সূরা নূরের ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াত পাঠ করে বলেন, সকলের জন্য অনুমতি নেয়া জরুরি।[৭১]

এক মহিলা অপর মহিলার ঘরে গেলে

অন্য অনেক বিধানের মতো এই বিধানও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। পুরুষ পুরুষের বা মাহরাম মহিলার ঘরে গেলে যেমন অনুমতি নিতে হবে, তেমনি মহিলা যদি মাহরাম পুরুষের বা যেকোনো মহিলার ঘরে যায় তাকেও অনুমতি নিতে হবে। কারণ নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সমলিঙ্গে এবং বিপরীত লিঙ্গের মাহরামের মধ্যেও ফরজ সতরের কিছু বিষয় আছে, যা ওপরে বর্ণিত আয়াত, হাদীস ও আছার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৭০. আল-আদাবুল মুফরাদ, বর্ণনা নং ১০৫৯। সহীহ।
৭১. আল-আদাবুল মুফরাদ, বর্ণনা নং ১০৬৩। সহীহ।

ডেকে পাঠালে

কখনো খাদেম বা অন্য কারও মাধ্যমে কাউকে ডাকা হয়। এ ক্ষেত্রে দূতের সাথে এলে কিংবা দেরি না হলে অনুমতি নিতে হবে না। ডেকে পাঠানোই অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু দেরিতে এলে অনুমতি নিতে হবে।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কারও কাছে দূতের আগমন তার জন্য অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে।[৭২]

তবে এ ব্যাপারে একটা বিষয় খেয়াল রাখা চাই; তা হলো, এক রুম থেকে আরেক রুমে, বাড়ির ভেতরেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তৎক্ষণাৎ কাউকে ডেকে পাঠালে সে ক্ষেত্রে নতুন করে অনুমতি না নিয়ে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা যেতে পারে। তবে দূরের বা অন্য বাড়ি থেকে ডেকে পাঠালে অনুমতি নেয়া চাই। একই সাথে দূত বা লোক মারফত খবর দেয়ার পর যেতে কিছুটা বিলম্ব হলে অনুমতি নেয়া জরুরি।

উন্মুক্ত স্থানে অনুমতির প্রয়োজনীয়তা

এ পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের ঘরে প্রবেশের আদব আলোচিত হয়েছে যে, এতে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়া জরুরি। কিন্তু অনেক ঘর আছে, যা ব্যক্তিবিশেষের বাসস্থান নয়, বরং সাধারণভাবে তা যে কারও ব্যবহার করার অনুমতি আছে। যেমন : গণ-মুসাফিরখানা, হাসপাতাল, ডাকঘর, পার্ক, মসজিদ, মাদরাসা ইত্যাদি। এ ধরনের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। একইভাবে ব্যক্তিবিশেষের ঘরেও কোনো সময়ে নির্দিষ্ট কারও কিংবা সবার উন্মুক্ত সাক্ষাতের অনুমতি থাকলে সে সময়ে প্রবেশ করতে অনুমতি নিতে হবে না।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ
لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ.

'যে ঘরে কেউ বাস করে না এবং তা দ্বারা তোমাদের উপকার গ্রহণের

৭২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৮৯। সহীহ।

অধিকার আছে, তাতে তোমাদের প্রবেশে কোনো গুনাহ নেই। তোমরা যা প্রকাশ্যে করো এবং যা গোপনে করো আল্লাহ তা জানেন।'[৭৩]

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ঘরে গেলে

নিজ ঘরে (যে ঘরে ব্যক্তি একা থাকে) প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর যে ঘরে স্বামী-স্ত্রী একা থাকে সেটা তাদের নিজস্ব ঘর। এতে প্রবেশের জন্য তাদের পরস্পরের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে উত্তম হলো হঠাৎই ঢুকে না পড়া; বরং গলা খাঁকারি, পায়ের আওয়াজ অথবা অন্য কোনো উপায়ে অবগত করে প্রবেশ করা।

যায়নব সাকাফী রাযি. (আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর স্ত্রী) বলেন, আবদুল্লাহ্ যখন কোনো প্রয়োজন সেরে দরজায় এসে পৌঁছতেন, তখন গলা খাঁকারি দিতেন এবং থুতু ফেলতেন। যাতে হঠাৎ আমাদের এমন কোনো অবস্থায় দেখে না ফেলেন, যা তার খারাপ লাগবে।[৭৪]

ধর্মের ভাই, ধর্মের বোন, উকিল বাবা সমাচার

আমাদের দেশে ধর্মের ভাই, ধর্মের বোন, উকিল বাবা ইত্যাদি কিছু সম্পর্কের অস্তিত্ব রয়েছে। বিশেষত গ্রামের দিকে এসব বেশি দেখা যায়। এবং তারা পরস্পর পর্দাও রক্ষা করেন না। তারা মনে করেন, আমরা তো ধর্মের আত্মীয়, তাই আমাদের মাঝে কোনো পর্দা নেই। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোনো কোনো পরিবারে ধর্মের এই আত্মীয়কেও ওয়ারিসের সম্পদ দেয়া হয়। মোটকথা, তারা এই ধরনের সম্পর্ককে রক্তের সম্পর্কের মতোই গুরুত্ব দেন। অথচ শরীয়ত ধর্মের ভাই, ধর্মের বোন বা উকিল বাবা এ-জাতীয় সম্পর্কের অনুমোদন দেয় না। তাই তাদের সাথেও পর্দা করা ফরজ। উপরন্তু আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, মাহরাম-গাইরে মাহরাম তথা কাদের সাথে দেখা করা যাবে আর কাদের সাথে যাবে না। সূরা নিসায় আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে,

---

৭৩. সূরা নূর, (২৪) : ২৯

৭৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৬১৫। সহীহ। তাফসীরে তাবারী, ১৭/২৪৫।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

‘তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদের, তোমাদের মেয়েদের, তোমাদের বোনদের, তোমাদের ফুপুদের, তোমাদের খালাদের, ভাতিজিদের, ভাগনিদের, তোমাদের সেসব মাকে যারা তোমাদের দুধপান করিয়েছেন। তোমাদের দুধবোনদের, তোমাদের শাশুড়িদের, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদের, আর যদি তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকো তবে তোমাদের ওপর কোনো পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের এবং দুই বোনকে একত্র (বিয়ে) করা (তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[৭৫]

আলাদা আলাদাভাবে নারীর মাহরাম ও গায়রে মাহরাম এবং পুরুষের মাহরাম ও গায়রে মাহরামদের পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

পুরুষের জন্য মাহরাম :

পুরুষরা যেসব নারীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন তারা হলেন :

১. দাদি।

২. মা, দুধ মা।

৩. বোন, দুধ বোন।

৪. শাশুড়ি।

---

৭৫. সূরা নিসা, (৪) : ২৩

৫. স্ত্রী।
৬. মেয়ে, দুধ মেয়ে, সৎ মেয়ে।
৭. পুত্রবধূ, দুধ ছেলের স্ত্রী।
৮. ফুপু।
৯. খালা।
১০. ভাই-বোনের মেয়ে (ভাতিজি-ভাগনি)।
১১. নানি।

পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম :

পুরুষরা যেসব নারীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন না তারা হলেন :

১. মায়ের খালাতো, চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো বোন।
২. চাচাতো বোন।
৩. ভাবি।
৪. বাবার খালাতো, চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো বোন।
৫. চাচি।
৬. ফুপাতো বোন।
৭. খালাতো বোন।
৮. মামাতো বোন।
৯. শ্যালক-শ্যালিকার মেয়ে [স্ত্রীর (ভাতিজি-ভাগনি) ভাই-বোনের মেয়ে]।
১০. শ্বশুর-শাশুড়ির বোন (ফুপু শাশুড়ি, খালা শাশুড়ি)
১১. শ্যালিকা (স্ত্রীর বোন)।
১২. মামি।
১৩. স্ত্রীর খালাতো, চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো বোন।
১৪. স্ত্রীর ভাবি।
১৫. মেয়ের ননদ।
১৬. ছেলে-মেয়ের শাশুড়ি।

এখানে মূলত এমন কিছু গাইরে মাহরামের তালিকা উল্লেখ করা হলো, যাদের সাথে পর্দার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখা যায়। বাকি মাহরাম ব্যতীত অন্য সকল নারীই পুরুষের জন্য গাইরে মাহরাম।

নারীর জন্য মাহরাম :

নারীরা যেসব পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন তারা হলেন :

১. দাদা।
২. বাবা।
৩. ভাই।
৪. শ্বশুর।
৫. স্বামী।
৬. ছেলে।
৭. নাতি।
৮. চাচা।
৯. ভাই-বোনের ছেলে (ভাতিজা-ভাগিনা)।
১০. নানা।
১১. মামা।

নারীর জন্য গায়ের মাহরাম :

নারীরা যেসব পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবেন না তারা হলেন :

১. মায়ের খালাতো, চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো ভাই।
২. চাচাতো ভাই।
৩. দুলাভাই (বোনের স্বামী)।
৪. বাবার খালাতো, চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো ভাই।
৫. ফুপুর স্বামী (ফুপা)।
৬. ফুপাতো ভাই।
৭. খালাতো ভাই।
৮. মামাতো ভাই।
৯. ননদের ছেলে।
১০. শ্বশুর-শাশুড়ির ভাই (চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর)।
১১. দেবর-ভাসুর (স্বামীর ছোট ও বড় ভাই)।
১২. ননদের স্বামী (স্বামীর ছোট বোনের স্বামী)।
১৩. স্বামীর খালাতো, চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো ভাই।

১৪. স্বামীর ভগ্নিপতি (স্বামীর বড় বা ছোট বোনের স্বামী)।
১৫. ছেলের শ্যালক বা সমন্দী (ছেলের স্ত্রীর বড় বা ছোট ভাই)।
১৬. ছেলে-মেয়ের শ্বশুর।
১৭. খালার স্বামী (খালু)।

এখানে মূলত এমন কিছু গাইরে মাহরামের তালিকা উল্লেখ করা হলো, যাদের সাথে পর্দার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখা যায়। বাকি মাহরাম ব্যতীত অন্য সকল পুরুষই নারীর জন্য গাইরে মাহরাম।

এই দীর্ঘ তালিকার কোথাও উল্লেখ নেই, উকিল বাবা, ধর্মের ভাই বা ধর্মের বোনের সাথে দেখা করা জায়েয। শরীয়তের সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও এ ব্যাপারে গাফলতি করা অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার। উপরন্তু এসব ধর্মের ভাই-বোনের প্রচলন এই উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও অস্তিত্বও নেই। হ্যাঁ, মুসলিম হিসেবে প্রত্যেক মানুষই আমার ভাই বা বোন। তাই বলে ধর্মের ভাই-বোন নামে ভিন্ন সম্পর্কের উদ্ভাবন করা শরীয়তে নাজায়েয। তাদের সাথেও পূর্ণাঙ্গ পর্দা করতে হবে; চাই তাদের সাথে সম্পর্ক যত পুরোনোই হোক না কেন। তাদের দ্বারা কোনো ক্ষতি হওয়া আশঙ্কা না থাকলেও পর্দা করতে হবে।[৭৬]

উকিল বাবা আসল বাবা নয়

আমাদের দেশে বিয়ে-শাদিতে উকিল বাবার প্রচলন দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে তাকে আসল বাবার চোখেই দেখা হয়। তাকে বাবা মনে করে অবাধে তার সামনে আসা-যাওয়া করা হয়। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি প্রচলন। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জন্মদাতা পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নেই। আর বিয়েতে উকিল বাবারও কোনো প্রয়োজন নেই। বিয়ের শর্ত-শারায়েতের মধ্যেও উকিল বাবা বলে কিছু নেই। বিয়েতে সাক্ষী হিসেবে মেয়ের বাবা, ভাই, মামা থাকলেই যথেষ্ট। অথবা আত্মীয়ের বাইরে থেকেও যে কেউ বিয়েতে সাক্ষী হিসেবে থাকতে পারবেন। আর অভিভাবক হিসেবে

---

৭৬. সূরা নিসা, (৪) : ২৩; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৪৫; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩২৪৩; কিতাবুল আছল, ৪/৩৫৭-৩৬০; ফাতওয়া খানিয়া, ১/৩৬০; বাদায়েউস সানায়ে, ২/৫৩০; আলমুহীতুল বুরহানী, ৪/১০৬; আলবাহরুর রায়েক, ৩/৯২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/২৭৩

কেউ থাকলেই যে তাকে উকিল বাবা বলা হবে এটাও ভুল কথা। এক বিয়েতে মেয়ের মামা ছিল অভিভাবক। বিয়ের পর থেকে মামাকে আব্বা ডাকা শুরু হয়। কারণ হিসেবে তারা বলে, মেয়ের বিয়েতে মামা ছিল অভিভাবক। সুতরাং এখন তিনি উকিল বাবা হয়েছেন, তাই বাবা ডাকা হয়। কোনো সভ্য, রুচিশীল ব্যক্তি এভাবে অন্য কাউকে বাবা ডাকতে পারেন না।

গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারে পর্দার সুরত

গ্রামের বেশির ভাগ পরিবারই একান্নবর্তী পরিবার। রক্তের বন্ধনের সবাই একসাথেই থাকতে চায়। বাংলার আবহমানকাল থেকে একান্নবর্তী পরিবারগুলো স্মৃতি ধরে আছে। দাদা-দাদি, চাচা-চাচিসহ পরিবারের সবাই একই বাড়িতে বসবাস করার এ রীতি যেমন একদিক থেকে স্মৃতিময়, অন্যদিক দিয়ে পর্দার বিধানের বেহাতও হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। যারা কঠোরভাবে দ্বীনের সব বিধান মেনে থাকেন, তাদের জন্য এমন পরিবারে পর্দা রক্ষা করে চলা সমস্যা হয় না। এ ছাড়া অন্যদের জন্য পর্দা রক্ষা করা অসম্ভবই বটে। ঘরের ভেতর দিয়ে হাঁটাচলা, একই টয়লেট বা গোসলখানা ব্যবহার করা, একই ডাইনিং রুমে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে পর্দার বিধানের অমান্য হয়।

এসব পরিবারে চাইলেও পর্দার বিধান ঠিকঠাকমতো পালন করা যায় না। দেবরের সাথে ভাবির পর্দা, ভাতিজার সাথে চাচির পর্দার বিধান যেন তারা মানতেই চান না। দেবরকে মনে করা হয় ছোট ভাইয়ের মতো; অনেক পরিবারে আবার দেবরকে ছোট স্বামী বলেও ডাকা হয়! এটা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদীস শরীফের ভেতর দেবরের বিষয়ে কঠোর শব্দ এসেছে,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বেগানা নারীদের কাছে যাওয়া থেকে দূরে থাকো। এক আনসার সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দেবরের ব্যাপারে আপনি কী বলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য।'[৭৭]

---

৭৭. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৭২

'الْحَمْوُ' শব্দের অর্থ স্বামীর ভাই। চাই সে স্বামীর ছোট অর্থাৎ দেবর হোক বা স্বামীর বড় অর্থাৎ ভাসুর হোক। এই হাদীসের মধ্যে স্বামীর চাচাতো-ফুপাতো-মামাতো-খালাতো ইত্যাদি ভাইয়েরাও অন্তর্ভুক্ত।

দেবর বা ভাসুরকে মৃত্যুতুল্য বলার কারণ হলো, সমাজে দেবর বা ভাসুরের সাথে পর্দার বিষয়ে অনেক উদাসীনতা রয়েছে। অথচ স্বামীর অগোচরে এ দুইজনের একাকী সময় কাটানোর ফলে অনেক সংসার ভেঙে যাওয়ার নজির খুঁজতে তেমন কষ্ট হবে না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়ে গেছেন, 'তোমরা মৃত্যুকে যেভাবে ভয় করো, দেবর বা ভাসুরকেও সেভাবে ভয় করো।' কেউ কেউ শুধু মাথায় কাপড় দেয়াকে পর্দা মনে করেন এবং এভাবে তারা ঘরে দেবর বা ভাসুরের সামনে বসেও খাবার খান। ঘরে চলাফেরা করেন। এ সবকিছুই শরীয়তের পর্দার বিধান অমান্য করার শামিল।

এসব পরিবারে পর্দার সুরত হলো :

১. ভিন্ন ভিন্ন গোসলখানা ও টয়লেটের ব্যবস্থা থাকা। অন্তত এভাবেও হতে পারে যে, ঘরের মহিলাদের জন্য একটি টয়লেট, পুরুষদের জন্য আরেকটি টয়লেট।

২. সব ঘরের জন্য কেবল একটি দরজাই না হওয়া। বরং একাধিক দরজা থাকা।

৩. অনেক ঘর এভাবে বানানো যে, এক ঘরে যেতে হলে অন্য ঘর দিয়ে ঢুকতে হয়। এতেও পর্দার সমস্যা হয়। তাই রুমগুলো এভাবে বানানো, যাতে এক ঘরের মধ্য দিয়ে আসা-যাওয়া করতে না হয়।

৪. প্রত্যেক পরিবারের খাবারের জায়গা ভিন্ন হওয়া। যদি একসাথেই খেতে হয়, তাহলে অন্তত এই ব্যবস্থা থাকা যে, ঘরের পুরুষরা খাবেন একসাথে, আর মহিলারা খাবেন একসাথে।

৫. প্রত্যেক রুমে পর্দার ব্যবস্থা থাকা। যাতে অন্য রুম থেকে দৃষ্টি না পড়ে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, নিজেদের ভেতর পর্দার বিধান মানার জযবা থাকা। তাহলে যেভাবেই হোক পর্দার সুরত নিজেরাই বের করতে পারবে। না হয় শত বই পড়লেও, শত বয়ান শুনলেও কাজের কাজ কিছুই হবে না।

যৌথ পরিবারে পর্দার বিধান অমান্য করা এখন অন্যতম বড় ফিতনা। কেউ কেউ যৌথ পরিবারে পর্দাকে গুরুত্বই দেন না। তারা মনে করেন, আমরা তো একই

পরিবারের লোক, তাই পর্দার প্রয়োজন নেই। পর্দা করলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে। অথচ তারা যে পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, এ ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই।

পর্দার ব্যাপারে অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং দ্বীনের বিধানের ব্যাপারে ভালোবাসা থাকা জরুরি। সেই সাথে চাই তাকওয়ার গুণ।

অনেক নিম্নবিত্ত পরিবারের ভাড়াটে বাসায় একটি মাত্র টয়লেটের ব্যবস্থা থাকে। এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের টয়লেটে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাহরাম নারীর মাধ্যমে আগে খোঁজ নিয়ে তারপর যেতে হবে।

ঢাকার এমনই একটি দ্বীনমুখী বাসার কথাই বলি। বাসায় একটি মাত্র টয়লেট। তাও আবার রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। ঘরে মা-বাবা, ভাই-বোন এবং ভাইয়ের বউও আছে। মাঝে মাঝে বোনের স্বামীও বেড়াতে আসেন। আর অন্যান্য মেহমান তো কমবেশি আসেনই। সেই পরিবারে কোনো পুরুষ টয়লেটে যাওয়ার আগে মাহরামের মাধ্যমে খোঁজ নেন। এবং টয়লেট শেষে বের হওয়ার আগে দরজায় কয়েকটি টোকা দিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে অবস্থা বুঝে বের হন। সামর্থ্য সীমিত। কিন্তু আল্লাহর জন্য এতটুকু কুরবানী করতে কারও দ্বিধা নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে এর উত্তম বিনিময় দান করবেন।

আবার মেস সিস্টেমের এমন বাসার কথাও জানি, যেখানে রান্নাঘর এবং টয়লেট অন্যদের সাথে শেয়ার করতে হয়। এমন পরিস্থিতিতেও আমি এক রিকশাচালক ভাইয়ের পরিবারের খবর জানি, যার বাসার মাস্তুরাত টয়লেটে যাওয়ার সময় বোরকা পরে যান। রান্নাঘরে বোরকা পরে রান্না করেন।

তাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা পর্দার ব্যাপারে বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করান, তারা এসব মানুষের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।

একান্নবর্তী পরিবারে পোশাকের পর্দা

একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে পোশাকের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা বজায় রাখা চাই। একই ধরনের পোশাকের কারণে যেন পর্দার বিঘ্নতা না ঘটে। এ জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখা চাই। যেমন :

১. বালেগা মেয়ে আর মা একই ধরনের পোশাক পরবে না। একে অন্যের পোশাক পরবে না।

২. শাশুড়ি এবং বৌমা একই ধরনের পোশাক পরবে না। একে অন্যের পোশাক পরবে না।

৩. বাড়ির ছেলের বউয়েরা একই ধরনের পোশাক পরবে না। একে অন্যের পোশাক পরবে না।

৪. কোনো সময় পরিবারের সকল মেয়ে, মেয়ে জামাই, ছেলে ও ছেলের বউরা একত্র হলে প্রত্যেকের পোশাকের রং কিংবা ডিজাইন আলাদা হওয়া চাই।

৫. স্বামী যে পোশাকে স্ত্রীকে দেখতে পছন্দ করেন, তা পুরোনো হয়ে গেলে ঘরের পরিচারিকাকে না দিয়ে বাইরের কাউকে হাদিয়া দেয়া। আর দিলেও স্বামীকে জানিয়ে দেয়া।

৬. কোনো কারণে পোশাকের এসব নিয়মে ব্যত্যয় ঘটলে বিশেষ সতর্কতা বজায় রাখা।

পর্দার পরেও অনেক সময় কোনোভাবে পোশাকের খানিকটা দেখে মানুষ ফিতনায় পড়ে যেতে পারে।

এসব হালাল-হারামের প্রশ্ন নয়। বরং ফিতনার আশঙ্কা থেকে যথাসাধ্য নিরাপদ থাকার চেষ্টা করা।[৭৮]

শহুরে পর্দার রকমফের

শহরের ফ্ল্যাটে পর্দা করা গ্রামের তুলনায় সহজ। শহরের ফ্ল্যাটে গ্রামের মতো উন্মুক্ত পরিবেশ নেই। নেই হুটহাট কেউ ঘরে ঢোকার উটকো ঝামেলা। এখানে সবাই যার যার মতো বসবাস করে। তবে এতসবের পরেও শহরে পর্দা নিয়ে অনেক ঝামেলাই দেখা যায়। এটা হতে পারে না জানার কারণে, অথবা অসতর্কতার কারণে।

৭৮. দ্রষ্টব্য : আহমাদ ইউসুফ শরীফ, গল্প-কল্প-চিন্তা, পৃষ্ঠা ১০৭

দরজা-জানালায় আধুনিক পর্দা

অনেক বাসায় এখন রংবেরঙের আধুনিক পর্দার প্রচলন দেখা যায়। যেসব পর্দার মুখ্য উদ্দেশ্যই থাকে ফ্যাশন। এসব পর্দা আদতে খুব ফিনফিনে হয়। একটু খেয়াল করলেই ওপাশ থেকে সব দেখা যায়। একটু জোরে বাতাস বইলেই এসব পর্দা উড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। এসব পর্দায় কেবল ফ্যাশনই হয়, শরয়ী পর্দার বিধান আর মানা হয় না।

তাই পর্দা হতে হবে পুরো জানালা বা দরজা জুড়ে। পছন্দমতো কাপড়ের রং হতে পারে। কিন্তু কাপড় হতে হবে ভারী। যাতে বাতাসেও কাপড় উড়ে না যায়। প্রয়োজনে পর্দার সাথে ক্লিপ লাগাতে হবে। আর সামর্থ্য থাকলে গাঢ় কালারের পাতলা নেটের পর্দা লাগিয়ে নেয়া। যাতে গরমের কারণে মূল পর্দা সরালেও দূর থেকে ঘরের ভেতর দেখা না যায়।

প্রচণ্ড গরমের সময় জানালার পর্দা পুরো ঝুলিয়ে রাখলে রুমের ভেতর গরম বেড়ে যায়। তাই অনেকেই জানালার পর্দা পুরো খুলে রাখেন। এরপর গরমের কারণে উদোম হয়ে অথবা কাপড় হালকা-পাতলা করে রুমে চলাফেরা করা হয়। শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশে রুমের ভেতরেই পর্দা রক্ষা করা কঠিন হয়ে গিয়েছে। অনেক মা-বোন গরমের কারণে জানালার পর্দা পুরো সরিয়ে কাপড় হালকা করে রুমের ভেতরে হাঁটাচলা করেন, অথবা বিছানায় ফ্রি হয়ে শুয়ে থাকেন; কিন্তু পাশের ফ্ল্যাট থেকেই যে একজোড়া নিকৃষ্ট চোখ তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, এটা তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছেন না।

অনেক পুরুষও গরমের সময় জানালার পর্দা খুলে উদোম হয়ে শুয়ে থাকেন। এটা অভদ্রতার শামিল।

গরমের সময় মা-বোনেরাও প্রচণ্ড কষ্ট করেন। প্রচণ্ড গরমে জ্বলন্ত চুলোর কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রান্না করেন। তখন অনেকেই ওড়নাহীন অবস্থায় রান্নাঘরের জানালা খুলে দাঁড়িয়ে থাকেন। এতেও পর্দার বিধানের লঙ্ঘন হয়।

হয়তো বাসার আশেপাশে কোনো ফ্ল্যাট নেই, একটু দূরে রয়েছে। তাই বাইরে থেকে কেউ দেখার চান্সই নেই! এমন ধারণাও ভুল। আধুনিক যুগে বাইনোকুলার লাগে না, ফোনের ক্যামেরা দিয়ে যেখানে লক্ষ মাইল দূরের চাঁদকেও নাকের ডগায় টেনে আনা যায়, সেখানে আপনার দেহের প্রতিটা ভাঁজ লম্পটদের দৃষ্টির আড়ালে যাবে কীভাবে!

কত পর্দানশীন বোন, বড় হওয়ার পর থেকে যাদের একটি চুলও হয়তো গাইরে মাহরাম দেখেনি, কিন্তু নিজের অজান্তেই তিনি পর্দাহীন হয়ে যাচ্ছেন। একটু অসতর্কতার কারণে তিনি অন্য কারও ফোনে ভিডিও হয়ে যাচ্ছেন। এরপর সুযোগ বুঝে ব্লাকমেইল, ইজ্জতহানি, সুখ ধ্বংস, চোখের কান্না, পেরেশানী—আরও কত কী!

এমন বহুবিধ সমস্যা শহরের বাসাবাড়িতে হয়। তাই এসব বাসাবাড়িতে পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরি। আপনার একটু অসতর্কতার কারণে আপনার অজান্তেই আপনি দেহকে কিছু লোকের দেখার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আপনি হয়তো গরমে কাপড় হালকা করে বসে আছেন, আর ভাবছেন যে, কাছাকাছি তো কোনো বাসা নেই। তাই কে আর দেখবে! অথচ আপনি জানেনই না, ঠিক সেই মুহূর্তেই কত জোড়া চোখ আপনাকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখছে। আপনি নিজেই একটু বাইরে তাকিয়ে দেখুন, দূরের কোনো ফ্ল্যাটের জানালার ফাঁক গলে আপনার দৃষ্টিতে কিন্তু ঠিকই অনেক কিছু ধরা পড়ছে। সুতরাং দূর থেকে আপনার রুমের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও অন্যের কাছে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।

আবার কখনো এমন হয় যে, পাশে অন্য ফ্ল্যাট থাকলেও হয়তো তাদের জানালা বন্ধ আছে। তাই কেউ দেখবে না মনে করে মা-বোনেরা রুমে বা রান্নাঘরে পর্দা ছাড়াই কাজকর্ম সারেন। অথচ একটু মাথা ওঠালেই দেখা যাবে, পাশের ফ্ল্যাটের ওপরের কোনো বাসা থেকে সবই দেখা যাচ্ছে। বরং আরও বিতিকিচ্ছিরিভাবেই দেখা যাচ্ছে।

এ-জাতীয় একটি বাস্তব ঘটনা বলি, ঘরের মহিলা বারান্দার দরজা অর্ধেক খোলা রেখে রুমের ভেতর কাজকর্ম করছিলেন। হঠাৎ গৃহকর্তা দেখতে পেলেন, পাশের বাসার ওপর তলার জানালার পর্দার ফাঁকে কারও চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে, যা তার রুমের দিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বারান্দায় গিয়ে ওপরে তাকাতেই চোখজোড়া হারিয়ে গেল নিমিষেই। গৃহকর্তা বুঝতে পারলেন যে, পাশের বাসার ওপর তলার ভেজানো পর্দার আড়াল থেকেই তার রুমের ভেতরে তাকানো হচ্ছিল!

এর চেয়েও আরও মারাত্মক ঘটনা হলো, একবার এক যুবককে কোনো অপরাধে গ্রেফতারের পর পুলিশ তার ফোনে দেখতে পেল, নির্দিষ্ট এক নারীর রুমের ভেতরের ব্যক্তিগত অবস্থার ভিডিও। তাকে জেরা করতেই সে স্বীকার করল যে,

পাশের বাসার রুমের ভেতরের দৃশ্য সে ফোনের ক্যামেরা জুম করে প্রতিনিয়তই ভিডিও করত। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্ল্যাকমেইল করা। কিন্তু কার্যসিদ্ধির আগেই সে ধরা পড়ে। গোপন ক্যামেরায় ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল করার এমন লোমহর্ষক সংবাদ আমাদের চোখের সামনেই অজস্র রয়েছে।

শহরের এসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফিতনাগুলো না জানার কারণে অনেক দ্বীনদার মা-বোনদের পর্দা নষ্ট হয়ে যায়। বড় হওয়ার পর থেকে কোনো গাইরে মাহরাম যাদের এক চুলও দেখেনি, একটু অসতর্কতার কারণে শহরের ফ্ল্যাটে তারা বেপর্দা হয়ে যাচ্ছে অজান্তেই।

এই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় কী? বেপর্দা হওয়া থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে হবে, আবার গরমের তাপ থেকেও বেঁচে থাকতে হবে, মাঝে মাঝে সূর্যের আলোও গায়ে লাগাতে হবে।

এর জন্য করণীয় হলো, আগে দেখতে হবে, কখন জানালার পর্দা পুরো খুলে রাখা জরুরি। প্রয়োজন ছাড়া জানালার পর্দা পুরো সরিয়ে রাখা উচিত না। বাতাসের প্রয়োজন হলে অর্ধেক জানালার পর্দা খুলে রেখে বাকিটুকু ঢেকে রাখাই ভালো। অথবা যে অংশ দিয়ে বাইরে থেকে দেখার সম্ভাবনা রয়েছে, সে অংশটুকু পর্দা দিয়ে রাখলেও হবে।

রুমের ভেতর হাঁটাচলার ক্ষেত্রেও সাবধান থাকা চাই। যেসব ফ্ল্যাটে বাইরে থেকে দেখার চান্স থাকে, সেখানে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত রুমের ভেতর ওড়না ছাড়া থাকা ঠিক না। ঘরের ভেতর কেউ না থাক, ফেরেশতার চলাচল থাকে। তাই তাদেরকে লজ্জা পেয়েও পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে সাবধান থাকা চাই।

বিছানায় শোয়ার সময় বিছানা বরাবর জানালা থাকলে পর্দা টেনে দেয়াই উত্তম। গরমের কারণে মাথার পাশে ছোট্ট ফ্যান ব্যবহার করা যায়। একান্ত জানালা খুলে রাখতে হলে বিকল্প সুরত হলো, জানালার ওপর দিকে খুলে রাখা, আর নিচের দিকে আলাদা পাতলা কাপড় টানিয়ে দেয়া। যাতে শোয়ার পর কেউ বাইরে থেকে দেখতে না পারে, আর ওপর দিয়ে ঘরের ভেতর হাওয়া-বাতাস চলাচল করতে পারে।

সবকিছুর মূলে হলো নিজের ভেতর শরীয়তকে মানার জযবা তৈরি করা। শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধানকে গুরুত্ব দেয়া। এসব বিধান আল্লাহ তাআলার

পক্ষ থেকেই এসেছে বলে বিশ্বাস করা। তাহলে শরীয়তকে মানা সহজ হয়ে যাবে। তখন আপনি নিজেই বুঝবেন, পর্দা নষ্ট করে, শরীরকে উদোম করে হাওয়া-বাতাস খাওয়া বা সূর্যস্নান করায় কোনো ফায়দা নেই। এটা সাময়িক উপকার পৌঁছালেও আপনাকে স্থায়ী আযাবের মুখোমুখি করে দেবে। বেপর্দা হয়ে সামান্য বাতাস ভোগ আপনাকে জান্নাতের বাতাস ভোগ করা থেকে যেন বঞ্চিত করে না দেয়।

রান্নাঘরের জানালা লাগিয়ে কাজ করা অসম্ভব। আবার সেখানে আগুনের কারণে পর্দাও লাগানো যায় না। তবে আপনি চাইলে এমনটা করতে পারেন যে, জানালার যে অংশটুকু দিয়ে দেখার সম্ভাবনা রয়েছে, সে অংশটুকু কোনো বোর্ড বা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। আর বাকি অংশ দিয়ে হাওয়া-বাতাস চলাচল করল। এতে গরমও কমল, পর্দারও সমস্যা হলো না। অথবা নিজ নিজ ঘর অনুযায়ী কীভাবে পর্দা রক্ষা করা যায়, এটা উপস্থিত ভেবে-চিন্তে বের করলেও হবে।

রুমের ভেতরের পর্দা

অনেকেই জানালায় পর্দার ব্যবস্থা করলেও রুমের ভেতরে পর্দা নিয়ে গাফলতি করেন। বেডরুম, ডাইনিং রুম, রান্নাঘর ইত্যাদিতে পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করেন না। কেউ কেউ সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য স্টাইলিশ রংবেরঙের পর্দা লাগান। যা আদতে শুধু স্টাইলের কাজই দেয়, পর্দা করা হয় না। এতে বাসায় কোনো গাইরে মাহরাম এলে পর্দার সমস্যা হয়। এ জন্য উচিত হলো, প্রত্যেক রুমের সামনেই বড় পর্দা থাকবে। সেই রুমে কোনো গাইরে মাহরাম এলে যেন পর্দা টেনে দেয়া যায়।

অনেক সময় এমন হয় যে, রুমের দরজায় পর্দা থাকলেও তা বাতাসে সরে যাওয়ার কারণে বেপর্দা হয়ে যেতে হয়। আরেক রুমের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। এ ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হবে। প্রয়োজনে পর্দার দুই কর্নারে পানি-ভরতি ছোট্ট বোতল বা ভারী কিছু বেঁধে দিতে হবে। যাতে বাতাসে পর্দা স্থানান্তরিত না হয়ে যায়। অথবা এ ক্ষেত্রে ক্লিপের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে।

বারান্দার পর্দা

শহরের বারান্দা দিয়েও বেপর্দা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বারান্দা

প্রয়োজনীয় একটি জায়গা। কাপড় শুকানো থেকে শুরু করে সকাল-বিকাল আলো-বাতাস উপভোগ করা অথবা ছোট্ট বাগান করার জন্য হলেও বারান্দার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত শহরের বাসা-বাড়িতে কাপড় শুকানোর জন্য বারান্দার বিকল্প নেই। কিন্তু আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে অথবা দূরের কোনো ফ্ল্যাট থেকেও কারও নজর পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মা-বোনদের উচিত বারান্দায় যাওয়ার সময় ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে যাওয়া। অনেক নারী গোসল করে এসে গায়ে ওড়না দেয়া ছাড়াই কাপড় শুকাতে বারান্দায় যান। তারা মনে করেন, আমি তো অনেক উঁচুতে আমার বাসার ভেতরেই আছি। এত উঁচুতে আর কে তাকাবে? অথচ পাশের বাসার বারান্দা থেকেই যে তাকে স্পষ্ট দেখা যায়, এটা তিনি ক্ষুণাক্ষরেও কল্পনা করছেন না। ফলে এমন অনেক দ্বীনদার নারীর পর্দাও নষ্ট হচ্ছে, যিনি বাইরে গেলে পরিপূর্ণই পর্দা করেন। তাই এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

অনেক মা-বোন বিকেলে ছোট শিশু নিয়ে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন। বিকেল বেলা বাসার ছাদে কম-বেশ সবাই ঘুরতে যায়। তাই সতর্ক থাকতে হবে যে, আশেপাশের বাসার ছাদ থেকে কারও নজর এদিকে পড়ছে কি না।

এসব সমস্যা থেকে বাঁচার একটি উপায় হলো, সম্ভব হলে পুরো বারান্দায় কাপড় দিয়ে পর্দা লাগিয়ে দেয়া। বাতাসের প্রয়োজন হলে প্রয়োজনমাফিক পর্দা সরিয়ে দেয়া। অন্য সময়ে পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা। অথবা বারান্দার গ্রিলের ওপরে যেদিক দিয়ে সাধারণত ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়, সেখানে পর্দা লাগিয়ে রাখা। নিচের দিকের অংশ খালি রাখা যায়। এতে বাইরের আলো-বাতাসও আসবে, আবার ভেতর থেকে বাইরের দৃশ্যও দেখা যাবে। এগুলো মূলত আপেক্ষিক বিষয়। প্রত্যেকে তার বারান্দার অবস্থা, আশেপাশের বাসার পরিবেশ বুঝে পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। মূল উদ্দেশ্য হবে, কোনোভাবেই যেন আমি পর্দাহীন হয়ে না পড়ি।

ছাদ যেন পর্দাহীনতার আরেক নাম

বিকেল বেলা বাসার ছাদ হয়ে ওঠে শহুরে বাসিন্দাদের জন্য এক টুকরো পার্কের মতোই। যানজটের এই শহরে ছাদ ছাড়া অন্য কোনো জায়গাও থাকে না বাতাস উপভোগ করার। তাই বিকেল হলেই নারী-পুরুষ সবাই ছাদে ওঠে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাতাস উপভোগের জন্য ছাদে আসা হলেও পরবর্তী

সময়ে ছাদ হয়ে যায় এক টুকরো বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো। ছেলে-মেয়েদের অবাধ আড্ডা, দিনশেষে কপোত-কপোতীদের সময় কাটানোর সুবর্ণ সুযোগ, অথবা পাশের বাসার ছাদের ছেলে-মেয়েদের সাথে খুনশুটির নামে ফষ্টিনষ্টি—এসব দৃশ্য শহরের ছাদগুলোতে খুবই চিরচেনা।

অনেক বোন বোরকা পরে ছাদ-বিলাস করতে যান। তারা হয়তো বোরকা পরেই গিয়েছেন, কিন্তু ছাদে যদি গাইরে মাহরাম ছেলেরা থাকে, তাহলে তো তার নজরের হেফাজত হলো না।

তাই এসব ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় হলো, এমন সময় ছাদে যাওয়া, যখন ছাদে অন্য কোনো গাইরে মাহরাম থাকে না। পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই কথা, ছাদে যদি নারীদের সংখ্যা বেশি থাকে, তাহলে দৃষ্টি হেফাজত করতে চাইলে তখন ছাদে না যাওয়াই ভালো হবে।

নিজের বাসার কোনো গাইরে মাহরাম তখন ছাদে না থাকলেও আশেপাশের ছাদ থেকে কিন্তু অনেকেই দেখতে পারে। তাই ছাদে গেলে পূর্ণ পর্দার সাথেই ছাদে যেতে হবে।

চিলেকোঠায় বাসা

কোনো কোনো বাসার ছাদের চিলেকোঠায় একটি ফ্ল্যাট থাকে। অর্থাৎ ছাদের এক কোনায় ছোট্ট ফ্ল্যাট থাকে। তাদের জন্য পর্দা রক্ষা খুব কঠিন। কারণ চারপাশের বাসা থেকে তাদের ঘরের ভেতর দৃষ্টি দেয়া খুব সহজ। বেডরুম থেকে শুরু করে রান্নাঘর সবই থাকে অন্যের নজরের সীমানার মধ্যেই। তাই খুব সমস্যা না হলে এ ধরনের বাসায় না থাকাই ভালো। একান্ত থাকতে হলে ওপরে বর্ণিত জানালায় পর্দা দেয়ার পদ্ধতিগুলো মানতে হবে।

লিফটে পর্দা

বাসা-বাড়িতে বা শপিংমলের লিফটে পর্দা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে একটু অসাবধানতার কারণে শ্লীলতাহানির মতো ঘটনাও ঘটে।

মা-বোনদের কেউ কেউ ময়লা ফেলার জন্য, অথবা বাসার সামনের দোকান থেকে কিছু আনার জন্য, কিংবা ছোট কোনো কাজের জন্য বাসার লিফট দিয়ে

পর্দা ছাড়াই নেমে যান। তারা ভাবেন, লিফট তো খালিই আছে, আর দূরে তো কোথাও যাব না। তাই পর্দার প্রয়োজন নেই। অথচ এমনও তো হতে পারে যে, তিনি যেই ফ্লোর থেকে লিফটে উঠেছেন, সেখান থেকে না হয় লিফট খালিই নেমেছে, কিন্তু পরের ফ্লোর থেকেই তো কোনো গাইরে মাহরাম উঠতে পারে। অথবা ওঠার সময়ও তো কোনো গাইরে মাহরাম সাথে লিফটে উঠতে পারে।

এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, লিফটে একাকী কোনো গাইরে মাহরামের সাথে ওঠা-নামা না করা। এটা পর্দার জন্য সহায়ক এবং কোনো অযাচিত ঘটনা থেকে সতর্কতাস্বরূপ। তবে লিফটে অন্য নারী থাকলে ভেবে-চিন্তে ওঠা যায়।

আর কোনোভাবেই বেপর্দা হয়ে লিফটে ওঠানামা করা যাবে না। চাই তা শুধু বাসার নিচের কাজ হোক না কেন। পূর্ণ পর্দার সাথেই ঘরের বাইরে নামা জরুরি।

ঈদের সময়গুলোতে শপিংমলের লিফটে অনেক ভিড় হয়। নারী-পুরুষ সবাই গাদাগাদি করে লিফটে ওঠেন। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এই কাজ থেকে মা-বোনদের বিরত থাকা উচিত। উচিত তো ছিল নারী-পুরুষের জন্য ভিন্ন লিফট থাকবে। মা-বোনেরা পর্দার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে লিফট দিয়ে ওঠানামা করবেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে নারীদের জন্য পর্দাবান্ধব পরিবেশ আমরা দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।

তবে এ ক্ষেত্রে পরামর্শ হলো, ঈদের সময়ে মার্কেটে নারীদের না যাওয়াই উচিত। এতে পর্দার খেলাফ হওয়ার শঙ্কা থেকেই যায়। মার্কেট করবেন ঘরের পুরুষগণ। প্রয়োজনে পুরুষদের সাথে নারীরাও যেতে পারেন, তবে সেটা রমজানের আগে হতে পারে। তাহলে অযথা ভিড় থেকেও বাঁচা যাবে এবং রমজান মাসে আমলে বেশি সময় দেয়া যাবে, অনেক গুনাহ থেকেও বাঁচা যাবে। প্রত্যেক ঈদের সময় ভিড় ঠেলে মার্কেট করার রুসুম থেকে আমাদের বেঁচে থাকা জরুরি।

লিফটে নারী-পুরুষ একত্রে গাদাগাদি করে ওঠার চেয়ে একটু দেরি করে ভিড় কমলে ওঠা, অথবা সরাসরি সিঁড়ি দিয়ে কষ্ট করে উঠে যাওয়াই ভালো।

থাই গ্লাসে দিন-রাতের মারপ্যাঁচ

এখন বাসার জানালা বা দরজায় সাধারণ কাচের বদলে থাই গ্লাস লাগানো হয়। এসব গ্লাসের একটি বিশেষত্ব হলো, দিনের বেলা সূর্যের আলোয় রিফলেকশনের কারণে বাইরে থেকে ভেতরের দৃশ্য দেখা যায় না। তবে রাতের বেলা বাইরে

থেকে স্বচ্ছভাবেই ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়। থাই গ্লাসের এই মারপ্যাঁচ অনেকেই বুঝতে পারেন না। ফলে তারা সন্ধ্যার পর জানালার গ্লাস টেনে দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যান। এদিকে বাইরে থেকে যে ভেতরের সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এটা তারা বুঝতে পারেন না। তাই থাই গ্লাস টেনে দিলেও তার ওপর পর্দা দিয়ে রাখতে হবে। যাতে রাতের বেলা বাইরে থেকে কিছুই দেখা না যায়। আবার অনেক সময় জানালার কাচে ঘরের দৃশ্য ফুটে ওঠে, যা অন্য বাসা থেকেও সুস্পষ্ট বোঝা যায়। এ জন্য উচিত হলো, জানালা খোলা থাকলেও পাতলা নেট জাতীয় পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া, যাতে ঘরের দৃশ্য জানালায় ফুটে না ওঠে।

মেহমান এলে করণীয়

বাড়িতে মেহমান এলে সর্বপ্রথম করণীয় হলো, পুরুষ মেহমানকে পুরুষদের রুমে বসতে দিতে হবে আর নারী মেহমানকে নারীদের রুমে বসতে দিতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর বেডরুমে পুরুষদের বসানো উচিত না। বেডরুমে অনেক সময় কাপড় ঝোলানো থাকে, ব্যক্তিগত জিনিস থাকে। মহিলাদের ব্যবহার্য অনেক কিছুই থাকে বেডরুমে। তাই গাইরে মাহরাম কাউকে বেডরুমে বসানো উচিত না।

যে রুমে মেহমান বসবে সেই রুমের দরজায় পর্দা পুরোপুরি টানিয়ে দিতে হবে। যাতে অন্য রুমে দৃষ্টি না পড়ে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, মেহমানের বসার স্থান দরজা বরাবর না করা। তাহলে বাতাসে পর্দা ওড়ার কারণে অন্য রুমের দৃশ্য চোখে পড়বে না। পাশের রুমে হয়তো ঘরের মহিলারা মেহমানের জন্য নাশতা তৈরি করছেন, তাই রুমের ভেতর তাদের হাঁটাহাঁটির প্রয়োজন পড়ে। মেহমান যদি দরজা বরাবর বসেন, তাহলে মহিলাদের পর্দার ব্যাঘাত ঘটবে স্বাভাবিকভাবেই।

মেহমান এলে ঘরের মা-বোনদের অন্যতম একটি করণীয় হলো, নিম্নস্বরে কথা বলা। মেহমান থাকা অবস্থায় ঘরে কোনো উচ্চবাচ্য না করা। বাচ্চাদের জোরে ধমক না দেয়া। এটা মেহমানের চোখে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। এতে তার মনে এই ঘরের মহিলাদের ব্যাপারে নিচু ধারণা চলে আসে।

এ ক্ষেত্রে আরও একটি আদাবের ব্যাপার হলো, হাঁড়ি-পাতিল বা কাপ-পিরিচে টুংটাং শব্দ না করা। খুব সাবধানে খাবারদাবার তৈরি করা। অনেক ঘরেই পাতিলের তলা আঁচড়ে সেমাই তোলার শব্দ পাওয়া যায়। এতে মেহমান মনে

করতে পারেন যে, তার জন্য সব সেমাই দিয়ে তারা মনে হয় পাতিলের তলার অংশটুকু খাচ্ছেন। এতে তিনি লজ্জা পেতে পারেন।

মেহমানের খাবার তৈরি হলে ঘরের পুরুষই গিয়ে খাবার নিয়ে আসবেন। অথবা ছোট সন্তান দিয়েও পাঠানো যেতে পারে। তবে কোনোক্রমেই সাবালিকা মেয়ে অথবা এর কাছাকাছির বয়সের মেয়েকে দিয়ে নাশতা পাঠানো যাবে না। ঘরে যদি নাশতা আনার মতো অন্য কেউ না থাকে, তাহলে নাশতা তৈরি হওয়ার পর ঘরের মহিলারা দরজায় শব্দ করে ইশারা দেবেন, যাতে পুরুষ গিয়ে নাশতা আনতে পারেন। অনেক রুমে দরজা থাকে না, শুধু পর্দা থাকে, তাই দরজায় শব্দ করারও সম্ভব হয় না, তখন মহিলারা পাশের রুম থেকে হালকা আওয়াজে কাশি দিয়ে ইশারা করতে পারেন।

মেহমানের রুমে শোকেজ বা ক্রোকারিজ জিনিসপত্র রাখা উচিত না। কারণ মেহমান এলে এসবের প্রয়োজন পড়ে। অনেক ঘরে দেখা যায় মেহমানের সামনেই মহিলারা শুধু মুখ ঢেকেই শোকেজ থেকে জিনিস নামিয়ে নিয়ে যান। এতেও তো পর্দার খেলাফ হলো। একান্ত কারও ঘরে যদি মেহমানের রুমেই এসব থাকে, তাহলে ঘরের মহিলারা পুরুষকে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, অমুক অমুক জিনিস নামিয়ে আনতে হবে। মোটকথা পর্দার খেলাফ করে কোনোভাবেই এসব কাজ করা যাবে না।

ঘরে যদি একটিই রুম হয়, তাহলে ঘরের পুরুষদের উচিত নয় গাইরে মাহরাম কাউকে ঘরে মেহমান হিসেবে আনা। কেউ আসতে চাইলে তাকে নিয়ে অন্য কোথাও রেস্টুরেন্টে বা পার্কে, খোলা মাঠে বসা। সবাইকে বুঝিয়ে বলা, বাসায় মহিলারা পর্দা করেন, তাই বাসায় না নিতে পেরে আপনি অত্যন্ত দুঃখিত।

যদি এই অবস্থায় কাউকে বাসায় আনতেই হয়, তাহলে মহিলারা রুমের ভেতর থাকবেন না। কেউ কেউ মুখ ঢেকে রুমের এক কোণে বসে থাকেন, এটাও ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের আবশ্যক হলো, মেহমানকে নিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেরেই ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া। ততক্ষণ মহিলারা রান্নাঘরে বা বারান্দায় অথবা পাশের ঘরে মহিলাদের সাথে গিয়ে থাকা। নাশতার প্রয়োজন হলে মহিলারা রান্নাঘরে বসেই ইশারা দিলে পুরুষ গিয়ে নাশতা নিয়ে আসা। তবে এসব বাসায় রান্নাঘরের সামনে দরজা থাকা অথবা রুম আর রান্নাঘরের মাঝামাঝি লম্বা পর্দা টানিয়ে নেয়া উত্তম।

পুরুষহীন ঘরে গাইরে মাহরাম মেহমান আসা অবশ্যই গর্হিত কাজ। সামাজিকভাবেও এটাকে খারাপ চোখে দেখা হয়, আর শরীয়তের দিক দিয়েও এটা নিন্দনীয় কাজ। একান্ত কোনো প্রয়োজন হলে মেহমানের উচিত ঘরের বাইরে থেকেই প্রয়োজনীয় কথা সেরে চলে আসা। যদি ঘরের ভেতরে যেতেই হয়, তাহলে ঘরের মহিলার উচিত পাশের ঘর থেকে অন্য মহিলাকে ডেকে এনে সাথে রাখা।

কোথাও বেড়াতে গেলে

এ বিষয়ে আলোচনার আগে একটি ঘটনা বলি। এক ছোট ভাই। বাড়ির সবাই দ্বীনদার। সেও সুরতে দ্বীনদার। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ভালো নয়। সে একদিন এসে কথায় কথায় বলল ভাই অমুক বাড়ির মেয়েরা খুব সুন্দর!

বললাম, তারা তো পর্দা করে। তাহলে তুই জানলি কীভাবে তারা খুব সুন্দর!

বলল, একবার তারা আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল। আম্মা আমাকে বাসার বাইরে যেতে বলল। আমি তখন মোবাইলে ভিডিও অন করে ওয়ারড্রোবের ওপর চার্জে লাগিয়ে মোবাইলটা রুমের দিকে কাত করে রেখে চলে যাই। পরে এসে ভিডিও দেখি।

বললাম, একটা দ্বীনদার পরিবারের সন্তান হয়ে আরেকটা দ্বীনদার পরিবারের মেয়েদের সাথে এমন আচরণ কীভাবে করলি? এক্ষুনি ডিলিট কর।

বলল, ভাই দেখেই ডিলিট করে দিয়েছি।

আশা করি পাঠক এতক্ষণে বিষয়টা বুঝে গিয়েছেন। তাই কোথাও বেড়াতে গেলে যে রুমে বা ঘরে আপনাকে বসতে দেবে, তার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া চাই।

দাওয়াত ও তাবলীগের মাস্তুরাত (পুরুষসহ মা-বোনদের) জামাতের অন্যতম একটি নিয়ম হলো, মা-বোনরা যে বাসায় যাবেন, গিয়েই সেখানকার পর্দার পরিস্থিতি যাচাই করবেন। কোনো কমতি থাকলে তা ঠিক করে নেবেন। ঠিক না হওয়ার আগ পর্যন্ত বোরকা বা নিকাব খুলবেন না।

বিয়ে-বাড়ির পর্দা

আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি দ্বীনকে অমান্য করা হয় বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে। এ জন্যই বলা হয়, মানুষের দ্বীনদারি বোঝা যায় দুই ক্ষেত্রে, বিয়ে-শাদীতে আর লেনদেনের ক্ষেত্রে। বহু দ্বীনদার মানুষ এই দুই ক্ষেত্রে ধরা খেয়ে যান। বহু মানুষের আসল রূপ প্রকাশ পেয়ে যায় এই দুই কাজে। বিশেষ করে বিয়ে-শাদীতে শরীয়ত-বিরোধী কাজ করা এখন সামাজিক ব্যাধির রূপ ধারণ করেছে। মানুষ মনে করে, প্রচলিত পন্থায় বিয়ে না হলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। একটা মাত্র সন্তানের বিয়েতে যদি খরচ না করি, তাহলে মানুষ কী বলবে! জীবনে এরচেয়ে ব্যর্থতা আর কিছুই থাকবে না। একদিন না হয় সবাই একটু এনজয় করল, আনন্দ-ফুর্তি করল। এসব তো আর সারা জীবন হবে না। সুতরাং কোনো সমস্যা নেই। এমন আজগুবি যুক্তি তারা এসব শরীয়ত-বিরোধী কাজের ক্ষেত্রে পেশ করেন।

অনেক দ্বীনদার ব্যক্তির বিয়ের সময়ও দেখা যায়, তারা সুন্নাহ অনুসারে বিয়ের পরিবর্তে সমাজের প্রচলিত নিয়মে বিয়ে করছেন। যাতে সুন্নাতের কোনো নামগন্ধই থাকে না। শুধু ইজাব-কবুলের যে নিয়মটি শরয়ীভাবে হয়, সেটাও হয় পুরুষ-মহিলা সবাই একসাথে বসে। এ জন্যই বলা হয়, মানুষের দ্বীনদারি প্রকাশ পায় তার বিয়ে আর লেনদেনের সময়। এমনকি বিয়েতে কী কী কাজ সুন্নাত আর কী কী কাজ শরীয়ত-বহির্ভূত এটাও অনেকে জানেন না। আবার অনেকে জানলেও স্পষ্ট হারাম কাজে জড়িয়ে পড়েন সমাজের দোহাই দিয়ে। দুনিয়াতে সমাজের ভয়ে আমি যদি এসব হারাম ও গর্হিত কাজ করতে পারি, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন মুখে দাঁড়াব?

আরও ভয়ংকর কথা হলো, অনেকেই এসব সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়ে ব্যাংক থেকে চড়া সুদে বিশাল অঙ্কের টাকা লোন নিয়ে বসেন। মাওলানা তারিক জামীল সাহেব এক বয়ানে শোনাচ্ছিলেন, করাচির এক ব্যক্তি চল্লিশ লাখ টাকা খরচ করে তার ছেলেকে বিয়ে করায়। পরে শোনা যায় পুরো টাকাটাই তিনি ব্যাংক থেকে চড়া সুদে লোন নিয়েছেন! আচ্ছা এখানে তার কয়টি গুনাহ হলো বলতে পারবেন? সুদ, শরীয়ত-বর্জিত রুসম-রেওয়াজ পালন, অপচয়, বেপর্দা এমন অসংখ্য গুনাহের বোঝা এখন তার কাঁধে উঠে গিয়েছে। মানুষ

কিয়ামতের দিন একটি গুনাহের ভারের কারণেই জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে, আর এখানে অসংখ্য গুনাহকে যেন কোনো গুনাহই মনে করা হচ্ছে না। আরও আশ্চর্য হওয়ার কথা হলো, খোঁজ নিলে দেখা যাবে এসব বিয়ে কোনো কাফের-মুশরিকের বিয়ে নয়; বরং দ্বীনের লেবাস লাগানো কোনো ব্যক্তিরই বিয়ে! তারাও কিন্তু নামাজ পড়েন, আল্লাহ্ তাআলাকে রব হিসেবে স্বীকার করেন; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যে সমস্ত কাজ হারাম করেছেন, তারা সেগুলো সামাজিকতার ভয়ে ছাড়তে রাজি নয়। অনেকেই বলে, আরে হুজুর, একদিনের জন্যই তো! সারা জীবন তো আর বিয়ে করব না। এখন একটু খরচ করলে কীই-বা হবে! পরে না হয় তাওবা করে নিলাম। এসব কথা মূলত দ্বীন নিয়ে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিয়ে-শাদীর সব ধরনের অশ্লীলতা নিয়ে এখানে লেখা উদ্দেশ্য নয়, এখানে শুধু পর্দার ব্যাপার নিয়ে লেখা উদ্দেশ্য। তবে বিয়ে-শাদীতে সবচেয়ে বেশি অবহেলা এই পর্দা নিয়েই হয়।

পাত্রী দেখার হালচাল

আমাদের সমাজের প্রচলন হলো, বিয়ের আগে পাত্রী দেখতে যায় ছেলের বাবা-চাচা, মামা, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি লোকজন। তারা দেখে পছন্দ করলে এরপর ছেলে যায়। অর্থাৎ প্রথমে পছন্দে করতে যায় ছেলের পুরুষ আত্মীয়স্বজন। অথচ শরীয়ত অনুযায়ী এটা সম্পূর্ণই হারাম। তারা ভাবেন, ছেলের পিতা তার হবু বৌমা না দেখলে কি হয়? এ কাজটি জায়েয নয়। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এই মেয়েটি ছেলের পিতার জন্য দেখা জায়েয নেই। সুতরাং এ কাজটি বর্জন করা জরুরি।[৭৯]

প্রিয় বোন! যে ছেলে বিয়ের আগেই তার বন্ধুবান্ধবকে আপনাকে দেখায়, সে বিয়ের পর আপনার পর্দা রক্ষা করবে না, আপনাকে পর্দা করতে দেবে না—এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। সমাজের এই অসুস্থ প্রচলন আপনাকে দূর করতে হবে। বংশের আর কারও এই পদ্ধতি ছাড়া বিয়ে হয়নি, না হোক, সমাজের এই নোংরা সংস্কৃতির মুখে আপনিই প্রথম চুনকালি মেখে দিন। আপনি

৭৯. দ্রষ্টব্য : সূরা নূর, ৩০-৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৩৪২৪; রদ্দুল মুহতার, ৫/২৩৭; রওজাতুত তালেবীন, ৭/২০

অনড় থাকুন, পাত্র ছাড়া আর কোনো পুরুষ আপনাকে যেন না দেখতে পারে। এমনকি পাত্রের বাবাও না। যেই ছেলে অন্য কোনো পুরুষকে দিয়ে আপনাকে দেখাতে চায়, সেই ছেলের কাছে আপনি নিরাপদ নন। কারণ বিয়ের পরও সে আপনার ছবি তার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। আপনাদের অন্তরঙ্গ ছবিগুলোও শেয়ার করবে।

হ্যাঁ, পাত্রপক্ষের মহিলারা যত খুশি আপনাকে দেখুক, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

সমাজে প্রচলিত আরও বিভিন্ন অপসংস্কৃতি, যেমন : পুরুষদের সামনে মেয়েকে হাঁটতে বলা, মেয়ের চুল দেখা, মেয়ের হাত-পা দেখা, গাইরে মাহরাম পুরুষেরা মেয়েকে লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদি সব কাজই শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

এমনকি বিয়ের কনে দেখতে গেলে পাত্রের জন্য শুধু পাত্রীর চেহারা এবং দুহাত কবজি পর্যন্ত ও দু-পা টাখনু গিরা পর্যন্ত দেখা জায়েয। এ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ, এমনকি হাতের কবজি থেকে ওপরের অংশ এবং পায়ের গিরার ওপরের অংশ দেখাও নাজায়েয। আর পাত্রীর হাত বা কোনো অঙ্গ স্পর্শ করাও জায়েয নয়। তাই পাত্রের জন্য পাত্রীকে আংটি পরিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। আংটি পরিয়ে দিতে চাইলে পাত্রপক্ষের মেয়েদের কেউ গিয়ে পরিয়ে দিতে পারে। অথবা পাশে পাত্রীর মাহরাম যারা থাকে তাদের কাছে দিয়ে দেয়া যেতে পারে।[৮০]

তবে আংটি পরানো ইসলামী কোনো রীতি নয়, এটা সম্পূর্ণই বিজাতীয় রীতি। আংটি পরিয়ে দিলে বিয়েও হয়ে যাবে না। এটা মূলত কিছুই না। বিয়ের মূল হলো সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল হওয়া। তাই বিয়েতে আংটি পরানো বা এ-জাতীয় বিজাতীয় রীতিগুলো পরিহার করা আবশ্যক।

ঘটকের কাছে ছবি দেয়া

পাত্র ঠিক করার জন্য ঘটকের কাছে ছবি দেয়ার প্রচলন রয়েছে বহু আগ থেকেই। প্রথম কথা হচ্ছে ঘটককে ছবি দিলে ঘটক তো অবশ্যই দেখবে, এতে পর্দার লঙ্ঘন হবে, তাই ঘটকের কাছে ছবি দেয়া যাবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ছবি আদানপ্রদান বা মেয়ে দেখার পর্ব তো হবে উভয় পরিবারের বিস্তারিত

৮০. দ্রষ্টব্য : তাবয়ীনুল হাকায়েক, ৭/৪০; বাদায়েউস সানায়ে, ৪/৩০১; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩৭০; ইলাউস সুনান, ১৭/৩৮০

জানাশোনার পর—যখন বিয়ের আগ্রহ সৃষ্টি হবে এর পরে। এর আগে অযথা মেয়ে দেখে বেড়ানো দৃষ্টিকটু কাজ। এ থেকে বিরত থাকা উচিত।

ঘটকের মাধ্যমে বিয়ের কাজ আগাতে চাইলে তার কাছে শুধু বায়োডাটা দেয়া যাবে। কোনো ছেলে এসব দেখে আগ্রহবোধ করলে এরপর সরাসরি ছেলে এসে মেয়ে দেখে যাবে। ঘটকের কাছে মেয়ের ছবি দেয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয।

পাত্রীর ছবি তুলে নিয়ে যাওয়া

ছেলেপক্ষের মহিলারা পাত্রীর ছবি তুলে নিয়ে যান পরিবারের অন্যান্য মহিলা বা ছেলেকে দেখানোর জন্য। শুধু এটুকুতে কোনো সমস্যা নেই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা এটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এই ছবি পরিবারের অন্যান্য পুরুষের কাছেও চলে যায়, তারাও দেখে। তাই ছবি তোলাই উচিত না। তবে কোনো পরিবারের দ্বীনদারির ওপর যদি আস্থা হয়, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। আর পাত্রপক্ষেরও বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত, শুধু পাত্র বা মহিলাদের ব্যতীত অন্য কাউকে ছবি দেখানো জায়েয নেই। এটা সুস্পষ্ট আমানতের খেয়ানত হয়। একজন মেয়েকে অন্যের কাছে পর্দাহীন করে দেয়ার দায়ভারও মাথায় নিতে হবে।

পরিচয় হওয়ার নামে বিয়ের আগে ঘুরতে যাওয়া

এটাও এখন সামাজিক রীতি হয়ে গিয়েছে যে, পাত্রীকে দেখার নাম করে, তার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য ছেলে-মেয়ে দুজনে ঘুরতে যাওয়া। বিয়ের আগে এভাবে ঘুরতে যাওয়াকে ইসলাম সমর্থন করে না।

পাত্রী দেখার আগেই পাত্রীর ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে হবে। পাত্রী কতটুকু পড়েছে, কী করে, জন্ম কোথায়, কয় ভাই-বোন, কোথায় পড়ালেখা করেছে ইত্যাদি বিষয়গুলো আগে থেকেই জেনে নিতে হবে। এগুলো জানার উসিলা দিয়ে ছেলে-মেয়ে একাকী কোথাও ঘুরতে যাওয়া, কোনো রেস্টুরেন্টে বসা, পার্কে বসা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নাজায়েয।

তবে বাসায় যদি মেয়ে দেখার মতো পরিবেশ না থাকে, তাহলে মাহরাম আত্মীয়স্বজন মিলে পূর্ণ পর্দার সাথে কোনো ভালো পরিবেশে অথবা এমন কোনো রেস্টুরেন্টে যেখানে পর্দার কোনো সমস্যা হবে না, সেখানে মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিয়ের আগে কথোপকথন

বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হওয়ার পর মেয়ের সাথে ফোনে বা মেসেজে দিনের পর দিন কথা বলার মতো হারাম কাজ এখন অহরহ চলছে। অনেক দ্বীনদার লোকও এটাকে কোনো গুনাহই মনে করছে না। তারা মনে করে, বিয়ের দিন-তারিখ তো ঠিক হয়েই গিয়েছে, অথবা আংটি তো পরানো হয়েছে, সুতরাং এখন তাদের কথাবার্তা বলতে সমস্যা কোথায়! আর কয়েক দিন পরে তো তারা চিরজীবনের জন্য একসাথেই হয়ে যাবে। অথচ এটা সহজেই বোঝার কথা যে, শুধু দিন-তারিখ ঠিক হওয়া বা আংটি পরিয়ে দিলেই বিয়ে হয়ে যায় না। তখন কিন্তু তাদেরকে কেউ একসাথে নির্জনেও থাকতে দেবে না। এটা সবাই বুঝলেও তখন যে ছেলে-মেয়ের একসাথে ঘুরতে যাওয়া বা ফোনে-মেসেজে যোগাযোগ রাখাও জায়েয নেই, এটা বুঝতে চায় না অনেকেই। বিয়ের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছেলে-মেয়ের জন্য কোথাও ঘুরতে যাওয়া অথবা ফোনে কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ হারাম। আবার অনেক ছেলে-মেয়ে বিয়ের আগে একসাথে মার্কেটও করতে যায় বিয়ের জন্য। তারা মনে করে, আমাদের যেহেতু বিয়ে ঠিক হয়েই গিয়েছে, তাই এখন একসাথে বিয়ের মার্কেট করতে সমস্যা কোথায়! আমরা আমাদের পছন্দমতো মার্কেট করব। এ-জাতীয় কাজও সুস্পষ্ট হারাম।

বিয়ের দিনের কার্যকলাপ

এ দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ দিনেই একটি দাম্পত্যের শুরু হয়। অথচ এ দিনটিই অতিবাহিত হয় অসংখ্য বড় বড় গুনাহের মধ্যে দিয়ে। এখানে শুধু পর্দা-কেন্দ্রিক কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।

বিয়ের আগের রাতে গায়ে হলুদের যে প্রচলন আমাদের সমাজে দেখা যায়, ইসলাম এর সমর্থন করে না। হিন্দুয়ানি রীতি থেকে আমাদের মাঝে চলে আসছে এই রীতি। ভাবি, মামি থেকে শুরু করে গাইরে মাহরাম কাজিন সবাই এসে গায়ে হলুদ মেখে যায়, কেউ আবার মুখে ওড়না দিয়ে হলুদ মেখে যায়। আফসোসের বিষয় হলো, অনেক দ্বীনদার ব্যক্তির বিয়েতেও এসব শরীয়ত-বিরোধী কার্যকলাপ হয়ে থাকে। এসব কাজকে তারা ইজাব-কবুলের মতো আবশ্যক মনে করে। অর্থাৎ ইজাব-কবুল ছাড়া যেমন বিয়ে হয় না, তারা মনে করে যে, এসব ছাড়া বিয়ে হবে না।

আরও একটি লজ্জাজনক কাজ হলো, স্ত্রীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পণ্যের মতো স্টেইজে বসিয়ে রাখা। এরপর অসংখ্য নারী-পুরুষ এসে দলে দলে স্ত্রীকে দেখবে। এর মধ্যে কিছু লম্পট মানুষ লোভাতুর দৃষ্টিতে স্ত্রীকে খুঁটে খুঁটে দেখে পরস্পর অশালীন কোনো মন্তব্য করে বসবে। একজন স্বামীর জন্য এরচেয়ে লজ্জাজনক আর কিছুই হতে পারে না। একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন পুরুষের তো তখন মরে যাওয়ার কথা, তার স্ত্রীকে পুরুষেরা দলে দলে এসে খুঁটে খুঁটে সব দেখছে। মনে মনে বিভিন্ন অশ্লীল কল্পনা করছে, মন্তব্য করছে। শুধু এতেই ক্ষান্ত নয়, অসংখ্য মোবাইল আর ক্যামেরা দিয়ে সেই দৃশ্য রেকর্ড করা হচ্ছে। এরপর আরও অসংখ্য মানুষের কাছে তা পৌঁছে যাচ্ছে। পাছে কত লোক মন্তব্য করেও বসছে, অমুকের বউ সেই একটা... রে!

আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ করেছেন পর্দার বিধান দিয়ে। এর মাধ্যমে আমাদের ফুলের পাপড়ির মতো মা-বোনেরা নিজেদের ইজ্জত-আবরু রক্ষা করতে পারে। কোনো পাপড়িই ঝরে পড়ে না। হারায় না কোনো বোন তার সতীত্ব। হ্যাঁ, প্রশ্ন আসতে পারে, বোরকা পরিধান করার পরেও তো অনেক নারী সতীত্ব হারায়। আমরা এটার উত্তরও সামনে দেব ইনশাআল্লাহ।

এসব ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় হলো, বিয়ের আগেই উভয় পরিবার এসব ব্যাপারে আলাপ চূড়ান্ত করে নেয়া যে, কী কী কাজ বিয়েতে করা যাবে না। এ ব্যাপারে অনড় থাকতে হবে যে, কোনো পক্ষই বিয়েতে শরীয়ত-বিরোধী কোনো কাজ করবে না। শরীয়তের হুকুমের ব্যাপারে কেউ বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না। যদি কেউ শরীয়তের বিধান মানতে আমতা আমতা করে, সামাজিকতার দোহাই দেয়, তাহলে অনুগ্রহ করে এমন পরিবারে বিয়ে করবেন না। এমন পরিবারে আপনার মেয়ে বা বোনকে তুলে দেবেন না।

আপনার মেয়ে বা বোনকে যদি এমন পরিবারের কাছে তুলে দেন, যারা পর্দার বিধান পরিপূর্ণ মানে না, তাহলে নিজের মেয়ে বা বোনের পর্দা লঙ্ঘনের দায়ভার বহন করতে প্রস্তুত হন।

বিয়ের পর দেখতে আসার হিড়িক

বিয়ের পর প্রথম কিছুদিন বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনসহ এলাকার পাড়া-প্রতিবেশীরাও

বর-কনেকে দলবেঁধে দেখতে আসে। চাচি শাশুড়ি, মামি শাশুড়ি, খালা শাশুড়ি, দূর সম্পর্কের চাচি, ভাবি ইত্যাদি বিভিন্ন গাইরে মাহ্‌রাম আসে বরকে দেখতে। অপরদিকে কনেকে দেখতেও এমন গাইরে মাহ্‌রাম আত্মীয়স্বজন আসে। এমনকি যারা পর্দা মেনে চলেন তাদের অনেকেই পর্দার ফাঁক দিয়ে বর-কনেকে 'এক নজর' দেখে যান। 'এক নজর দেখলে তো সমস্যা নেই', হাদীসের এমন অপব্যাখ্যাও করেন কেউ কেউ। অথচ শরীয়তে সবগুলো কাজই নাজায়েয। এই এক নজর দেখা যেন আপনার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ না হয়। এখানে এক নজর দেখা তো দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরবর্তী সময়ে এটা নিয়ে গবেষণা করা হয়, অমুকের বর দেখতে এমন, অমুকের বিবি দেখতে এমন। দৈহিক অবয়ব নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করা হয়।

তাই উচিত হলো, বিয়ের আগেই সব জেনে নেয়া যে, পরিবারের সবাই পরিপূর্ণ পর্দা করে, নাকি কোনো রকম পর্দার বিধান মানে। প্রয়োজনে সব ব্যাপারেই বিস্তারিত আলাপ করে নেয়া যে, বিয়ের পর পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে এসব রুসম পালন করা যাবে না কোনোভাবেই। এরপরও যদি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে পর্দার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় না দেয়া; বরং বুঝিয়ে বলা যে, এভাবে গাইরে মাহ্‌রামের সামনে যাওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। শুধু আজকের দিন কেন, যেকোনো দিনই এক মুহূর্তের জন্য পর্দার বিধান লঙ্ঘন করার অনুমতি শরীয়ত দেয় না কোনোভাবেই।

বিয়ের অনুষ্ঠান

বিয়ের আগে-পরে মিলিয়ে বেশ কিছুদিন অনুষ্ঠান হয়। এসব অনুষ্ঠানে অসংখ্যভাবে পর্দার বিধান লঙ্ঘন হয়। ভাবসাবে মনে হয়, এই কয়দিনের জন্য পর্দার বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। আফসোসের বিষয় হলো, অনেক দ্বীনদার ব্যক্তিও এই ফিতনায় জড়িয়ে পড়েন। আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে না এলে মানুষ কী বলবে, এ কারণে তারা এসব বিয়েতে এসে বেপর্দা হয়ে যান। এর অনেকগুলো সুরত হতে পারে :

বিয়ের আগে-পরে মেহমানের আনাগোনা

গ্রামাঞ্চলে এটা বেশি দেখা যায়, বিয়ের সপ্তাহখানেক আগ থেকেই বাড়িতে

মেহমানের আনাগোনা শুরু হয়। বিয়ের পরেও কয়েক দিন পর্যন্ত মেহমানদারি চলতে থাকে। বংশের কারও বিয়ে হলে এভাবে দলবেঁধে মেহমান হওয়ার রেওয়াজ বহু আগ থেকেই চলে আসছে। এবং এটাকে বংশীয় গৌরবও মনে করা হয় যে, অমুকের বিয়েতে এত এত মেহমান এসেছিল। ঘর-ভরতি মেহমানকে টানা কয়েক দিন মেহমানদারি করা হয়েছে। কিন্তু এই গৌরবের ফাঁক গলেই যে শরীয়তের একটি ফরজ বিধানের মারাত্মক লঙ্ঘন হয়ে গেল, এ ব্যাপারে কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। মেহমান প্রচুর হওয়াতে ঘরে জায়গার সংকুলান হয় না। ফলে একই ঘরে খাটে, মাটিতে মিলিয়ে নারী-পুরুষ সবাই একসাথে গাদাগাদি করে ঘুমায়। আবার এমনও হয় যে, সব কাজিনকে একসাথে একই রুমে ঘুমাতে দেয়া হয়। জায়গার সংকুলান না হওয়াতে সবাইকে এক রুমেই খেতে দেয়া হয়। এসব কাজ শরীয়তের দিক দিয়েও যেমন মারাত্মক গুনাহ, একজন রুচিশীল ব্যক্তির কাছেও অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় ওযু, গোসল, টয়লেট ইত্যাদিতে। একই টয়লেটের সামনে নারী-পুরুষ সিরিয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, একই পুকুর বা কলে নারী-পুরুষ একসাথে কাজ সারতে হয়। এমন নানাবিধ সমস্যা এসব ক্ষেত্রে হয়।

মোটকথা, এভাবে থাকতে গেলে বেপর্দা হতে হবে সুনিশ্চিতভাবে। আপনি চাইলেও পর্দা রক্ষা করতে পারবেন না। তাই পর্দা রক্ষা করতে চাইলে এসব থেকে দূরে থাকতে হবে। পর্দা রক্ষা করতে পারলে এসব অনুষ্ঠানে আসা যাবে। না হলে পর্দার বেহাত করে বিয়ের অনুষ্ঠানে আসার অনুমতি শরীয়ত দেয় না।

বিয়ের খাওয়ার অনুষ্ঠান

বিয়ের দিন খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা হয় বাড়ির ছাদে, আরেকটু সামর্থ্য থাকলে করা হয় কমিউনিটি সেন্টারে। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের বিয়ে, তাই খাবারদাবারের আয়োজনে কোনো ধরনের কমতি করা হয় না; কমতি করা হয় দ্বীনের অন্যতম একটি ফরজ বিধান পর্দার ক্ষেত্রে। এবং এটা জেনেবুঝেই করা হয়। নারী-পুরুষ সবার একসাথে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। আর এসব অনুষ্ঠানে বেপর্দা নারীরা স্বাভাবিকভাবেই অনেক সেজেগুজে আসেন। কেউ কেউ দেহের অনেকাংশ উন্মুক্ত করে এরপর এসব অনুষ্ঠানে আসেন।

আবার কোথাও কোথাও নারীদের খাবারের স্থান ভিন্ন করা হলেও সেখানে পুরুষ ওয়েটারই খাবার আনা-নেয়া করেন। এতেও তো পর্দা নষ্ট হলো!

এ জন্য এসব অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে যাওয়া উচিত যে, সেখানে পরিপূর্ণ পর্দার সাথে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না। আয়োজকদের জন্য আবশ্যক হলো, সবার জন্য পূর্ণ পর্দার সাথে খাবারের ব্যবস্থা করা। একটু চেষ্টা করলেই এটা সহজ হয়ে যাবে। নারীদের খাবারের ব্যবস্থা করা ঘরের ভেতরে, আর পুরুষদের ব্যবস্থা করা বাইরে। যদি কমিউনিটি সেন্টারে করা হয়, তাহলে এক তলায় পুরুষদের ব্যবস্থা করা, অপর তলায় নারীদের জন্য ব্যবস্থা করা। যদি এক তলাতেই সব হয়, তাহলে মাঝে পর্দা দিয়ে ব্যবস্থা করা যেতে পারে, অথবা নারী-পুরুষ আগে-পরে করেও খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে সর্বাবস্থাতেই নারীদের কাছে খাবার আনা-নেয়া করবে নারী খাদেমরাই। গাইরে মাহরাম কেউ সেখানে যাওয়া-আসা করতে পারবে না। প্রয়োজনে গেটের সামনে একজন দিকনির্দেশক দাঁড়িয়ে সবাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন।

এভাবে খাবারের ব্যবস্থা হলে সেখানে যাওয়া যায়। একটি সহজ উসুল হলো, যেখানে আপনি আপনার পর্দা রক্ষা করতে পারবেন না, আপনার দ্বীনকে মানতে পারবেন না, সেখানে যাওয়ার অনুমতিও আপনাকে শরীয়ত দেয় না।

দ্বীনহীন বিয়ের অনুষ্ঠানে দ্বীনদারের উপস্থিতি!

১৯৯৭-৯৮ সালের কথা। আমি তখন মাদরাসায় পড়ি। এক বৃহস্পতিবার বাসায় আসলাম। এসে শুনি আগামীকাল আমার এক খালার বিয়ে। বিয়ে হবে কমিউনিটি সেন্টারে। আমি তো আশায় আছি, বিয়েতে যাব, মজা করব। কিন্তু বাধ সাধল আব্বাজান। শুক্রবার জুমার নামাজের পর ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আন্টির বিয়ের খবর শুনছ?

জি।

বিয়েতে কী কী খাওয়াবে জানো?

না।

আমি জানি। পোলাও, রোস্ট, গরুর গোশত, টিক্কা, বোরহানি, জর্দা ইত্যাদি

ইত্যাদি। যাইহোক, এই নাও ৫০০ টাকা। প্রিন্স হোটেল থেকে ভালো করে খেয়েদেয়ে বাসে উঠে মাদরাসায় চলে যাও। বিয়েতে যাওয়ার দরকার নেই। আমি যাচ্ছি না। তোমার আম্মাও যাচ্ছে না। তোমারও যাওয়ার দরকার নেই। সেখানে গানবাজনা হবে। বেপর্দা নারী-পুরুষ ঘুরে বেড়াবে। এর মধ্যে তোমার নিজেকে বেমানান মনে হবে। একসময় মাথায় বুদ্ধি আসবে, পাঞ্জাবিটা খুলে প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে আসি। কিংবা টুপিটা খুলে ফেলি। তা ছাড়া এসব গুনাহের পরিবেশের প্রভাবে দ্বীন ইলম বিস্বাদ লাগবে। আমলের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ওসবে যাওয়ার দরকার নেই।[৮১]

এখানে এসে আমাদের দ্বীনদার ও পর্দানশীন পরিবারগুলোর সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, যে সমস্ত বিয়ে-শাদীতে আমাদের দ্বীনদারি বজায় রাখার ব্যবস্থা রাখা হবে না, দ্বীনের স্বার্থে আমরা সেসব গুনাহের স্রোতে ভেসে যাওয়া বিয়ে-শাদীতে নিজে যাব না, বাচ্চাদেরও পাঠাব না।

একবার আমার এক ছাত্রের গার্জিয়ান আমার কাছে এসে বললেন, নাঈমের ফুপাতো বোনের বিয়ে, একটু ছুটি দেন। আমি বললাম, নাঈমের বয়স কত? বলল, ১৩ পেরিয়ে ১৪ চলে। বললাম একে তো ছেলের পর্দা করার অভ্যাসের বয়স চলছে। তার ওপর বিয়েতে গানবাজনা আর গুনাহের পরিবেশ থাকবে। ছুটি নিয়েন না। গার্জিয়ান বলল, না গেলে আত্মীয়স্বজন খারাপ বলবে। আমি বললাম, আপনি একটা কাগজে এ কথা লিখে দেন, 'আমার ভাতিজির বিয়েতে আমার ছেলের দ্বারা যা যা গুনাহ হবে এর দায়িত্ব আমি নিলাম,' তাহলে আমি ছুটি দিয়ে দেব। আলহামদুলিল্লাহ, গার্জিয়ান নিজেও দ্বীনদার ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, ছুটি লাগবে না। আমি নিজেও যাব না।

গ্রুপ ফটোসেশন

বিয়ের অনুষ্ঠানে গ্রুপ ফটোসেশন একটি ব্যাপক গুনাহের কাজ। অনেকে মুখে নিকাব লাগিয়েও বরের বন্ধুদের সাথে একসাথে দাঁড়িয়ে গ্রুপ ফটোসেশন করেন। ডানে-বামে একদল গাইরে মাহরাম সাথে নিয়ে এভাবে ছবি তুলতে দেখে যেন শয়তানেরও হাসি পায়। একদিকে মুখে নিকাব, অপরদিকে গাইরে

৮১. দ্রষ্টব্য : আহমাদ ইউসুফ শরীফ, অল্প-স্বল্প-গল্প, পৃষ্ঠা ১৫৯।

মাহরামদের সাথে গ্রুপ ফটোসেশন। ওয়েডিং ফটোগ্রাফির নামে আমাদের সমাজে যা চলে, তা মূলত পর্দার বিধানকে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করারই নামান্তর।

হানিমুন, নাকি বেপর্দা হওয়ার মহড়া?

বিয়ের পর সস্ত্রীক ঘুরতে যাওয়ার শখ অনেকেরই থাকে। সামর্থ্যবানরা উড়াল দেন বিদেশ-বিভূঁইয়ে, বাকিরা দেশেই কোথাও ঘুরতে যান দিন কয়েকের জন্য। মৌলিকভাবে তো স্ত্রীকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়া মন্দ কিছু নয়, বা শরীয়তও এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেয় না। তবে সমস্যাটা যেখানে হয় তা হলো, হানিমুনের নামে অনেকেই বেপর্দা হয়ে যান। দ্বীন-ধর্ম ভুলে দিন কয়েকের জন্য বিন্দাস হয়ে যান। যেন এই কয়েকটা দিন শরীয়তের কোনো হুকুম তার ওপর নেই।

হানিমুনের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে এমন স্থানে ঘুরতে যাওয়া হয়, যেখানে পর্দার কোনো বালাই নেই। নারী-পুরুষের সমাগম থাকে। গানবাজনা চলে। বেশির ভাগই বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করে। কেউ কেউ অশ্লীল পোশাকও পরে থাকে। এমন স্থানে ঘুরতে গেলে স্বামী-স্ত্রী কারোরই যে নজরের হেফাজত হবে না, তা সহজেই অনুমেয়। নজরের হেফাজত যে শুধু পুরুষের জন্য তা নয়, নারীর জন্যও নজর হেফাজতের বিধান রয়েছে। সুতরাং স্ত্রীকে যদি এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে পুরুষের সমাগমের কারণে স্ত্রীর নজরের হেফাজত হয় না, সেখানে গেলে তো গুনাহের পাল্লাই ভারী হবে। অনেকে আবার বিভিন্ন সময় মা-বোনদের সমুদ্র সৈকত বা প্রচুর জনসমাগম হয় এমন জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যান। এসব ক্ষেত্রে নজরের হেফাজতের সমস্যাসহ মারাত্মক গুনাহের পরিবেশে সময় কাটানোর ক্ষতিকর দিক রয়ে যায়। আর সমুদ্রে নামলে স্বাভাবিকভাবেই গায়ের বোরকা বা ঢিলেঢালা পোশাকও গায়ে লেপ্টে যায়। যা একজন নারীর দেহসৌষ্ঠবকে অন্যের সামনে ফুটিয়ে তোলে। একজন মুমিন নারী ও পুরুষের সব সময় এ কথা মাথায় রাখা চাই যে, দুনিয়া আমাদের ভোগের জায়গা নয়। দুনিয়া আমাদের ত্যাগের জায়গা। আমরা ইনশাআল্লাহ জান্নাতে ভোগ করব। যেখানে প্রত্যেকের পার্সোনাল সমুদ্র হবে, সৈকত হবে। বিনোদনের ভরপুর ব্যবস্থা হবে। আপাতত দুনিয়াতে সেসবের প্রস্তুতি চলুক।

তাই স্ত্রীকে নিয়ে যদি ঘুরতে যেতে হয়, তাহলে এমন জায়গায় যেতে হবে,

যেখানে বদনজর হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। পর্দার কোনো সমস্যা হয় না।

অনলাইনে স্ত্রীর ছবি আপলোড করা

আধুনিকতার এ যুগে এটা হলো চরম মাত্রার ঘৃণ্য কাজ। নিজ স্ত্রীর ছবি অনলাইনে আপলোড করা কোনো গাইরতওয়ালা স্বামীর কাজ হতে পারে না। অনেক দ্বীনদার লোকও এই জঘন্য কাজটি করে বসেন। তবে তাদের ধরনটি আরও মারাত্মক। তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এর একটি হালাল পন্থা বের করে ফেলেন। স্ত্রীর হিজাব পড়া ছবি আপলোড করেন। চোখ খোলা থাকে, অথবা মুখ খোলা থাকলেও মুখের ওপর কোনো ইমুজি বসিয়ে দেন। অথবা স্ত্রীর মেহেদি রাঙা হাতে হাত রাখা ছবি আপলোড করেন। তারা বাইরে দশ-বিশজন লোক থেকে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখেন ঠিকই, কিন্তু অনলাইনে হাজার হাজার লোকের সামনে স্ত্রীকে উন্মুক্ত করে দেন। কেউ কেউ পুরো ছবি দিয়ে মুখের ওপর কোনো ইমোজি বসিয়ে দেন। তারা মূলত এভাবে ছবি আপলোড করে স্ত্রীর কোন অংশ দেখাতে চান এটা বোঝাই মুশকিল। কারণ পুরো অবয়ব দেখা গেলেও মুখ ঢাকা থাকে। আর এভাবে তারা হালাল পন্থায় স্ত্রীর ছবি আপলোড করে থাকেন!

শরীয়ত এর কোনোটিরই অনুমতি দেয় না। দ্বীন ও শরীয়ত একজন স্বামীকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার সবক দেয়। একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আমানতস্বরূপ। স্ত্রীর সতীত্ব স্বামীর কাছে আমানত। তার পর্দা-পুশিদা স্বামীর কাছে আমানত। তার মর্যাদা স্বামীর কাছে আমানত। এই আমানতগুলো যেভাবেই হোক রক্ষা করা স্বামীর ওপর আবশ্যক।

তা ছাড়া বর্তমান বিভিন্ন সফটওয়ারের মাধ্যমে ইমোজি অপসারণসহ ছবির সাথে এমন এমন জঘন্য বিকৃতিমূলক অপকর্ম করা হয়, যা কল্পনা করলেও গা শিওরে ওঠে!

মহিলাদের বাইরে যাওয়ার বিধান

মহিলাদের বাইরে যাওয়ার বিষয়টি প্রথমত দুই প্রকার। ১. প্রয়োজনে। ২. শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণ ঘোরাফেরা বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে।

প্রয়োজনের মধ্যে হজ, উমরা, দ্বীনী তালিম-দাওয়াত, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকার বিষয়াদি রয়েছে। এসব ক্ষেত্রেও ইসলাম মাহরামের সাথে বের হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। এমনকি হজ ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রেও মাহরামকে শর্ত রাখা হয়েছে।

এখন কথা হলো, কী ধরনের মাহরামের সাথে সফর করা চাই। এই আলোচনায় তাকওয়ার বিষয় হলো, বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে স্বামীই অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ সফরে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একজন নারী শারীরিক সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লে স্বামীর জন্য সহজেই তা করা সম্ভব। যেটা বাবা, ভাই কিংবা অন্য মাহরামের পক্ষে বেশ জটিল এবং ক্ষেত্র বিশেষ ফিতনার আশঙ্কাপূর্ণ। আর বিবাহিত না হলে বা স্বামী কাছে না থাকলে সে ক্ষেত্রে সম্ভব হলে একাধিক নারী একজন মাহরামের সাথে সফর করা। যেমন : একজন পুরুষ তার স্ত্রী ও কন্যা নিয়ে, ভাই তার মা ও বোন নিয়ে, চাচা তার স্ত্রী, মা কিংবা মেয়ের সাথে ভাতিজি নিয়ে ইত্যাদি। বিশেষ করে শ্বশুরের সাথে পুত্রবধূর একা সফর না করা উত্তম। এসব ক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা রয়ে যায়।

আর মহিলা যদি মাহরাম ছাড়া বাইরে যেতে চায় সে ক্ষেত্রে তাকে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন :

১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْـنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক্-জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না।'[৮২]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

'নারী হলো গোপন বস্তু। যখন সে বাইরে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।'[৮৩]

ফকীহগণের মতে কোনো নারীর জন্য একেবারে অনন্যোপায় অবস্থা

---

৮২. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৩

৮৩. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১১৭৩। সহীহ।

ব্যতিরেকে মাহরাম ছাড়া বাজার-ঘাট, মার্কেট ইত্যাদিতে যাওয়া নিষেধ। আর বিশেষ প্রয়োজনে যেতে হলেও এমনভাবে পর্দা করে যাবে, যাতে ফিতনা থেকে বাঁচতে পারে।[৮৪]

স্ত্রীকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া

বর্তমান সময়ে দ্বীনী পরিবারগুলোতে শুধু ঘোরাফেরা ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা প্রথমত তাকওয়ার খেলাফ। দ্বিতীয়ত এ ধরনের কাজের মাধ্যমে পর্দা এবং পর্দার ক্ষেত্রে তাকওয়ার স্তরে পৌঁছার দাওয়াতটা দুর্বল হয়ে যায়। তাই জায়েযের সীমায় আটকে না থেকে তাকওয়ার বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উত্তীর্ণ হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলা চাই।

তবে মৌলিকভাবে এটাকে শরীয়ত নিষিদ্ধ করেনি। বরং কখনো কখনো প্রয়োজনের কারণেই রেস্টুরেন্টে খেতে হয়। দূরে কোথাও সফরের সময় পথিমধ্যে খাবারের সময় এলে এমন প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এ ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, অনেকেই পর্দার ব্যাপারে গাফলতি করেন। এতক্ষণ পূর্ণ পর্দার সাথে থাকলেও রেস্টুরেন্টে ঢুকে মুখের নিকাব সরিয়ে ফেলেন। ফলে হোটেলের ওয়েটারদের পাশাপাশি অন্যান্য লোকদের সামনে পর্দাহীন হয়ে যেতে হয়। আবার কেউ কেউ পেছন ফিরে বসেন, যাতে কেউ না দেখতে পারে। কিন্তু ওয়েটার যখন খাবার নিয়ে আসেন তখন মুখ খোলাই থাকে।

এসব ক্ষেত্রে পর্দার সুরত হলো, এখন অনেক এলাকাতেই নারীদের নিয়ে খাওয়ার জন্য কাচঘেরা বা পর্দাঘেরা আলাদা জায়গা থাকে। তাই কোথাও খেতে গেলে এমন রেস্টুরেন্ট খোঁজা। যদি এমন রেস্টুরেন্ট না পাওয়া যায়, তাহলে পেছনের দিকে বা কর্নারের কোনো টেবিলে বসে মহিলারা পেছনে ফিরে বসবেন। যাতে মুখের দিক শুধু সাথে থাকা মাহরাম পুরুষের সামনেই থাকে। এরপর মুখের নিকাব হালকা সরিয়ে খাবার খাওয়া যাবে। অথবা চাইলে সতর্কতার সাথে এটাও করা যায় যে, মুখের নিকাব উঠিয়ে খাবার খাবে। তবে ওয়েটার খাবার নিয়ে এলে টেবিলের সামনে আসার আগেই সাথে থাকা মাহরাম পুরুষ খাবার নিয়ে টেবিলে রাখবেন। যাতে ওয়েটার নারীর মুখ দেখতে না পারে।

---

৮৪. রদ্দুল মুহতার, ৩/১৪৬; মুফতী শফী, আহকামুল কুরআন, ৩/৩১৭-৩১৯

বাসার বাইরে সফরের ক্ষেত্রে অনেক দ্বীনী পরিবারই বাসা থেকে কিছু খাবার তৈরি করে নিয়ে যায়। কিংবা গাড়ি হোটেলে থামলে শুকনো খাবার, ফলমূল, পানি ইত্যাদি কিনে গাড়িতে বসেই মা-বোনদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

পথে-ঘাটে, গাড়িতে-ট্রেনে পর্দা

পর্দার মূল সময়টা হলো যখন কেউ বাইরে থাকে। ঘরে থাকা অবস্থায় তো স্বাভাবিকভাবে মাহরামদের সামনেই থাকে। কিন্তু বাইরে গেলে তো অসংখ্য গাইরে মাহরামের সামনে পড়তে হবে। তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। একই পথে চলতে হবে। একই গাড়িতে চড়তে হবে। তাই এ ক্ষেত্রে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম।

রাস্তার পাশে অথবা বিভিন্ন ভবনের ছাদে এখন প্রচুর বিলবোর্ড দেখা যায়। বেশির ভাগ বিলবোর্ডেই নারীদের ছবি থাকে। তাই চলার পথে দৃষ্টির হেফাজত করা জরুরি। এমনিভাবে পুরুষের ছবিযুক্ত বিলবোর্ডের দিকে তাকানো থেকে নারীদেরও বেঁচে থাকতে হবে।

গণপরিবহনে চলাচলের ক্ষেত্রে অনেকেই পর্দার গুরুত্ব দেন না। বাস বা ট্রেনে নারী-পুরুষ গাদাগাদি করে চলাচল করেন। বাসে গাইরে মাহরামের সাথে পাশাপাশি সিটে গা ঘেঁষে বসেন। শরীয়ত এর কোনোটিরই অনুমতি দেয় না।

দেশের আইন অনুযায়ীই প্রত্যেক বাসে নারীদের জন্য ভিন্ন আসন থাকে। তাই নারীদের সিটে পুরুষ বসা যেমন দেশের আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও অনুচিত কাজ। কারণ, সেখানে পুরুষ বসলে নারীদের গিয়ে বসতে হবে পুরুষদের সাথে। তাই এই নিয়ম নারী-পুরুষ সবারই মেনে চলা জরুরি।

মাহরাম ছাড়া নারীদের সফরের ব্যাপারে শরীয়ত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। তবে কোনো কারণে যদি নারীদের কাছাকাছি কোথাও একাকী সফর করতে হয়, তাহলে বাস বা ট্রেনের টিকিট কাটার আগেই কাউন্টারে ভালোভাবে বলে নেয়া যে, কোনো নারীর পাশেই যেন সিট দেয়া হয়। লোকাল বাসে ওঠার পর নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সিটেই বসতে হবে। যদি সেখানে জায়গা না থাকে, তাহলে অন্য কোথাও কোনো নারীর পাশেই বসতে হবে। গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে বসা যাবে না। যদি নারীর পাশে বসা সম্ভব না হয়, তাহলে একটু অপেক্ষা করে অন্য বাসে

উঠতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুরুষরা সহানুভূতির আচরণ করতে পারেন। আপনি বাসে আপনার মাহরাম কাউকে নিয়ে উঠেছেন। কোনো নারীকে দেখলেন গাইরে মাহরামের সাথে বসতে হচ্ছে, তখন আপনি উঠে তাকে আপনার সিটে বসিয়ে দিলেন। এতে করে সে একজন নারীর পাশে বসে পর্দা রক্ষা করতে পারবে। আর একজন নারীকে গুনাহ থেকে বাঁচতে সহায়তা করা, ইকরাম করা উভয় সওয়াবই পাবেন ইনশাআল্লাহ। তবে সবচেয়ে উত্তম হলো, সাথে কোনো মাহরাম নিয়ে সফর করা। তাহলে এই ভোগান্তি হবে না। অন্তত ছোট ভাইকে নিয়ে হলেও সফর করা উত্তম।

তবে জীবন-সংগ্রামের এক কঠিন বাস্তবতা হলো, অনেক মা-বোনকেই জীবন-জীবিকার তাগিদে অনন্যোপায় হয়ে গণপরিবহনে উঠতে হয়। এসব ক্ষেত্রে একটু সময় নিয়ে বের হয়ে তুলনামূলক ফাঁকা গাড়িতে উঠে নিজের জন্য নিরাপদ আসন বেছে নেয়ার চেষ্টা করা চাই। সেই সাথে সাদাসিধা ও ঢিলেঢালা পোশাক ও বোরকা পরে বের হওয়া, যাতে মানুষজন বয়স্ক মনে করে এবং সম্মানের সাথে জায়গা করে দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বেশি বেশি দুরুদ ও ইসতিগফারের আমল করা চাই। এতে আল্লাহ তাআলা উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

বোনদের জন্য এমন পথ এড়িয়ে চলা উত্তম, যে পথে পুরুষদের ভিড়ের কারণে হাঁটতে কষ্ট হয় এবং হাঁটতে গেলে দেহের সাথে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা থাকে। এমনিভাবে পুরুষদেরও এমন পথ এড়িয়ে চলা উত্তম, যে পথে নারীদের চলাচল বেশি। যেমন : গার্লস স্কুল বা গার্লস কলেজ যখন ছুটি হয়, তখন যথাসম্ভব সে পথ এড়িয়ে চলা।

বাজার বা মার্কেটে পর্দার রফাদফা

ঈদের সময় মার্কেটগুলোতে নারী ক্রেতাদের ভিড় বেশি থাকে। বিশেষ করে ইফতারির পর মার্কেটগুলো যেন এক টুকরো নারী-সমাবেশের আকার ধারণ করে। ঈদের দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য নতুন পোশাক পরিধানের তাগিদে মার্কেটে গিয়ে অনেকেই পর্দার খবর রাখেন না। এমনিতেই তখন গরমের মৌসুম থাকে, আবার ভিড়ও বেশি হয়। তাই অনেক নারীই গরমে হাঁসফাঁস করে মুখের হিজাব খুলে ফেলেন। কেউ কেউ তো বোরকা বা কোনো ধরনের পর্দা ছাড়াই হালকা-

পাতলা কাপড় পরিধান করে মার্কেটে চলে আসেন। এরপর পুরুষ ক্রেতাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে, হাসি-ঠাট্টা ও রং-তামাশা করে নতুন কাপড় ক্রয় করেন। ঈদের কাপড় কিনতে গিয়ে এভাবে যে পর্দার ফরজ বিধানের বেহাত হয়ে গেল, এ ব্যাপারে অনেকেই ভ্রুক্ষেপ করেন না।

তাই নারীদের জন্য যেমন পর্দা ছাড়া মার্কেটে যাওয়া জায়েয নয়, তেমনিভাবে পুরুষদের জন্য আবশ্যক হলো, মার্কেট বা যেখানে নারীদের ভিড় বেশি থাকবে সেই স্থান এড়িয়ে চলা।

নারীদের জন্য বাজার-ঘাট, মার্কেট ইত্যাদি এড়িয়ে চলা জরুরি। খুব একান্ত প্রয়োজন না হলে এসব জায়গায় না যাওয়া। কারণ, বাজার-মার্কেট হলো অসংখ্য গুনাহের সমাবেশস্থল। এখানে না চাইতেও অসংখ্য গুনাহ হয়ে যায়। বাজার-সদাই বা মার্কেট ইত্যাদির কাজ সারবেন ঘরের পুরুষরা। অনেক লোককে দেখেছি, তারা সারাদিন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন, আর ঘরের নারীরা যাবতীয় বাজার-সদাই করেন। অথচ বাজার-সদাই করার কথা ছিল ঘরের পুরুষেরই।

অনেক দ্বীনদার লোককেও এমন কাজ করতে দেখেছি, তারা সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, অথবা দ্বীনের দাওয়াত নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, আর ঘরে-বাইরে সব কাজ সামলান স্ত্রী। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ঘরের পুরুষ তো আর সব সময় ব্যস্ত থাকে না। অফিসে যাওয়ার আগে বাজারের সময় থাকে, অথবা অফিস থেকে ফেরার পথে রাতেও বাজার থাকে। এই দুই সময়ে বাজার করা যায়। অথবা মূল বাজারগুলো সপ্তাহে একদিন শুক্রবারে করে নিয়ে এরপর টুকটাক বাজারগুলো প্রতিদিন যেকোনো সময়ে করলেই হয়। মোটকথা, ঘরের মহিলাদের এভাবে বাজারে পুরুষদের ভিড়ে ছেড়ে দেয়া কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পুরুষের কাজ হতে পারে না। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ কখনোই চাইবে না যে, তার স্ত্রী বাজারে, মার্কেটে ঘুরে ঘুরে গাইরে মাহরামের সাথে কথা বলে বাজার-সদাই করবে। উপরন্তু অনেক দোকানদার মহিলাদের সাথে খারাপ ব্যবহারও করে। একজন স্বামী কীভাবে এটা সহ্য করে যে, তার স্ত্রী ঘরের বাইরে গিয়ে গাইরে মাহরামের কাছে অপমানিত হচ্ছে! আমার চোখে দেখা একটি কারগুজারি হলো, একবার বাজারে আপাদমস্তক পর্দা করা এক নারীকে তরকারি ক্রয় করতে দেখলাম। বাজার ব্যাগে ভরার পর সেই নারীর বক্তব্য হলো, তিনি দোকানদারকে ৫০০ টাকার নোট দিয়েছেন, আর দোকানদারের বক্তব্য হলো,

তিনি ১০০ টাকার নোট দিয়েছেন। ৫০০ টাকার কোনো নোট তাকে দেয়া হয়নি। এটা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। সেই নারী বেশ ধীর গলায় দোকানদারকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন; কিন্তু দোকানদার তার সাথে আরও খারাপ ব্যবহার করা শুরু করল। তখন সেখানে উপস্থিত আমরা কয়েকজন পুরুষ উভয়কে বুঝিয়ে পরিস্থিতি ঠান্ডা করলাম। সেখান থেকে বাসায় ফেরার পর একটা কথাই আমার মাথায় ঘুরছিল, এই নারীর ঘরেও হয়তো সুস্থ মাহরাম পুরুষ রয়েছেন, আর তিনি দুনিয়ার কোনো কাজে অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। অথচ তার স্ত্রী অথবা মা বাজারে গাইরে মাহরামের কাছে অপমানিত হলো, এটা কিন্তু সে ক্ষুণাক্ষরেও জানবে না। অথবা জানলেও তার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানবে না। কারণ, যে পুরুষ তার ঘরের নারীকে এভাবে বাজারে পাঠিয়ে দেয়, তার আত্মমর্যাদায় তখন অনেক কিছুই লাগে না। সবকিছুই তখন স্বাভাবিক মনে হয়।

তবে ঘরে যদি কোনো সুস্থ মাহরাম পুরুষ না থাকে, তাহলে মহিলারা প্রয়োজনমতো বাজার-সদাই করতে পারবেন। এর জন্য উত্তম হলো, যখন বাজারে ভিড় থাকে না, তখন গিয়ে বাজার করা। অথবা পাশের ঘরের মহিলাকে বলে সেই ঘরের কোনো পুরুষকে দিয়ে বাজার করানো।

এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন যে, পুরুষদের তো সময় থাকে না। তারা সারাদিন কাজ করে বাসায় ফেরে রাতে। সারাদিনের ধকল শেষে আবার বাজারও করবে! তাহলে নারীরা ঘরে বসে বসে কি মাছি মারবে? ইসলাম এত কঠিন না। ইসলামকে সহজ করুন।

তাদের এই আপত্তিটাই মূলত অনর্থক। এ-জাতীয় আপত্তি আসে মূলত দ্বীনের ব্যাপারে চরম অজ্ঞতা থেকেই। নিজের আত্মপরিচয় থেকেই মূলত এমন আজগুবি আপত্তি মাথায় আসে। কারণ, এখানে মূল সমস্যা হলো পর্দা রক্ষা না হওয়া। আর বাজারে বা মার্কেটে গেলে যে পর্দা রক্ষা হবে না, এটা তো খুব সহজেই অনুমেয়। নারী না হয় বোরকা পরে গেলেন, কিন্তু বাজারে বা মার্কেটে গেলে তো তার পুরুষদের দিকে তাকাতেই হবে। তখন সেই নারীর তো নজরের হেফাজত হবে না। আর শাহওয়াত ছাড়া পুরুষের দিকে তাকানো কারও মতে জায়েয হলেও এটা তাকওয়া ও গাইরতের বিষয়। গাইরে মাহরাম পুরুষের দিকে

তাকালে শাহওয়াত হবে না, এমন গ্যারান্টিও তো নেই। তাই তাকওয়ার দাবি হলো, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পরপুরুষের দিকে না তাকানো।

নারী সেলসম্যান

ইদানীং মহিলাদের দোকানদারি করতে দেখা যায়। আগে এটা কেবল শহুরে পরিবেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন গ্রামগঞ্জেও ছড়িয়ে গেছে। দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে দোকান সামলান। একজনের অনুপস্থিতিতে অপরজন দোকানে বসেন। আবার মার্কেটগুলোতেও এখন নারী সেলসম্যান রাখা হয়। বড় বড় শোরুম, শপিংমল, রেস্টুরেন্টে নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে অহরহ। যেসব দোকানে নারী থাকে, সেখানে ক্রেতাদেরও ভিড় থাকে। তাই ক্রেতা টানার জন্য নারীদের রাখা হয়। হাসপাতালগুলোর রিসিপশনেও রাখা হয় সুন্দরী ললনাদের। মোটকথা, অফিস-আদালত থেকে শুরু করে পাড়ার টং দোকানেও এখন নারী বিক্রেতা-সেলসম্যানের দেখা মেলে। মগজপচা সেক্যু-সমাজ অবশ্য একে নারীদের বিজয় বলে মনে করে। তাদের চোখে এটা নারীদের বিরাট মর্যাদা! একজন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তিমাত্রই বোঝার কথা, নারীদের পণ্য বানিয়ে রাখার মধ্যে নারীদের মর্যাদা, নাকি তাদেরকে ঘরের রানি বানিয়ে রাখার মধ্যেই তাদের আসল মর্যাদা।

এ-জাতীয় আরও একটি ফিতনা হলো, প্রতি বছর একুশে বইমেলা বা বাণিজ্যমেলায় মেয়েদেরকে স্টলে খণ্ডকালীন নিয়োগ দেয়া হয়। এসব মেলায় সাধারণত যুবকরাই বেশি যায়, তাই তাদেরকে টানার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অনেক বোন বোরকা-হিজাব লাগিয়েও এভাবে দোকানে চাকরি করেন। এরপর মাসজুড়ে অসংখ্য গাইরে মাহরামের সাথে হাসিমুখে কথা বলে বইয়ের পরিচয় দিতে হয়, বই বিক্রি করতে হয়। অথচ এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে পর্দার বিধানের লঙ্ঘন হচ্ছে। পুরো মাসজুড়ে একজন ব্যক্তি এভাবে একটি মারাত্মক হারাম কাজে লিপ্ত আছেন, এই অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে কী অবস্থা হবে! কোন মুখে দাঁড়াবে আল্লাহ তাআলার সামনে!

আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিয়ামতের আগে এমনটা হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটাকে তিনি কিয়ামতের আলামত আখ্যা দিয়েছেন। সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে আজকের দিনের

বাস্তবতা সম্পর্কে কথা বলা একমাত্র সত্য নবির পক্ষেই সম্ভব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ،

'(কিয়ামতের আগে) ব্যবসার বাম্পার ফলন হবে। এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায়িক কাজে সহযোগী হবে।'[৮৫]

এই হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নারীগণ ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করতে গিয়ে পর্দা রক্ষা করবেন না। তবে পর্দা রক্ষা করে স্বামীর কাজে সহযোগিতা করার পদ্ধতি নিয়ে আমরা সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের বোনদের ভাবা উচিত, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাদের মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে নিজ ঘরে বাবা-মা বা স্বামীর খেদমতেই। পশ্চিমাদের মুখরোচক বস্তাপচা বাণী শুনতে শুনতে যদি আপনিও মনে করেন, ঘর থেকে বেরোতে পারলেই স্বাধীনতা, অন্য পুরুষের সেবা করতে পারলেই স্বাধীনতা, আর নিজ ঘরের মাহরাম পুরুষের সেবার মধ্যে পরাধীনতা, তাহলে জেনে রাখুন, আপনি শয়তানের মারাত্মক ধোঁকায় পড়ে আছেন। আমাদের বোনেরা কোনো পণ্য নয়, তারা ভোগ্যপণ্য নয়, অন্য পুরুষের পায়ের নিচে পড়ে থাকার জন্য আল্লাহ তাদের বানাননি। তাদের রয়েছে স্বকীয়তা, আত্মমর্যাদা, সম্ভ্রম। এই মর্যাদা, সম্ভ্রম কোথায় টিকে থাকবে আর কোথায় খোয়াতে হবে, এটা একজন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নারীর সহজেই বোঝার কথা।

রাইড শেয়ারিং

শহুরে মানুষদের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা এখন পাঠাও-উবারের মতো রাইড শেয়ারিং সিস্টেম। অনেক মানুষের প্রতিদিনের যাতায়াতের মাধ্যম এখন এসব অ্যাপভিত্তিক বাহন। তবে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও এই বাহনে পরপুরুষের পেছনে চলতে দেখা যায়। তাদের যুক্তি হলো, গণপরিবহনে পুরুষদের সাথে ভিড় ঠেলে যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য বিধায় তারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

তাদের যুক্তিটা সুন্দর হলেও পন্থাটা শরীয়তসম্মত নয়। পরপুরুষের সাথে

---

৮৫. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৮৭০; আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১০৪৯। ইমাম আহমাদের সনদ হাসান।

এভাবে একই বাহনে এত কাছাকাছি বসার অনুমতি শরীয়ত দেয় না। আবার বাইক হার্ডব্রেক করলে দেহের সাথে দেহের টক্কর লাগারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। মোটকথা, এভাবে পরপুরুষের পেছনে বাইকে বসা নারীদের পর্দার জন্য মোটেও সংগত নয়। তাই ইসলাম এর অনুমতি দেয় না।

আবার কেউ কেউ বাইকে না উঠে প্রাইভেট কারে ওঠেন। এটাও সমস্যাযুক্ত। মাহরাম ছাড়া পরপুরুষের সাথে প্রাইভেট কারে যাতায়াত করা ইসলামসম্মত নয়। এতে অনেক বিপদেরও আশঙ্কা রয়েছে। আর ইসলাম বিপদে পড়ার আগে শঙ্কাযুক্ত কাজ থেকেই দূরে থাকার নির্দেশ দেয়। তাই এভাবে প্রাইভেট কারে যাতায়াতের অনুমতিও ইসলাম দেয় না।

এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, মাহরাম ছাড়া সফর না করা। একান্ত প্রয়োজন হলে বাসে নারীদের পাশে বসা। কয়েক বছর আগের ঘটনা, উত্তরা আব্দুল্লাহপুর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ির অপেক্ষায়। হঠাৎ পিছন থেকে নারী কণ্ঠের আওয়াজ পেলাম, একজন বাইক রাইডারের সাথে গুলিস্তানে যাওয়ার জন্য ভাড়া নিয়ে কথা বলছেন। মহিলা বোরকা পরিহিতা। একবার ভাবলাম, যা করে করুক। পরে ভাবলাম, একজন গাইরে মাহরামের সাথে লেপ্টে থাকা অবস্থায় যদি এই মহিলার মৃত্যু হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে!

কিছুটা ভেবেচিন্তে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথায় যাবেন?

-গুলিস্তান।

গুলিস্তান বাইকে যেতে তো আপনার কষ্ট হয়ে যাবে। অপরিচিত মানুষের পিছে বসে থাকার এক কষ্ট, তার ওপর ধুলোবালি, হর্ন-আওয়াজ সহ নানা ঝামেলা। আপনি এক কাজ করতে পারেন, একটু সামনে গিয়ে মালেকা বানু স্কুলের সামনে থেকে গ্রীন ঢাকা বাস আছে। এসি বাস। মেয়েদের জন্য নির্ধারিত সিট আছে। টিকেট কেটে আরামে ও নিরাপদে চলে যেতে পারেন। সময় একটু বেশি লাগবে। কিন্তু সেফ অ্যান্ড রিল্যাক্স!

মহিলা চলে গেলেন বাসের উদ্দেশে। বেচারা রাইডার মনঃক্ষুণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। বললাম, ভাই, একজন বোরকা পরা মহিলার জন্য বোরকা ও পর্দার প্রতি সচেতন থাকা জরুরি। বাকি তার জন্য আপনার রিযিকে টান পড়বে না। আমি দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাই একটি ট্রিপ নিয়ে রওনা দিলেন।

বাস ছাড়াও সামর্থ্যে কুলালে পরিপূর্ণ পর্দার সাথে নারীদের জন্য ব্যক্তিগত স্কুটি ব্যবহারেরও সুযোগ রয়েছে। পোশাকের শরয়ী সীমা ঠিক রেখে স্কুটি ব্যবহারের অনুমতি শরীয়ত দেয়। এবং ফিতনার এই যুগে গণপরিবহনে পুরুষের সাথে ঠেলাঠেলি করার চেয়ে স্কুটি ব্যবহারই সবচেয়ে নিরাপদ ও আরামদায়ক। সীরাত ও ইতিহাসের কিতাব ঘাঁটলে দেখা যায়, অনেক নারী সাহাবী যুদ্ধ বা বিভিন্ন কাজে ব্যক্তিগত ঘোড়া ব্যবহার করতেন। আর ঘোড়ার এ যুগীয় আপডেট ভার্সনই হলো বাইক বা স্কুটি।

ভাড়ায় চালিত গাড়িতে গাইরে মাহরামের সাথে বসা

সিএনজি, ট্যাম্পু, লেগুনা ইত্যাদি গাড়িতে ভাড়ায় যাত্রী বহন করা হয়। এসব বাহনের সিটগুলো থাকে অনেক ছোট ছোট। বিশেষত লেগুনার মধ্যে অনেক চাপাচাপি করে আটজন যাত্রীর বসতে হয়। ফলে নারী-পুরুষ সবাই একেবারে গায়ের সাথে গা মিলিয়ে বসেন। এভাবে গাইরে মাহরামের সাথে গাড়িতে আরোহণ করা জায়েয নেই। একান্ত প্রয়োজন হলে নারীদের সাথে বসা যায়। যেন কোনো পাশেই গাইরে মাহরাম না থাকে। আর পুরুষদেরও লক্ষ রাখা চাই, তারা যেন বেগানা নারীর পাশে না বসেন। এবং এসব বাহনে যাত্রার সময় দৃষ্টির হেফাজত করা চাই ভালোভাবে।

পালক সন্তানের সাথে পর্দা

পালক সন্তানের সাথে অনেকেই পর্দা করেন না। বরং তাকে আপন সন্তানের মতোই মনে করতে থাকেন। অথচ সন্তান পালক নিলে ইসলামী শরীয়তে তার কোনো বিধানই পরিবর্তন হবে না; বরং তার আগের মা-বাবা ও আত্মীয়-পরিচয় এবং মা-বাবার অভিভাবকত্বের অধিকার যথারীতিই বাকি থাকবে।

এককথায় পালক নেওয়ার আগে-পরের বিধান অভিন্ন। সন্তান লালন-পালনকারী ব্যক্তির সওয়াব পাওয়াটাই এখানে মৌলিক বিষয়।

পোষ্য সন্তান লালনকারীদের মা-বাবা ডাকতে পারবে। পোষ্য সন্তানের জন্য লালনকারীদের সম্মানার্থে মা-বাবা ডাকা জায়েয। একইভাবে তারাও সন্তানকে স্নেহ করে ছেলেমেয়ে ডাকতে পারবে। তবে এটা মনে করার সুযোগ নেই যে, পালক নেওয়ায় সন্তানের আসল মা-বাবা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন

লালনকারীই তার সবকিছু—এটা মনে করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটি জাহেলি যুগের কুসংস্কার। কুরআনুল কারীমে বিষয়টি কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ۝ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

আর তিনি (আল্লাহ তাআলা) তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোনো গোনাহ নেই; তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৮৬]

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে কাসির রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যায়েদ ইবনে হারিস রাযি.-কে দত্তক নিয়েছিলেন। তাঁকে সবাই যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ—অর্থাৎ মুহাম্মাদের পুত্র বলে ডাকত। পরে আয়াত নাযিল করে বিষয়টি নিষেধ করে দেওয়া হয়। এরপর থেকে সবাই তাঁকে যায়েদ ইবনে হারেসা বলেই ডাকা আরম্ভ করে।'[৮৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম।'[৮৮]

---

৮৬. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৪-৫

৮৭. সহীহ বুখারী, ৪৭৮২; সহীহ মুসলিম, ২৪২৫; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৬/৩৩৭।

৮৮. সহীহ বুখারী, ৪৩২৬

এ জন্যই যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ মুফতি শফি রহ. বলেন, ‘লালন-পালনকারীকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মা-বাবা ডাকা বৈধ হলেও অনুত্তম ও অনুচিত। কেননা, এতে জাহেলিয়াতের কুসংস্কারের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায়। ইসলাম এ ধরনের সাদৃশ্য পছন্দ করে না।’[৮৯]

পালক সন্তানের সাথে পর্দার হুকুমও গাইরে মাহরামের মতো। বহু বছর পালিত হয়েছে বলে তাদের সাথে পর্দা নেই; বিষয়টি এমন নয়। বরং পালক ছেলে সাবালক হলে পালক নেয়া মায়ের সাথে তার পর্দা করতে হবে। এবং পালক মেয়ে সাবালিকা হলে পালক নেয়া বাবার সাথে তার পর্দা করতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথেও স্বাভাবিক নিয়মে পর্দার হুকুম জারি হবে।

তবে পর্দার ক্ষেত্রে একটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, তা হলো পালক শিশুটি দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় তাকে লালন-পালনকারীর এমন কোনো মহিলা আত্মীয় থেকে দুধ পান করিয়ে নেবে, যাতে শিশুটির সঙ্গে তাদের দুধসম্পর্কের আত্মীয়তা হয়ে যায়। তখন তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে পর্দাও জরুরি হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।[৯০]

হাফপ্যান্ট পরে বাইরে যাওয়া

কোনো কোনো ছেলেকে মাঝে মাঝে হাফপ্যান্ট পরে বাইরে যেতে দেখা যায়। আগে এসব ব্যাপার দৃষ্টিকটু মনে হলেও এ যুগে একটা টি-শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরে বাইরে ঘোরাঘুরি করা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

প্রথমত শরীয়ত এর অনুমতি দেয় না। কারণ, নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত স্থান পুরুষের সতরের অন্তর্ভুক্ত। সতর মানে হলো, দেহের যে স্থান ঢেকে রাখতেই হবে। এটা লজ্জার স্থান। কোনো সভ্য মানুষ যে জায়গাকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করতে পারে না। কিন্তু কালের পরিক্রমায় আমাদের ভেতর থেকে লজ্জা-শরম উঠে যাচ্ছে। বেহায়াপনা এখন আমাদের কাছে গৌরব ও ফ্যাশনের বিষয় মনে হচ্ছে। ঘরের ভেতরেও পরিবারের লোকদের সামনে অনেকে দেহে কোনোরকম কাপড় জড়িয়ে দিনমান কাটিয়ে দিচ্ছে।

---

৮৯. আহকামুল কুরআন : ৩/২৯২
৯০. সহীহ বুখারী, ২৬৪৫

যুবকেরা মনে করে, হাফপ্যান্ট পরার কারণে তাকে খুব ফ্যাশনেবল লাগছে। অথচ প্রথমত, শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ বিধান ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, দুনিয়াবী দৃষ্টিতেও তাকে একেবারে হতচ্ছাড়ার মতো লাগছে।

পাতলা লুঙ্গি পরিধান করা

অনেক পুরুষ পাতলা লুঙ্গি পরিধান করে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। এতে বাইরের আলো এসে লুঙ্গিতে পড়লে সতর দেখার শঙ্কা থাকে। তাই পাতলা লুঙ্গি পরিধান না করাই উত্তম। পাতলা লুঙ্গি পরিধান করলেও জানালা বা আলোতে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি পরিধান করা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটুও বটে। অনেকেই এসব ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে সবার সামনে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

পাতলা লুঙ্গির আরও সমস্যা দেখা যায় পুকুর, নদী বা এ-জাতীয় প্রকাশ্যে গোসলের স্থানে। গোসলের পর সেই লুঙ্গি দেহের সাথে একেবারে লেপ্টে থাকে অথবা বাইরে থেকে সতর চোখে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে করণীয় হলো, লুঙ্গির ওপরে বড় গামছা পেঁচিয়ে এরপর গোসল করা। যাতে সতর নজরে না পড়ে।

এই সমস্যা শুধু লুঙ্গিতেই নয়, সাদা পায়জামা পরে গোসল করলেও এমন সমস্যা দেখা যায়। তাই পায়জামা পরে গোসলের আগেও ওপরে বড় গামছা পেঁচিয়ে নিতে হবে।

শরীয়তের বিধি-বিধানের পাশাপাশি এসব কাজ সামাজিক আচার-আচরণেও অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে। একজন উন্নত রুচির ব্যক্তি এসব খুঁটিনাটি বিষয়েও অনেক সতর্ক থাকবে।

সাবলেট বাসায় পর্দা

শহরে সাবলেট বাসায় থাকার অনেক প্রচলন রয়েছে। একসাথে দুই পরিবার একই ফ্লাটে থাকাকে সাবলেট বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে পর্দার মারাত্মক হেরফের ঘটে। অনেক সাবলেট বাসায় একই বাথরুম উভয় পরিবারের শেয়ার করে ব্যবহার করতে হয়। একই রান্নাঘরে একসাথে রান্না করতে হয়। একটা দরজা থাকার কারণে দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় একে অপরের মুখোমুখি হতে

হয়। এতে নানাভাবে পর্দার খেলাফ হয়ে যায়। কখনো কখনো এসব সাবলেট বাসায় শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেক অনৈতিক কাজও হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে করণীয় হলো, একান্ত প্রয়োজন না হলে সাবলেট বাসায় না থাকা। যদি কোনো কারণে থাকতেই হয়, তাহলে পরিপূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করে এরপর থাকা। এটাচড টয়লেট অর্থাৎ রুমের ভেতরেই টয়লেট আছে এমন বাসা ভাড়া নেয়া। যাতে টয়লেটে আসা-যাওয়ার সময় পর্দার খেলাফ না হয়। একাধিক দরজার ব্যবস্থা থাকা। অন্তত আপনি যেই রুমে থাকবেন সেই রুমেই যেন একটা সদর দরজা থাকে। যাতে বাসায় আসা-যাওয়া করতে হলে গাইরে মাহরামের মুখোমুখি না হতে হয়। রান্নাঘর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা, যাতে পর্দার খেলাফ না হয়। প্রয়োজনে সময় ভাগ ভাগ করে এরপর ব্যবহার করা। সাধারণত রান্নাঘরগুলো হয় ঘরের মাঝামাঝি জায়গায়। ফলে সাবলেট বাসায় রান্নাঘরে পর্দার খেলাফ হয়েই যায়। তাই বাসা ভাড়া নেয়ার সময় এসব দেখেই ভাড়া নিতে হবে। মোটকথা, কোনোভাবেই যেন সাবলেট বাসায় পর্দার খেলাফ না হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

অনলাইন বিজনেস

নারীদের অনলাইন বিজনেস এখন একটি ট্রেন্ডি জিনিস। ফেসবুকের কল্যাণে অনেক নারী-পুরুষই এখন অনলাইন বিজনেসের মাধ্যমে সংসার চালাচ্ছেন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই। মৌলিকভাবে তো অনলাইন বিজনেস নাজায়েয কিছু নয়, বরং হারাম ব্যবসা না হলে এবং ব্যবসার শরয়ী নিয়ত ঠিক রাখলে অনলাইন বিজনেসও আয়-রোজগারের একটি অন্যতম মাধ্যম। তবে সমস্যাটা হলো, শরয়ী সীমার বাইরে চলে যাওয়া। অনলাইন বিজনেসের নামে লাখ লাখ মানুষের সামনে নিজেকে বেপর্দা করে পেশ করা। নিজের রূপ-লাবণ্যকে অসংখ্য পুরুষের সামনে উপস্থাপন করা।

অনলাইন বিজনেসের মধ্যে অন্যতম একটি হলো কাপড়ের বিজনেস। লাইভে এসে থ্রি-পিস বা মেয়েদের কাপড় দেখানো হয়। নিজে সেগুলো পরে ছবি তুলে পেইজে আপলোড করা হয়। আর এসব ক্ষেত্রে খুব খেয়াল রাখা হয় যে, নিজেকে যেন আকর্ষণীয় দেখা যায়। কারণ এটা একটি প্রসিদ্ধ ব্যাপার যে, যে দোকানে বা যে বিজনেস পেইজে সুন্দরী রমণীদের দেখানো হয়, সেখানে

ক্রেতাদের ভিড় বেশি থাকে। শয়তান সেদিকেই ক্রেতাদের টেনে নিয়ে যায়।

ঘরের মাহ্‌রাম পুরুষ যদি স্বাবলম্বী হন এবং এতেই যদি সংসার দিব্যি চলে যায়, তাহলে শুধু টাকা কামানোর জন্য অনলাইনে বিজনেসে নামা উচিত নয়। যদি একান্ত কারণবশত মেয়েদের উপার্জন করতেই হয়, তাহলে ঘরে বসে অনলাইনে বিজনেস করা সহজ একটি উপায়। তবে শর্ত হলো, অবশ্যই শরয়ী সীমার মধ্যে থাকতে হবে, পূর্ণ পর্দা বজায় রাখতে হবে। কাপড়ের বিজনেসের ক্ষেত্রে লাইভে এসে কাপড় দেখানো জায়েয নেই। আর এটার তো প্রয়োজনও নেই। কাপড়ের সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে ছবি প্রচার করলেও হয়ে যায়। এবং অনেক বোন এভাবেও কাজ করছেন।

অনেক নারী পর্দা রক্ষা করার জন্য নিজের ছোট ভাই বা অন্য মাহ্‌রাম পুরুষ দিয়ে মহিলাদের কাপড়ের ভিডিও তৈরি করেন, লাইভ করেন। এটাও তো ফিতনা থেকে খালি নয়। কারণ মহিলাদের কাপড়ের ভিডিও মহিলারাই দেখবেন। আর ভিডিও দেখতে গেলে ভিডিওর পুরুষকে দেখতেই হবে, এতেও নারীদের দৃষ্টির হেফাজত হলো না।

তাই এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, কোনো ভিডিও না করা। পণ্যের ছবি তুলে বিজনেস ভালোভাবেই চালাচ্ছে, এমন পেইজও দেখেছি।

অনলাইনে নারীদের একটি প্রসিদ্ধ বিজনেস হলো প্রসাধন-সামগ্রী বিক্রয় করা। ফেসবুক লাইভে এসে সেসব প্রসাধনী তারা সরাসরি ব্যবহার করে দেখান। এবং এতে প্রচুর ভিউ হয়। এর কারণ আমরা একটু আগেই বলেছি। এটাও সম্পূর্ণ নাজায়েয। এই পদ্ধতিতে নারীদের জন্য আয়-রোজগার করা জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রেও করণীয় হলো, প্রোডাক্ট সরাসরি ব্যবহার করে দেখানোর প্রয়োজন নেই। প্রোডাক্টের সুন্দর ছবি তুলে প্রচার করা যায়। বড় বড় প্রসাধনীর কোম্পানিগুলো তাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু কোনো ভিডিও আপলোড করে না; বরং পণ্যের প্রিমিয়াম টাইপের ছবি তুলে প্রচার করে, সাথে পণ্যের ডিটেইলস দিয়ে দেয়, কেউ কেউ পেইজে পণ্যের সাথে সুন্দর কন্টেন্ট যুক্ত করে দেয়। একটি পণ্যের প্রচার যে শুধু ভিডিওর মাধ্যমেই বাড়ে এটা ভুল কথা; বরং পণ্যের দারুণ কিছু ছবি এবং দারুণ একটি কন্টেন্ট পণ্যের মান আরও বৃদ্ধি করে দেয়।

সুতরাং কোনো নারীর যদি বাস্তবেই আয়-রোজগার করা জরুরি হয়ে পড়ে, এবং সে শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে, পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে বিজনেস করতে চায়, তাহলে ইসলাম এর অনুমোদন দেয়। তখন সে যদি আল্লাহ তাআলার কাছে এভাবে দুআ করে যে, 'ইয়া আল্লাহ! আমি চাইলে অন্যদের মতো পর্দা রক্ষা না করে ভিডিও করে বেশি ভিউ কামাতে পারতাম। এতে হয়তো আমার পণ্য বিক্রিও হতো বেশি। কিন্তু আমি শুধু আপনাকে ভয় করে এই কাজ থেকে বিরত থেকেছি। শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে নিজের প্রয়োজনমতো রুজি-রোজগারের চেষ্টা করছি। সুতরাং আপনি আমার এই হালাল আয়-রোজগারে বারাকাহ দান করুন।' ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তার এই ব্যবসায় ভরপুর বারাকাহ দান করবেন। এর বাস্তব কারগুজারি আমাদের কাছে একাধিক রয়েছে।

এক বোন তার স্বামীর ইন্তেকালের পর সংসার চালাতে দিশেহারা হয়ে পড়েন। স্বামীর রেখে যাওয়া অল্প কিছু টাকা যখন শেষ হয়ে যায় তখন অনলাইনে হাতের কাজের বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করা শুরু করেন। পূর্ণ পর্দার সাথেই এসব করেন। পণ্যের ছবি তুলে অনলাইনে প্রচার করেন। কয়েক মাসের মধ্যে আল্লাহ তার এই ব্যবসায় প্রচুর বারাকাহ দান করেন। এমন একাধিক কারগুজারি আমাদের সামনে রয়েছে। একটা কথা মাথায় রাখা চাই, আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বাইরে গিয়ে যদি পৃথিবীজুড়েও ইনকাম করা হয়, তবুও তাতে কোনো বারাকাহ পাওয়া যাবে না। সেই ইনকামে কোনো আত্মিক শান্তি পাওয়া যাবে না। সব পেয়েও মনে হবে কিছুই যেন নেই। চারদিকে শুধু হাহাকার দেখবে। অপরদিকে শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে যদি অল্পও ইনকাম করা হয়, এতেও আল্লাহ তাআলা অফুরন্ত বারাকাহ ঢেলে দেন। আর বারাকাহ মানে এই নয় যে, পকেটে টাকা না থাকলেও হাত দিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাওয়া যাবে। অথবা বারাকাহ কোনো আলাদিনের দৈত্যের নাম নয় যে, যখন খুশি তখনই টাকা পাওয়া যাবে। বরং বারাকা হলো এমন এক নিয়ামতের নাম, যা দিয়ে অল্পতেই অনেক কিছু হয়ে যায়। অল্প আয়েই সংসার দিব্যি চলে যায়। চলতে কষ্ট হলেও কষ্ট অনুভব হয় না। তাই কারও মুখ থেকে না-শুকরি কোনো কথাও আসে না। বারাকাহ মানে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন কোনো পরীক্ষায় ফেলেন না, যেটা সামাল দেয়ার সামর্থ্য তার নেই।

ব্লগিং : একটি নব্য ফিতনা

গত কয়েক বছর আগেও যে বিষয়টির প্রচলন ছিল না, এখন সেটি ঘরে ঘরে ঢুকে গিয়েছে। বলছিলাম ফেসবুক-ইউটিউবে ব্লগ করার কথা। ফেসবুক-ইউটিউব থেকে অর্থ উপার্জন নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। উলামায়ে কেরাম দলীলসাপেক্ষে একে নাজায়েযই বলেছেন। এই আলোচনা একপাশে রাখলেও বেপর্দা হয়ে নারীদের ব্লগ যে নাজায়েয, এটা সহজেই অনুমেয়। এ যেন নিজেকে সবার কাছে উন্মুক্ত করে দেয়ার নব্য পদ্ধতি। কোনো যোগ্যতা ছাড়া, শিক্ষাদীক্ষা ছাড়া, বয়সের সীমা থেকে মুক্ত হয়ে, প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা কামানোর যে নেশা এখন কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে তরুণ-তরুণী এমনকি বৃদ্ধদেরও পেয়ে বসেছে—সেটা হলো ব্লগিং নেশা। এই কাজে কন্টেন্টের অভাব নেই। নিজের ঘরের বেডরুম থেকে শুরু করে টয়লেট পর্যন্ত এই কাজের কন্টেন্ট হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর রোমাঞ্চকর মুহূর্তসহ কবর দেয়ার দৃশ্য পর্যন্ত ব্লগিংয়ের বিষয়বস্তু। মাথায় যখন যেটা আসে, যা মনে চায়, সবই করা যায় এখানে। কাজ শুধু একটাই, ভিডিও আপলোড করা। এরপর ভিউ যত বাড়বে, টাকা তত আসবে। কেউ কেউ ভিউ বাড়ানোর নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন। অশ্লীল দৃশ্য বানান, বানোয়াট কথা প্রচার করে ভিডিও বানান—উদ্দেশ্য একটাই, ভিউ বাড়ানো।

ব্লগিংয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা করা মূলত উদ্দেশ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো, আমাদের অনেক বোনও এখন এই ফিতনায় জড়িয়ে পড়ছেন। পরিবারের হাল ধরার নামে তারা যে মারাত্মক গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ছেন, এটা তারা বুঝতেই পারছেন না। সবার ভিডিওর কন্টেন্ট খারাপ তা নয়, কিন্তু কাজটা করা হচ্ছে শরীয়তের হুকুমের বাইরে গিয়ে। কেউ ভিডিও করছেন পারিবারিক দৈনন্দিন কাজ নিয়ে, কেউ ভিডিও করছেন বিভিন্ন দৃশ্য নিয়ে, কেউ ভিডিও করছেন রান্নাবান্না নিয়ে, কেউ-বা অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে ভিডিও করছেন। কিন্তু কোনোটাতেই তারা পর্দার বিধানকে মানছেন না। উপরন্তু আরও সেজেগুজে তারা ক্যামেরার সামনে আসছেন। সুললিত কণ্ঠে কথা বলছেন। অথচ এর সবগুলোই সম্পূর্ণ নাজায়েয।

ব্লগিংয়ের এই নেশা মানুষকে বিবেকহীন বানিয়ে দেয়, নির্লজ্জ বানিয়ে দেয়। তার আত্মমর্যাদাকে ধ্বংস করে দেয়। কারণ, এখানে কড়কড়া টাকার গন্ধ

রয়েছে। আর মানুষ টাকার জন্য যা খুশি তা-ই করতে পারে। এই ফিতনার ভয়াবহতা সহজেই বোঝার কথা। মাস কয়েক আগেও যার পকেটে হাতখরচের টাকাও থাকত না, এখন যখন ভ্লগিংয়ে টাকার কাঁড়ি দেখবে, তখন সে কীভাবে এর থেকে বিরত থাকবে! অল্প সময়েই সে লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে। আগে রিকশা ভাড়া দেয়ারও পয়সা ছিল না, এখন কয়েক মাসের ব্যবধানে সে গাড়ির মালিকও হয়ে যাচ্ছে।

যেসব নারী ভ্লগিং করেন, তাদের অধিকাংশের কমেন্টবক্স ঘাঁটলে দেখা যায়, অসংখ্য লম্পট তাদের নিয়ে অত্যন্ত বাজে মন্তব্য করছে। অথচ তারা এসবের থোরাই কেয়ার করে না। তাদের মন্তব্য হলো, চলার পথে এমন অনেক বাধা আসবেই। এসব এড়িয়ে চলতে হবে। এসব না হয় এড়িয়ে চলা যাবে, কিন্তু শরীয়তের ফরজ বিধান পর্দাকে কীভাব এড়িয়ে চলা যায়?

অনেক পুরুষও ভ্লগিং করতে গিয়ে পর্দার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন না। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বাইক ভ্লগ

ইদানীং পথে অনেক নারী বাইকার দেখা যায়। পর্দা রক্ষা করে প্রয়োজন অনুযায়ী বাহন চালাতে সমস্যা নেই। কিন্তু ভ্লগিং করতে গেলে পর্দার বিধানে শিথিলতা চলেই আসবে। অথচ অনেক নারী বাইকার এই ফিতনায় জড়িয়ে আছেন। বাইক চালাচ্ছেন, সাথে ভিডিও করছেন। ভিডিওতে সুন্দর করে কথাও বলা হচ্ছে। অথচ শরীয়তের বিধান হলো, পরপুরুষের সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর কঠোর রাখতে হবে, সুমিষ্ট মোলায়েম স্বরে নয়।[৯১] বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে মহিলাদের নিকট মাসআলা বা হাদীসের প্রয়োজনে গাইরে মাহরাম কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তারা মুখের ওপর হাত রেখে কণ্ঠ বিকৃত করে পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলতেন, যেন কারও অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত না হয়।[৯২]

আবার কেউ কেউ বোরকা পরে বাইক চালিয়ে ভ্লগ করছেন; কিন্তু পর্দার যে উদ্দেশ্য, সেটা ঠিক রাখছেন না।

---

৯১. তাফসীরে কুরতুবী, ১৪/১৭৭; সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩২
৯২. তাফসীরে রুহুল মাআনী, ১১/১৮৭; সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩২

কাপল ভ্লগ

কাপল ভ্লগের নামে আরেক নোংরামি এখন খুব বেশি দেখা যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে ভ্লগ করে থাকে। তাদের দৈনন্দিনের বিভিন্ন কাজকর্ম, বিভিন্ন খুনশুটি, হাসি-ঠাট্টা, সুখ-দুঃখের একান্ত মুহূর্তগুলো তারা ভিডিও করে অনলাইনের লাখ লাখ মানুষের কাছে যেন বিক্রি করে দেয়। বিনিময়ে পায় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। প্রথমত শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা সুস্পষ্ট নাজায়েয কাজ। আর সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষদের কাছে এটা চরম ঘৃণ্য কাজ।

মানুষের কিছু মুহূর্ত থাকে শুধুই একান্ত। এই মুহূর্তগুলো সবার সাথে শেয়ার করা যায় না, শেয়ার করার মতোও না। অথচ মানুষ আজকাল সেসব বিষয়ও লাখ লাখ মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। কমেন্টবক্সে অসংখ্য মানুষ তাদেরকে নিন্দা জানাচ্ছে, তবুও তারা সব নিন্দা তুড়ি মেরে এসব কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে শরীয়তে স্পষ্ট বিধান রয়েছে পর্দার ব্যাপারে, সেখানে তারা বেপর্দার সর্বোচ্চ সীমা পেরিয়ে কাপল ভ্লগের নামে সফট সেক্সুয়াল কাজকর্ম করে যাচ্ছে। বিছানায় স্ত্রীর সাথে খুনশুটি, স্ত্রীর সাথে গা ঘেঁষাঘেষি এমন কোনো কাজ নেই যা তারা ভ্লগে করে না। কেউ কেউ বোরকা-হিজাব পরেও কাপল ভ্লগ করে। ইসলামিক ক্যাপশন দিয়েও কেউ কেউ কাপল ভ্লগ করে।

দিন যাচ্ছে আর আমাদের বোধ-বুদ্ধি কমে যাচ্ছে। দিন যাচ্ছে আর আমাদের হায়া-অনুভূতি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগেকার যুগে যে কাজকে চরম লজ্জার মনে করা হতো, এখন সেটাকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কার্যে পরিণত করেছি। পশ্চিমা ধাঁচে চলতে গিয়ে আমরা আমাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছি। ঘরের একান্ত খবরও আজ দুনিয়ার সবাই জানে। আমার স্ত্রী কোন রঙের পোশাক পরে, কোন ক্লিপ দিয়ে চুল বাঁধে, সে মোটা নাকি চিকন—এটা আজ লাখ লাখ মানুষ জানে। গুনাহের একটা সীমা থাকে, এটা তো সীমা ছাড়িয়েও বহুদূর চলে গিয়েছে। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হলো, কোনো দাওয়াত তাদের দিলে আঘাত করে না। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণী তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। অথচ তারা কিন্তু সবই জানে। তারাও কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে রব ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করে। আখিরাতের আযাবের কথা তারাও জানে। জাহান্নামের আগুনের কথা তাদেরও জানা আছে। তবুও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, টাকার মোহে পড়ে তারা এ সবকিছুর ওপর নফসের চাহিদাকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

এসব ভ্লগ, টিকটক ইত্যাদি থেকে দূরে না সরতে পারার অন্যতম কারণ হলো সম্পদের লোভ। বহু মানুষেরই স্বপ্ন থাকে, একদিন সে প্রচুর টাকা কামাবে। যখন সে এই স্বপ্ন পূরণের এত সহজ একটি পথ পেয়ে যায়, তখন এর থেকে দূরে সরবেই বা কীভাবে! চাই এই পথ হালাল হোক বা হারাম, তাতে কিছু যায় আসে না। তাদের শুধু একটাই স্বপ্ন, আমার প্রচুর টাকা কামাতে হবে।

নারীদের বিদেশ গমন

এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, একেবারে বিশেষ প্রয়োজন না হলে মাহরাম ব্যতীত বিদেশ সফর করা জায়েয নেই।[৯৩]

স্বামী-সন্তান ও পরিবার-পরিজন রেখে নারীদের বিদেশ গমনের দৃশ্য অনেক দেখা যায়। পরিবারের হাল ধরার জন্য তারা এভাবে একাকী বিদেশ গমন করেন। এরপর বছর কয়েক পর দেশে ফিরে এয়ারপোর্টে থাকাবস্থায়ই সাংবাদিকদের সামনে বর্ণনা করা হয়, তার এত বছরের বিদেশ সফরের লোমহর্ষক অবস্থা। তার ওপর নির্যাতনের করুণ কাহিনি বলা হয় চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে। এমন দৃশ্যই আমরা দেখে আসছি বহু বছর ধরে। অথচ ইসলাম তো তাকে আগেই বলে দিয়েছে, এভাবে মাহরাম ছাড়া সফর করাই তো জায়েয নেই। আর মাহরাম ছাড়া বিদেশে গিয়ে অন্যের বাসা-বাড়িতে কাজ করার অনুমতি তো শরীয়ত দেয়ই না।

'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় আরও কয়েক বছর আগে একটি লেখা পড়ছিলাম। হংকং থেকে লিখে পাঠিয়েছেন তারিক নামক জনৈক ব্যক্তি। শিরোনাম : গৃহকর্মীদের স্বর্গ হংকং। সে দেশে অভিবাসী গৃহকর্মীদের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ। এদের প্রায় সবাই নারী, যারা ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে গৃহকর্মী হিসেবে সেখানে গিয়েছেন। পত্রিকার খবর অনুসারে সে দেশে দিন দিন গৃহকর্মীর চাহিদা বাড়ছে। স্থানীয় অনেকে বাংলাদেশ থেকে গৃহকর্মী নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সরকারি পর্যায়ে নাকি এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও চলছে। এ উদ্যোগ সফল হলে আগামী দুই বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ৫০ হাজার নারী গৃহকর্মী হিসেবে

---

৯৩. সহীহ বুখারি, হাদীস নং ১১৯৭, ১৮৬২, ১৮৬৪, ১৯৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৮, ১৩৪৯, ১৩৪০; রদ্দুল মুহতার, ২/৪৫৮; মানাসিক, মোল্লা আলী কারী, ৫৫

হংকং যেতে পারবেন। তারা বছরে কমপক্ষে ৯৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে পারবেন।

সে দেশে নারী গৃহকর্মীর চাহিদা বাড়ার কারণ পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে ধরছি। 'এখানে দুটি কারণে গৃহকর্মীদের চাহিদা বাড়ছে। প্রথম কারণ, বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় কারণ, মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি। বৃদ্ধ ও শিশুদের দেখাশোনার জন্য গৃহকর্মীর প্রয়োজন।'

বাহ্ কী সুন্দর ব্যবস্থাপনা! ঘরের নারী বাইরে আর বাইরের নারী ঘরে। ঘরের নারী বাইরে গিয়েছেন চাকরি করতে, এখন এ ঘরের নারীর প্রয়োজন পূরণ হবে কীভাবে? সন্তান ও বৃদ্ধদের দেখাশোনার জন্য নারীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তা আঞ্জাম দেবে কোন নারী? বাইরে থেকে নারী আনো। এখন বাইরে থেকে যে নারী এসে এ ঘরের প্রয়োজন মেটাল, তার ঘর তো খালি রেখে গেল। তার ঘরের নারীর প্রয়োজন মেটাবে কে? তার সন্তান লালনপালন করবে কে? হ্যাঁ, সে তো মাসে মাসে মোটা অঙ্কের টাকা কামাবে। সুতরাং তার বাসায় মাইনে দিয়ে ঝি রেখে দিলেই তো হয়ে গেল। ব্যস, সব সমাধান। কিন্তু একটি সংসারে একজন নারীর অবদান কি এতটুকু? একজন ঝি বা গৃহকর্মীর দ্বারা কি সেই শূন্যতা পূরণ হওয়া সম্ভব?

একটি সংসারে একজন নারী হলেন বটবৃক্ষের মতো। আগলে রাখেন স্বামী-সন্তানসহ সবাইকে। সুখে-দুঃখে অকৃপণ ছায়া দান করেন। সোহাগ, সান্ত্বনা, সাহস ও প্রেরণা দিয়ে গড়ে তোলেন পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশ। নারীর এত এত অবদানকে খাটো করে দেখা হচ্ছে! তাকে বলা হচ্ছে 'অচল অঙ্গ'! নিজেকে 'সচল অঙ্গ' হিসেবে প্রমাণ করতে তাকেও সরাসরি 'অর্থযন্ত্র' হতে হবে! অর্থাৎ তাকেও বাইরে গিয়ে কামাই করতে হবে। আর নারীদেরও এভাবে বোঝানো হয় যে, আর কতকাল স্বামীর টাকায় খাবি? তোর নিজের টাকায় খাবি। সুতরাং চল, বাইরে গিয়ে কাজ কর।

ফলে মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরু, স্বামী-সংসার, সন্তান-পরিবার সব বিসর্জন দিয়ে, এমনকি ঈমান-আখিরাত বিসর্জন দিয়ে হলেও এই অপবাদ দূর করতে নারী ঝাঁপিয়ে পড়ছে কর্মের ময়দানে। ছুটে চলছে অর্থের পানে। যদি সে অর্থ অনর্থ ডেকে আনে আনুক।

এ কেমন ব্যবস্থাপনা। ঘরের নারী বাইরে যাবেন অর্থ উপার্জন করতে আর

তার সন্তান ও অন্যদের দেখাশোনার জন্য ভিনদেশ থেকে নারী আসবে। সেও আসবে অর্থ উপার্জনের জন্য। এতে কমপক্ষে দুটি পরিবারের সন্তানেরা মায়ের স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হবে। এর বিপরীতে পাবে মায়ের কামানো অর্থের পরশ। তা কি পূরণ করবে মায়ের অভাব, একটি সংসারের গৃহকর্ত্রীর শূন্যতা?

এরপর আসে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি। এই নারীদের অধিকাংশই যুবতি। দূর পরবাসে কে তাদের নিরাপত্তা দেবে? আইন ও আইনের লোকের প্রসঙ্গ আসবে তো বিপদে পড়ার পর। ততক্ষণে তো তার যা ক্ষতি হবার হয়েই যাবে। যারা বিদেশে গমন করেন তাদের অধিকাংশই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। আর পরবাসে কজনই বা আইনের ঝামেলায় জড়াতে যাবেন। নীরবে সয়ে যাবেন জুলুম, পাছে আবার কোন বিপদে পড়তে হয়। তখন এত টাকা খরচ করে বিদেশ আসার পর আমও যাবে ছালাও যাবে। দেশেই গৃহকর্মী বা অভিভাবকহীন নারী শিক্ষার্থীকে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, আর সে তো বিদেশ। এ ছাড়া অভিভাবকহীন এই যুবতি নারী সে নিজেই-বা নিজেকে কতদিন কতটুকু সৎ রাখতে সক্ষম হবেন? যেখানে এ যুগে নিজের ঘরে বসে মা-বাবা জীবিত থাকা অবস্থাতেই অনেকে পথচ্যুত হয়ে যান, সেখানে বিদেশে তার কোনো অভিভাবক থাকবে না। তখন তো গুনাহের কাজ করা আরও সহজ।

সামান্য কয় কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার কাছে কি ৫০ হাজার নারীর নিরাপত্তার এ বিষয়গুলো গৌণ?

৫০ হাজার নয়, ৫০ বা পাঁচজন নয়, বরং একজন নারীকে এমন নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ফেলে ৯৭ কোটি নয়, বরং ৯৭ লক্ষ কোটি টাকা লাভ হওয়াকেও ইসলাম সমর্থন করে না; একে উন্নতি হিসেবে গণ্য করে না।

আর 'ওদের' কাছে ৯৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাই বড়, এটাই তাদের কাছে উন্নতি। ৫০ হাজার নারীর নিরাপত্তাহীনতার বিষয় তাদের ৯৭ কোটির কাছে গৌণ। এখন আলেম-উলামা দ্বীনদার শ্রেণি যদি এই পঞ্চাশ হাজার নারীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হন, কথা বলেন, তাহলে তা হয়ে যাবে তাদের তথাকথিত 'উন্নতির' পথে প্রতিবন্ধক। তারা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেবে যে, দেশে এত এত বৈদেশিক মুদ্রা আসবে, দেশের উন্নতি হবে আর মোল্লা-মৌলভীরা এর বিরোধিতা করে। মোল্লারা তো চায় দেশ অমুকিস্তানের মতো হয়ে যাক। এরা উন্নতি-অগ্রগতি ও প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক, এরা পশ্চাৎপদ, সেকেলে।

পাঠক, আর দশটা ক্ষেত্রেও তাদের এ-জাতীয় চিৎকার-চ্যাঁচামেচির বাস্তবতা এটিই। কোনোটা আমরা খালি চোখে ধরতে পারি, কোনোটা ধরিয়ে দিলে বুঝি। ভেবে দেখুন, এটাকে কি আমরা উন্নতি-অগ্রগতি বলতে পারি। আর প্রগতির সাথে কি এর দূরতম সম্পর্ক রয়েছে?

পক্ষান্তরে ইসলাম ওই উন্নতি চায় যা সকলের কল্যাণ সাধন করে; কারও ক্ষতির কারণ হয় না। সত্যি বলতে, ওরা যদি নারীর মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা চাইত, তাহলে নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষা হয় এমন পথই বেছে নিত। যেটা করেছে ইসলাম। ইসলাম কি নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়নি? তাহলে দেনমোহর, পিতা, স্বামী-সন্তানের মিরাস এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তা ঠিক রেখে অর্থ উপার্জনের অধিকার কেন দিয়েছে? তার ওপর তো কারও ভরণপোষণের দায়িত্ব নেই। কিন্তু তার আমরণ ভরণপোষণের দায়িত্ব হয় পিতার, নয় স্বামীর, না হয় সন্তানের। কেউ নেই; তবে তো রাষ্ট্রের।

নারী শুধু ভাবে, নারীর জন্য এত শর্ত কেন ইসলামে? এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, এখানে যাওয়া যাবে না, সেখানে যাওয়া যাবে না। অথচ একটু গভীরভাবে ভাবলেই বোঝার কথা, এসব তারই নিরাপত্তার জন্য, তারই মর্যাদা রক্ষার জন্য। এই যে পেশার দিকে ৫০ হাজার নারীকে আহ্বান করা হচ্ছে। তা কি নারীর জন্য নিরাপদ ও সম্মানের? তা কি ৫০ হাজার পরিবারের বিশৃঙ্খলার কারণ হবে না? তা কি দেশ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর?

এ কথা আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে, কর্মের ময়দান দুটি—ঘর এবং বাহির। আর পত্রিকার এ খবর থেকেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ঘরের ময়দানে নারীর অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য (আর এ প্রয়োজন গৃহকর্মী নারীর দ্বারা সম্ভব নয়, প্রয়োজন মা ও গৃহকর্ত্রীর)। এটা আল্লাহর বিধান, প্রকৃতির নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হলে বিশৃঙ্খলা হতে বাধ্য। আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, 'আমরা শেষমেশ এ দেশের নারীসমাজকে কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে চাচ্ছি? নারীর অসম্মান, অসতীত্ব ও অপবিত্রতার এমন পর্যায়ে—যা পশ্চিমা নারীর এক বিশাল অংশের, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাগ্যে ছিল—যেখানে পৌঁছার পর নারীত্বের সবচেয়ে বড় সম্পদটুকু শুধু খোয়াই যায়নি; বরং প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্রোহের ফলে সেখানে পরিবার-ব্যবস্থাতেও ধস নেমেছে। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, রাস্তা পরিষ্কার করা ও হোটেলে

গ্রাহকদের বিছানা ঠিক করা থেকে শুরু করে নিজের শরীর দেখানো পর্যন্ত পৃথিবীর এমন ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতম কাজ নেই, যা নারীদের ওপর চাপানো হয়নি। একদিকে ঘরের সন্তান মাতৃমমতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, গৃহ তার গৃহকর্ত্রীর অভাবে হাহাকার করছে। অন্যদিকে পথ-ঘাট, হাট-মাঠ নারীর শোভা-সৌন্দর্যে মজে থাকছে। কৃত্রিম সাজে বাণিজ্য বিজ্ঞাপনের কাজ হচ্ছে। তার এক-একটা অঙ্গকে লালসার টোপ বানিয়ে সারা পৃথিবীজুড়ে ডাক দেয়া হচ্ছে। আসুন আমাদের সেবা নিন, আমাদের পণ্য কিনুন।'

আর যেসব যুক্তিতে নারীকে ঘরের বাইরে আনার চেষ্টা চলছে সেসব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'নারীদের ঘরের বাইরে আনার জন্য বর্তমানে একটা যুক্তি ভালোই কাজে দিচ্ছে। তা এই যে, 'জাতি গঠন ও জাতির উন্নয়নে আমরা আমাদের অর্ধেক সমাজকে এভাবে নিষ্ক্রিয় রাখতে পারি না।' যুক্তিটা শুনে মনে হয়, আমাদের দেশের সকল পুরুষকে কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে পুরুষের দ্বারা যতটুকু কাজে নেয়া সম্ভব তা পুরোপুরি করিয়ে নেয়া হয়ে গেছে। এখন কোনো পুরুষ বেরোজগার নেই; বরং হাজার হাজার কাজ পড়ে আছে 'মানব শক্তির' অপেক্ষায়।

অথচ এ ধরনের কথা এমন একটা দেশে কতটা যৌক্তিক? যেখানে অনেক উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রিধারী পুরুষকেও কাজের জন্য ঘুরে মরতে হয়? যেখানে কোনো চাপরাশি অথবা ড্রাইভার নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রচার হলে শ শ গ্রাজুয়েট, আর ব্যাংকের জায়গা খালি হলে শ শ মাস্টার্স বা তদুর্ধ্ব ডিগ্রিধারীগণও আবেদন করেন। প্রথমে পুরুষ 'অর্ধেক সমাজ'-কে রাষ্ট্র গঠন ও উন্নয়নের কাজে পুরোপুরি লাগান। এরপর বাকি 'অর্ধেক আবাদি' নিয়ে ভাবা যাবে, তা সচল নাকি অচল?

তা ছাড়া যে নারী জাতির পরিবার-ব্যবস্থার মৌলিক সেবাগুলো প্রদান করছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের কর্মপুরুষদের লালনপালন করছে এবং তার অমূল্য নারীত্ব সম্পদ দিয়ে সমাজে পবিত্রতা, অনাবিলতা এবং সতীত্ব ও চরিত্রের উন্নততর মূল্যবোধ রক্ষার পূতকার্য সম্পন্ন করছে, তাকে 'অচল অঙ্গ' বলে ব্যক্ত করা পাশ্চাত্যের কুকর্মেরই কারিশমা। যাদের চোখে কর্মক্ষম শুধু সে-ই, যে বেশি থেকে বেশি অর্থ উপার্জন করে; এতে সারা দেশে যতই নৈতিক ধস নামুক আর চরিত্র-বিধ্বংসী বীজ ছড়াক। আর যে উপার্জন করে না সেই 'অচল অঙ্গ', সমাজের নীতি-নৈতিকতার বিনির্মাণে তার শত অবদানই থাকুক না কেন।

জানতে চাই 'পরিবার-ব্যবস্থা'ও সমাজের কোনো অংশ কি না? এবং ব্যক্তির চরিত্র ও কর্মও সমাজের কোনো রক্ষাযোগ্য বিষয় কি না?...'[৯৪]

আর আগেই বলা হয়েছে, নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে পিতা, স্বামী, সন্তান বা নিকটাত্মীয়ের। যে নারীর কেউ নেই তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কোনো নারী যদি এমন অসহায় হন যে, তার কোনোই অবলম্বন নেই এবং রাষ্ট্রও তার দায়িত্ব নেয়নি, এখন তার উপার্জনের প্রয়োজন, তখন সমাজের মানুষের উচিত তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। আর তার জন্য তো ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা রয়েছেই। এর মাধ্যমে তার প্রয়োজন পুরা হওয়া অবশ্যই সম্ভব। আর এ সবকিছু থেকে যে নারী বঞ্চিত তার উচিত বা বলতে পারি আমাদের উচিত তার উপার্জনের নিরাপদ ব্যবস্থা করা। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমরা একজন নারীকে অনিরাপদ পরিবেশে ঠেলে দিতে পারি না; অনিরাপদ কর্মসংস্থানের দাওয়াত দেয়া তো দূরের কথা।

শেষকথা, আমরা মুমিন। আমরা আখিরাতে বিশ্বাসী। আমাদের জীবন-ভাবনা দুনিয়া ও আখিরাত-কেন্দ্রিক। যাদের জীবন শুধু দুনিয়া-কেন্দ্রিক তাদের মতো করে আমাদের ভাবলে হবে না। যারা আল্লাহ্ তাআলার সীমারেখার ধার ধারে না, তাদের লাইফস্টাইল আমরা গ্রহণ করলে চলবে না। মুসলিম নারী তো মুক্তি চায় দুনিয়াতে ও আখিরাতে। ওদের বাতলানো মুক্তির পথে আমাদের মুক্তি মিলবে না। আমরা তো বলেছি, 'রাদী-না বিল্লা-হি রাববান/রব হিসেবে আমরা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।' তাঁর সকল বিধান আমরা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ ও পালন করতে প্রস্তুত। তাঁর বিধানের ক্ষেত্রে আমাদের কারও সাথে কোনো আপস নেই। তাঁর বিধানে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই।

'ওয়া বিল ইসলামি দ্বী-নান/দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট।' সুতরাং ইসলামের বাইরে সকল মত ও পথ আমরা অস্বীকার করি। তা বাহ্যত যতই কল্যাণকর মনে হোক, আসলে তা মরীচিকা। তা যতই ইনসাফের খোলসে আসুক, আসলে তা জুলুমের মাকাল ফল। আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

সুতরাং আমরা আর সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করেছি। যা কিছুই আল্লাহর

---

৯৪. ইসলাহে মুআশারাত : সমাজ সংশোধনের দিক-নির্দেশনা, মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, রাহনুমা প্রকাশনী, বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫

বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তা-ই প্রত্যাখ্যাত; বাহ্যত তা যতই উন্নতি-অগ্রগতি বলে মনে হোক।

'ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান/মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট।' তাঁর মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি হেদায়েতের আলো। তাঁর মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি আল্লাহর কালাম, যা মানবজাতির জন্য হেদায়েত, যা পার্থক্য করে দেয় হক-বাতিলের মাঝে। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, চিরকৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের কাছে প্রিয়; আমাদের মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন এবং পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়। এমনকি আমাদের জানের চেয়েও প্রিয়। তিনিই আমাদের আদর্শ, চির আদর্শ। তাঁর সুন্নাতই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের চলার পথ, আমাদের রাতদিন, আমাদের জীবন-মরণ। তাঁর চেয়ে আমাদের নিঃস্বার্থ কল্যাণকামী আর কেউই নেই। তাঁর বাতলানো পথেই আমাদের কল্যাণ। কল্যাণকামীর মুখোশে যত স্লোগান, সবই মাকাল ফল।

সুতরাং এসো হে বোন, কল্যাণের পথে এসো। শুধু দুনিয়ার কল্যাণ নয়। দুনিয়ার কল্যাণ, আখিরাতের কল্যাণ। নব্য সভ্যতার চোরাবালিতে ফেঁসে যেয়ো না। নিজের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করো, আদর্শ সমাজ গঠনে তোমরাই কান্ডারি।

উপার্জনের দায়িত্ব কার কাঁধে এবং ঘর সামলাবে কে?

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন, নারী ও পুরুষ। এরপর তাদের মাধ্যমে মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

'তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।'[৯৫]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ

---

৯৫. সূরা আরাফ, (৭) : ১৮৯

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।'[৯৬]

নিজ নিজ অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে দুনিয়ার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান অংশীদার। আর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত প্রায় সকল দ্বীনী বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন : তাওহীদ, আকীদা-বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলার প্রতি সমর্পণ, কৃতকর্মের প্রতিদান—পুরস্কার কিংবা শাস্তি, সওয়াব ও ফাযায়েল ইত্যাদি। তেমনিভাবে শরীয়তের সাধারণ দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'আর জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।[৯৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

'পুরুষ বা নারীর মধ্যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করলে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।'[৯৮]

নারী-পুরুষের নেক কাজের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা একই দেবেন। এ ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য নেই।

---

৯৬. সূরা নিসা, (৪) : ১
৯৭. সূরা যারিয়াত, (৫১) : ৫৬
৯৮. সূরা নিসা, (৪) : ১২৪

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।'[৯৯]

তবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, দৈহিক ও মানসিক গঠন ইত্যাদি দিক থেকে আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষের মাঝে কিছু পার্থক্য রেখেছেন। পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ শক্তি দিয়ে। নারীর সকল দায়িত্ব পালন, তার নিরাপত্তা বিধান, ভরণপোষণ ও বংশের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

'পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। কারণ আল্লাহ্ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে, যা আল্লাহ্ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন।'[১০০]

সংসারে খরচের দায়িত্ব যে পুরুষের ওপর, এটা আল্লাহ্ তাআলা একাধিকবার বুঝিয়েছেন।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ

'বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে।'[১০১]

---

৯৯. সূরা নাহল, (১৬) : ৯৭
১০০. সূরা নিসা, (৪) : ৩৪
১০১. সূরা তালাক, (৬৫) : ৭

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'পিতার ওপর কর্তব্য হলো, বিধি মোতাবেক মা-দেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা।'[১০২]

পুরুষের এই দায়িত্ব-কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে ...।'[১০৩]

অন্য হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'স্ত্রীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার আমানতে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ, আল্লাহর কালিমা দ্বারা তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ। আর তাদের জন্য তোমাদের ওপর রয়েছে তাদের সঙ্গত ভরণপোষণ।'[১০৪]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীর সকল গুরুভার পুরুষের কাঁধে। পুরুষের দায়িত্ব হলো নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। আর এসবের যোগান দেয়ার জন্য প্রয়োজন জীবিকা উপার্জনের। সুতরাং তাকে গ্রহণ করতে হবে চাকরি, ব্যবসা কিংবা অন্য কোনো পেশা। আর ঘরের কোণে বসে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ঘরের বাইরে বের হওয়া। এমনকি প্রয়োজনে দূরদূরান্ত সফর করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যেন তোমরা সফলকাম হও।'[১০৫]

---

১০২. সূরা বাকারা, (২) : ২৩৩
১০৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৪২। হাসান সহীহ।
১০৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।
১০৫. সূরা জুমআ, (৬২) : ১০

অন্য আয়াতে বলেন,

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

'তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে।'[১০৬]

এসব আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, বহিরাঙ্গনই হলো পুরুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাইরে অবস্থান হলো তার সাধারণ অবস্থা। ঘরে বসে থাকা পুরুষের জন্য শোভনীয় নয়।

পক্ষান্তরে নারীকে আল্লাহ বানিয়েছেন দুনিয়ার জান্নাত। তিনি স্বামীর জন্য প্রশান্তি, সন্তানের জন্য আশ্রয়, পুরো পরিবারের খুঁটি হলেন একজন নারী। অসংখ্য পরিবার দেখেছি, পরিবারের মূল নারী-সদস্যের ইন্তেকাল হয়ে গেলে পুরো সংসারটাই ভেঙে যায়। একপর্যায়ে পুরো ঘরই বিরান হয়ে যায়। কারণ এতদিন যিনি সবাইকে মায়ার ডোরে বেঁধে রেখেছিলেন, আজ তিনি নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ
جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'[১০৭]

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

'তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।'[১০৮]

১০৬.সূরা মুযযাম্মিল, (৭৩) : ২০
১০৭. সূরা রূম, (৩০) : ২১
১০৮.সূরা আরাফ, (০৭) : ১৮৯

একমাত্র ইসলামই নারীকে বানিয়েছে সর্বোচ্চ সংরক্ষিত। পরপুরুষ তার দিকে মুখ তুলেও তাকাতে পারবে না। নারীদের আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, তারা যেন নিজেদের সংরক্ষিত রাখেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

'তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে।'[১০৯]

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

'আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে।'[১১০]

বলাবাহুল্য যে, নারীর নিজের ও নিজের সৌন্দর্যকে পরপুরুষ থেকে আড়াল রাখার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হলো গৃহে অবস্থান। কেননা গৃহের চারদেয়াল ও পরপুরুষের সামনে না যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে ওঠাবসা-চলাফেরা থেকে বিরত থাকাই নারীর জন্য বড় পর্দা। আর এ জন্যই আল্লাহ তাআলা

---

১০৯. সূরা নূর, (২৪) : ৩১
১১০. সূরা নূর, (২৪) : ৩১

নারীকে আদেশ করেছেন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থানের। ইরশাদ করেছেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না।'[১১১]

সুতরাং নিজের ঘরে অবস্থানই হলো নারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং এটিই তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। তবে প্রয়োজনে সে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু বাইরে অবস্থান শুধু প্রয়োজনবশত ও প্রয়োজন পরিমাণ হতে হবে। আর এ সময়ও নিজেকে ও নিজের সৌন্দর্যকে রাখতে হবে পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে।

গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, নারীর দিকে গৃহের এই সম্বন্ধ তার মালিকানা বোঝানোর জন্য নয়; বরং তা নারীর জন্য সর্বদা গৃহে অবস্থান আবশ্যক হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

অতএব বোঝা গেল, নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ও তার সকল কর্মব্যস্ততা হবে গৃহের অভ্যন্তরে। ঘরোয়া ও সাংসারিক কাজকর্মই হবে তার প্রধান কাজ। আর পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও কর্মব্যস্ততা হবে গৃহের বাইরে।

নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সমাজ হবে আলাদা। নারীর বিশেষ সমাজ শুধু নারীর সঙ্গে, গৃহের অভ্যন্তরে। আর পুরুষের বিশেষ সমাজ হবে শুধু পুরুষের সঙ্গে ও গৃহের বাইরে।

সুতরাং ইসলামে যেহেতু নারীকে ঘরে অবস্থানের বিধান দেয়া হয়েছে, তাই সমাজের কর্তব্য, তাকে এই বিধান পালনের সুযোগ দেয়া। চাপ প্রয়োগ করে বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নারীকে এই বিধান পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা নারীর ধর্মীয় অধিকার।

তা ছাড়া সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য বিচারেও গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান নারীর অধিকার। কেননা আল্লাহ তাআলা নারীকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল করে। তাকে সৃষ্টি করেছেন আদমের পাজর থেকে। ফলে সে আদমের (পুরুষের) একটি অংশবিশেষ। নারীকে মুখোমুখি হতে হয় ঋতুচক্রের, ধারণ করতে হয় গর্ভ, সহ্য করতে হয়

---

১১১. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৩

প্রসব-বেদনা, স্তন্যদান ও আনুষঙ্গিক আরও দায়িত্ব। সর্বোপরি তাকে পালন করতে হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালনপালনের গুরুভার।

আর এ কথা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যে নারী অফিস-আদালত, কল-কারখানায় কাজ করে তার পক্ষে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়। কেননা সে তো সর্বদা ব্যস্ত থাকে তার কর্মক্ষেত্রের নানা কাজে। অফিসের বিভিন্ন দায়িত্বে তাকে সময় দিতে হয়। ফলে ঘরে তার সময় দেয়া, সন্তানদের দেখাশোনা, খোঁজখবর নেয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং সৃষ্টি-উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিচারেও ঘরে অবস্থানের সুযোগ নারীর প্রাপ্য। এটা তার মানবিক অধিকার। বিশেষত যখন বর্তমান সমাজে নারীর নিরাপত্তা সর্বোচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই যখন নারী অনিরাপদ। তার ইজ্জত-সতীত্ব, জীবন-প্রাণ যখন প্রতি মুহূর্তে চরম হুমকির সম্মুখীন তখন নারীর জন্য ঘরের নিরাপত্তা বলয় ছেড়ে নিজেকে নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি করা, নিজের সতীত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে পদে পদে উত্ত্যক্ততা, ধর্ষণের শিকার হওয়ার কোনো যুক্তি হতে পারে না।

অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, প্রগতির দাবিদার এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও নারীবাদী একটি গোষ্ঠী মিথ্যা আশ্বাস ও প্রলোভন দিয়ে নারীকে আজ ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের হীন স্বার্থে তারা নারীকে ও নারীর রূপ-সৌন্দর্যকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করছে। তারা নারীকে বোঝাচ্ছে যে, ঘরের কোণে পড়ে থাকায় কোনো স্বাধীনতা নেই। স্বামীর অনুগত থাকায় কোনো সম্মান নেই। প্রকৃত সম্মান কেবল বাইরের জীবনে। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও উপার্জন করতে হবে। কমপক্ষে নিজের প্রয়োজন পূরণের মতো উপার্জন-উৎস তার থাকতে হবে। তবেই সে হবে প্রকৃত সুখী, প্রকৃত স্বাধীন। তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে আনে পশ্চিমা সভ্যতাকে। যেখানে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-শপিংমলসহ সর্বত্র নারীরা কাজ করে চলেছে।

আর অবলা নারীও প্রলুব্ধ হয়ে পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছে। প্রগতিশীল হওয়ার তাগিদে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে অফিস-আদালতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘরের চারদেয়ালে আবদ্ধ থাকাকে পরাধীনতা মনে করতে শুরু করেছে। স্বামীর অনুগত হওয়াকে অসম্মান মনে করছে।

গৃহবিমুখ নারী, ফলাফল : সামাজিক অবক্ষয়

নারী যখন গৃহকর্মকে উপেক্ষা করে বহির্জাগতিক কাজে মনোযোগী হবে, তখন তার অশুভ প্রভাব পরিবারের গণ্ডি ছেড়ে ধীরে ধীরে সমাজের ওপর পতিত হবে। পারিবারিক ব্যবস্থা হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতিকাগার। ইউরোপ আমেরিকায় পারিবারিক জীবনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে সেখানকার সামাজিক জীবনে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতার চরম অবস্থা বিরাজ করছে। তারা পশ্চাৎপদ এমনকি উন্নয়নশীল দেশের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থান দখল করে আছে। কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্য ও বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এক অজানা অস্থিরতায় ভুগছে। এই অস্থিরতা লাঘবে কেউ মাদকাসক্ত হচ্ছে, কেউ ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শান্তি অন্বেষণ করছে। অবশেষে এগুলোও যখন অস্থিরতা লাঘবে ও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে আত্মহত্যাকে বেছে নেয়া হচ্ছে। আর এ জন্যই সেখানে আত্মহত্যার হার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আল্লামা তাকী উসমানী হাফি. বলেন, কিছু দিন আগে আমি সুইজারল্যান্ডে সফরে গিয়েছিলাম। নিমন্ত্রণকারীরা আমার ব্যবহারের জন্য যে গাড়িটির ব্যবস্থা করেছিল, তার ড্রাইভার ছিল ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত এক শিক্ষিত লোক। চল্লিশ ছুঁইছুঁই এ লোকটি অনায়াসে ইংরেজি বলতে পারত। এখনো সে বিবাহ করেনি। সফরকালীন কয়েক দিন সে আমার সাথেই থাকে। আমি তার খোঁজখবর নিই। বিবাহ না করার কারণ জানতে চাইলে সে বলল, 'আমাদের সমাজে বিবাহ-শাদী অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বিয়ের পর এখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। বিবাহ এখন অস্থায়ী ও কৃত্রিম সম্পর্কের আরেক নাম। অনেক ক্ষেত্রেই এখন বিবাহের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে শুধু একে অপর থেকে আর্থিক সুবিধা ভোগ করা। এ জন্য বহু নারীকে দেখা যায়, তারা বিবাহের পর স্বামীকে দ্রুত ডিভোর্স দিয়ে দেয়। আর সরকারি আইনের সুবাদে স্বামীর সম্পদের বিশাল অংশ হাতিয়ে নিয়ে তাকে দেউলিয়া বানিয়ে দেয়। এ সমাজে বোঝা কঠিন যে, কে স্বামীর সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, আর কে বিশ্বস্ততার সাথে জীবন কাটানোর জন্য অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে।

বেদনাভরা কণ্ঠে সে কথাগুলো বলে শেষ করল। পরে আক্ষেপ ও আফসোসের সুরে সে এ কথাও বলল, 'আহ! আপনাদের এশিয়ান রাষ্ট্রগুলোতে বিবাহের বন্ধন কতই না সুন্দর! বিবাহের সুবাদে এক চমৎকার স্থায়ী পারিবারিক জীবন

অস্তিত্ব লাভ করে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়। আমরা এমন পারিবারিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাবা-মা, ভাই-বোনেরা কি তোমার জন্য একজন ভালো মেয়ে খুঁজতে পারেন না? সে আমার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, আমার মা-বাবা বেঁচে নেই। ভাই-বোন আছে, কিন্তু তাদের সাথে আমার বিয়ের কী সম্পর্ক। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। অপরের এ বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ কোথায়? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সমস্যার সমাধান নিজেই করে থাকে। আমার তো তাদের সাথে সাক্ষাৎ হতেই বছরের পর বছর পার হয়ে যায়।

এ হলো একজন ড্রাইভারের মন্তব্য। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয়, পশ্চিমা বিশ্বের পারিবারিক এবং সামাজিক অস্থিরতার গতি-প্রকৃতি। এসবই নারী স্বাধীনতার অশুভ পরিণতি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ বলেন, আমরা আমাদের কঠিন বাস্তবতা সম্পন্ন দুঃসাহসিক ইতিহাসের অতীত বছরগুলোতে নারীদের যেসব অধিকার ও প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ আরোপ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি তা হলো, মা ও গৃহিণী হিসেবে, তেমনি সন্তানদের আদব-শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারীদের করণীয় বিষয়। নারীদের করণীয় এ সুফল থেকে সমাজ চরমভাবে বঞ্চিত হয়েছে। নারীরা এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছে, ভবন নির্মাণের তদারকি, বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য শ্রমনির্ভর কাজে ব্যস্ত থাকছে। তাই তারা এতটুকু সময়ই বের করতে পারছে না, যার দ্বারা পারিবারিক দৈনন্দিন কাজ সামলাবে এবং সন্তান পালন ও পারিবারিক উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। এখন আমাদের নিকট এ তত্ত্ব বড় পরিষ্কারভাবে উন্মোচিত হয়েছে, আমাদের বহু সমস্যা—যা শিশু ও তরুণদের জীবনপদ্ধতি-কেন্দ্রিক নীতি-নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উৎপাদন-সংক্রান্ত—এগুলো এ কারণেই দেখা দিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। পারিবারিক কর্ম-ব্যস্ততা পালনে সবাই দায়িত্বহীন ও উদাসীন। আমরা নারীদেরকে প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর যে রাজনৈতিক যথার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা করেছি, এটা সে চেষ্টার বিপরীতমুখী ফলাফল।

এ জন্যেই এখন আমরা সমাজ পুনর্গঠনে এ ত্রুটি সামলানোর চেষ্টা শুরু করে

দিয়েছি। আর এ কারণেই মিডিয়া, জনসংগঠন, বিভিন্ন কর্মস্থল এমনকি নিজ নিজ বাড়িতে এমন জোরালো আলোচনা-পর্যালোচনা চালানো হচ্ছে যে, নারীদের নিরেট নারীত্বের মিশনের প্রতি কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় এবং তার জন্য আমাদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।[১১২]

এ হলো নারীর গৃহবিমুখ বা কর্মস্থলমুখিতার অশুভ পরিণতির দিক। অন্যদিকে নারীরা আপন কর্মস্থলে গিয়ে লাঞ্ছনা ও যৌন হয়রানীর শিকার হচ্ছে। বস্তুত বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারী বিবেচিত হচ্ছে শুধু ভোগের বস্তু হিসেবে। এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝে কোনো প্রভেদ ও মতভেদ নেই। আধুনিক সমাজের গর্বিত সদস্যগণ মুখে মুখে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কথা বললেও বাস্তব ক্ষেত্রে তারা উপরোক্ত বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন।

যখন থেকে আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা আছড়ে পড়েছে, বিশেষ করে টিভি, ভিডিও ইংলিশ ফিল্মের ছড়াছড়ি শুরু হয়েছে, বিধর্মীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদের গ্রাস করে নিয়েছে, তখন থেকে আমাদের কেউ অচৈতন্যে আর কেউ সচেতনভাবেই সেই পশ্চিমা বিশ্বের সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ, এখনো আমাদের সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি। কিন্তু যে গতিতে পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসন আমাদের মাঝে বিস্তার করছে, আমাদের গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি তাদের নোংরা জীবনপদ্ধতি মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তা ভাবনাহীন চিত্তে নারীদের ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। তাদের পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ বানানোর আত্মঘাতি অপচেষ্টা চলছে। পরিবার ও পারিবারিক জীবন থেকে যেভাবে দ্রুতগতিতে ইসলামী শিক্ষা বিদায় নিচ্ছে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনব্যবস্থার জন্য মারাত্মক অশনি সংকেত। এখন থেকেই এর প্রতিবিধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। নতুবা পারিবারিক জীবনের সব সুখ-শান্তি, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা ধুলোয় মিশে যাবে।

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে নারীর মানসম্মান বলতে কিছুই ছিল না। প্রাচীন পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা দীর্ঘদিন যাবৎ বিতর্ক করে নিজেদের সময় ব্যয় করেছেন

---

১১২. বই : নারী ও পুরুষের পর্দা, মুফতী মুযযাম্মিল হক, পৃষ্ঠা ১৩৬। আল মুযযাম্মিল লাইব্রেরী, ঢাকা।

যে, নারীদের মাঝে কি আত্মা বলে কিছু আছে? আর যদি থেকেই থাকে, তাহলে তা কি মানুষের, না কোনো পশুর? আর যদি মানুষের আত্মা হয়ে থাকে, তাহলে পুরুষের বিপরীতে তার সামাজিক অবস্থান কোথায়? নারীরা কি জন্মগতভাবে পুরুষের দাস ইত্যাদি? গ্রীক এবং রোমান সমাজেও নারী ছিল নিগৃহীত, নির্যাতিত, শোষিত।

ইসলামী আইনে আদর্শিক, চারিত্রিক সংস্কারের ফলে নারীজাতি সামাজিক যে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছে, এর দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোনো সমাজব্যবস্থা, মতবাদ ও ধর্ম উপস্থাপন করতে পারেনি। ইসলামী আইনে নারীজাতি সত্তাগতভাবে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও উৎকর্ষতার ওই শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম, যেখানে পুরুষ আরোহণ করতে পারে। এ মর্যাদা বা সম্মান প্রাপ্তিতে নারীত্ব কোনো বাধা বা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।

আজ বিশ্বব্যাপী নারী-স্বাধীনতা ও নারী-প্রগতির নামে নারীর নারীত্বকে বিনষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। অপরিণামদর্শী কিছু মানুষ নারীকে ভোগের উপকরণ ও ব্যবসায়ী পণ্যরূপে উপস্থাপন করছে। গৃহকর্ত্রী, স্বামীর জীবনসঙ্গিনী, সন্তানের জননী হিসেবে বর্তমান সমাজে নারীর কোনোই মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। একমাত্র ইসলামই সার্বিকভাবে নারীকে তার স্বভাবজাত অবস্থান থেকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করছে। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষকে স্ব স্ব অবস্থানে রেখেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয়। এ জন্য তাদের আলাদা আলাদা কর্মস্থলের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ই মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। কেউ পুরুষত্বের কারণে সম্মান লাভ করবে আর কেউ নারীত্বের কারণে লাঞ্ছনা ভোগ করবে—এরূপ আচরণ ইসলামে পরিত্যাজ্য।

আমাদের কর্তব্য হলো নারীকে তার পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। তার ওপর জুলুম-নির্যাতন, অন্যায় করা হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। ইসলামী আইনের নারী অধিকারগুলো যদি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা হয়, তবে নারীর ওপর যাবতীয় অত্যাচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

আফসোসের কথা হলো, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া লাগা শুরু করেছে। ফলে অনেক নারী ঘর-সংসার ছেড়ে ক্যারিয়ার গঠনে মনোযোগী হচ্ছে। এমনকি নিজের দুধের শিশুকেও কাজের মেয়ের কাছে রেখে সারাদিন ক্যারিয়ার গঠনেই ডুবে থাকছে। কোথায় স্বামী, কোথায় সন্তান আর

কোথায় একজন নারী প্রিয় স্থান তার সংসার! সবই যেন আজ অফিসের টেবিলে, চায়ের কাপে, বন্ধুদের সাথে আড্ডায় হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে বছর কয়েকের পর স্বামীকে আর ভালো লাগে না। অফিসের কোনো কলিগকে ততদিনে মনে ধরে গিয়েছে। তাই স্বামী-সংসার ছেড়ে, নিজের সন্তানকেও ছেড়ে সেই কলিগের সাথে চলে যাওয়ার মতো ঘটনাও এখন কম না।

আমাদের বোনেরা বুঝতেই পারছে না, ক্যারিয়ার গঠনের লোভনীয় অফারে তারা বেপর্দা হয়ে যাচ্ছে। নিজের দ্বীন-ঈমানকে খুইয়ে ফেলছে। নিজের প্রিয় স্বামী-সন্তান আর সংসার হারিয়ে দুনিয়াও হারাচ্ছে, আর আখিরাত তো সেই কবেই হারিয়ে বসে আছে।

ঘরে উপার্জনক্ষম পুরুষ থাকতে নারীর কি আসলেই রোজগার করা জরুরি? এ বিষয়ে একটি ঘটনা বলি।

২০১১ সালের ঘটনা। এক মজলিসে বসে আছি। একটি প্রাইভেট ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (সম্ভবত এমডি) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

হুজুর, একটা প্রশ্ন করতে পারি?

করেন।

আচ্ছা, আমার স্ত্রী কি জব করতে পারবে?

এই প্রশ্ন?

জি।

আচ্ছা বসেন। বলছি।

আসলে স্ত্রীকে দিয়ে জব করানো এক জিনিস আর স্ত্রীকে আয়-রোজগার করার ব্যবস্থা করে দেয়া আরেক জিনিস। আয়-রোজগার তো আপনার স্ত্রী ঘরে বসেও করতে পারেন। কাপড় সেলাই করে, ফ্রোজেন ফুড বানিয়ে পরিচিত মহলে সাপ্লাই করে কিংবা কোনো ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করে। খাদিজা রাযি. নিজের ঘরে বসে অর্থ বিনিয়োগ করে আয় করেছেন। মহিলা সাহাবীগণ কেউ কেউ অন্যের গম যাতায় পিষে কিংবা খেজুরের বিচি গুড়ো করে ঘরে বসে আয় করেছেন। কিন্তু ঘরের বাইরে গিয়ে পরের কাজ করে আয় করা স্বাধীন মুমিনা নারীর জন্য সব ক্ষেত্রে শোভনীয় নয়।

এখন কথা হলো আপনার মতো একজন ধনী এবং যথেষ্ট স্বচ্ছল ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে জব করাতে চাচ্ছেন কেন?

এখানে দুটি বিষয়।

১. স্ত্রীর শিক্ষার মূল্যায়ন।

২. পশ্চিমাদের আদর্শ ধারণ।

উচ্চ শিক্ষার অর্থ এই নয় যে, এই শিক্ষা দিয়ে আয় করতেই হবে। উচ্চ শিক্ষা দিয়ে নিজের এবং পরিবারের আদর্শ ও আভিজাত্য বাড়ানোই যথেষ্ট। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে নারীর জন্য বাইরে গিয়ে আয়ের পথ না খোঁজা চাই। আর গেলেও শরীয়তের সীমারেখা ভাঙার সুযোগ নেই। যেমন অনেক অভাবী নারী পর্দার সাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ায়, কাজ করে।

আর পশ্চিমা আদর্শের প্রশ্নে আমি বলব, আমাদের দেশের রিকশাওয়ালাও পশ্চিমাদের চেয়ে বড় জমিদার। নাক উঁচু পশ্চিমারা কামাই করে নিজের বউকে খাওয়াতে পারে না। সন্তানকে খাওয়াতে পারে না। কিন্তু আমাদের রিকশাওয়ালা ভাইদের দেখেন। একাই সারাদিন রিকশা চালিয়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে খাচ্ছে। কারও কারও তো একাধিক স্ত্রীও আছে।

নারীরা উপার্জন করবে কীভাবে?

দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আমরা বুঝলাম যে, উপার্জনের দায়িত্ব কেবল পুরুষেরই। তবে কারও ঘরে যদি উপার্জনক্ষম পুরুষ না থাকে, বা কোনো পুরুষই না থাকে, আর অন্য কোনো মাধ্যমেও সংসার চালানোর সুরত না থাকে, তাহলে শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে প্রয়োজনমাফিক উপার্জন করতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হলো ঘরে বসে উপার্জনের পথ বের করা। এখন তো এমন কাজের অভাব নেই। অনেক নারীই পর্দা ঠিক রেখে, শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে উপার্জন করছেন।

এমন কিছু কাজের কথা এখানে উল্লেখ করছি :

১. অনলাইনে বিজনেস করা। যেমন কাপড়ের বিজনেস বা অন্য যেকোনো সামগ্রী বিক্রি করা। পর্দা ঠিক রেখেও এই কাজ করা যায়।

২. হোমমেইড খাবার বিক্রি করা। অনেক নারীই এখন এই কাজ করে থাকেন। এই কাজ করতে বেপর্দা হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাসায় বসে খাবার তৈরি করে খাবারের ছবি তুলে অনলাইনে পোস্ট করা। এরপর অর্ডার হলে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো।

৩. হস্তশিল্পের বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করা।

৪. সেলাই মেশিন দিয়ে মহিলাদের কাপড় তৈরি করা। এই কাজ অনেক দ্বীনদার নারীই করে থাকেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ।

৫. ছোট বাচ্চা অথবা বড় মেয়েদের পড়ানো। ঘরে বসেই পড়ানো যায়। তবে অন্য বাসায় গিয়ে পড়াতে হলে সতর্ক থাকা চাই। উত্তম হলো নিজ বাসাতেই পড়ানো। তবে পাশের ফ্ল্যাটে বা কাছাকাছি বাসায় গিয়ে যদি পড়াতে হয়, তাহলে পর্দার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

৬. লেখালিখি, প্রুফরিডিং, সম্পাদনার মাধ্যমে উপার্জন করা।

৭. ঘরে বসে বিভিন্ন বুকশপ বা প্রকাশনীর কন্টেন্ট রাইটার, অনলাইন কার্যক্রম দেখাশোনা বা এ জাতীয় কাজ করা। তবে এ ক্ষেত্রে ফিতনা থেকে সাবধান থাকতে হবে। গাইরে মাহরাম ছেলেদের সাথে চ্যাটিং থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. কোনো মাদরাসায় মেয়েদের পড়ানো। বেপর্দা পরিবেশে পড়ানো জায়েয নেই। এমন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করা জায়েয নেই, যেখানে পর্দার পরিবেশ নেই।

৯. যদি শুধুই মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত কোনো কর্মক্ষেত্র থাকে এবং সেখানে বেপর্দা হওয়ার কোনো সুরত না থাকে, তাহলে সেখানেও কাজ করা যাবে।

১০. অনলাইনে মেয়েদের প্রাইভেট পড়ানো। তবে অবশ্যই ভিডিওতে সামনে না আসা। বরং ভিডিও অফ করে অডিওতে পড়ানো।

১১. কাঁথা সেলাই করে উপার্জন করা। এটা মূলত হস্তশিল্পেরই একটি প্রকার।

এরকম আরও অনেক কাজ আছে, ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে ভিন্নতা হবে। তবে সব ক্ষেত্রেই শর্ত হলো, শরয়ী সীমার বাইরে যাওয়া যাবে না।

বোরকা নয়, যেন ফ্যাশনের আরেক রূপ

অধুনা আমাদের সমাজে কিছু বোরকা বেরিয়েছে, যেগুলোর দ্বারা পর্দা করা উদ্দেশ্য না, বরং স্টাইল করাই উদ্দেশ্য। ইরানি বোরকা, তুরানি বোরকা ইত্যাদি নামে এগুলো দোকানে দোকানে সাজানো থাকে। দামও হাঁকা হয় প্রচুর। একেকটা বোরকার কারুকাজ দেখে চোখ ফেরানো দায়। আবার কিছু কিছু বোরকা এতটাই টাইট যে, দেহের অবয়ব ভালোভাবেই বোঝা যায়। এ জাতীয় বোরকার মাধ্যমে পর্দার বিধান আদায় হবে না। বরং এগুলো বোরকার মানে দ্বীনের সাথে ঠাট্টা করার মতো।

বোরকা পরা হয় দেহকে ঢেকে রাখার জন্য, গাইরে মাহরাম থেকে পর্দা করার জন্য। কিন্তু বোরকা যদি এমন হয় যে, সেগুলো পরলে সবাই আরও তাকিয়ে থাকবে, তাহলে পর্দা আদায় হবে কীভাবে!

আবার কেউ কেউ আরও জঘন্যভাবে বোরকা পরেন, নিচে টাইট প্যান্ট, ওপরে বুক খোলা বোরকা। আবার কেউ বোরকা পরেও মুখ খুলে রেখে মাথার ওপর পাতলা হিজাব দিয়ে পেঁচিয়ে রাখেন। এগুলোর মাধ্যমে পর্দার ফরজিয়্যাত আদায় হবে না। বরং এগুলো বেপর্দা থাকারই নামান্তর।

এটা খুব মারাত্মক ফিতনা। কারণ এসব পরে মনে করা হচ্ছে যে, আমি তো পর্দা করছি, অথচ তার বাস্তব উদ্দেশ্য ভিন্ন। এটা তো সুস্পষ্ট কথা, যে নারী বোরকা পরেও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে, 'আমাকে দেখতে সুন্দর লাগছে তো! বাইরে গেলে আমাকে ভালো লাগবে তো!' সে এখনো বেপর্দাই রয়ে গেল। অথচ এমনটাই এখন বেশি হচ্ছে। বোরকা পরা নারীর অভাব নেই, কিন্তু কয়জনের পর্দা আদায় হচ্ছে! কয়জনেরই বা উদ্দেশ্য থাকে গাইরে মাহরাম থেকে পর্দা করা! বরং স্বাভাবিক কাপড় পরলে শরীর যতটুকু ঢেকে থাকত, এখন এত টাইটফিট বোরকা পরার কারণে দেহের ভাঁজ আরও বেশি দেখা যায়।

অনেকেই রংবেরঙের বোরকা পরেন। এটাও উচিত না। কারণ রঙিন বোরকা পরিধান করলে সবার নজর সেদিকে চলে যায়। বোরকা হওয়া উচিত ঢিলেঢালা এবং কালো বা আকর্ষণীয় নয় এমন রংয়ের। যা স্বাভাবিকভাবে কারও নজর কাড়বে না।

টেইলার্সে কাপড় বানানো

মেয়েদের জন্য টেইলার্সে কাপড় বানাতে দেয়া উচিত নয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, কাপড়ের মাপ দিতে হয় গাইরে মাহরাম পুরুষদের কাছে। আর কাপড় সেলাইও করে পুরুষরা। তাই একজন আত্মমর্যাদাবোধ নারী কখনোই গাইরে মাহরাম পুরুষের কাছে তার দেহের মাপ প্রকাশ করতে পারেন না। এতে পর্দারও খেলাফ হয়।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হলো, নিজে ঘরে বসে সেলাই করা। এভাবে কাপড় বানানো নিজের জন্যও ভালো। মনমতো কাপড় তৈরি করা যায়। খরচও বেশি লাগে না। আবার প্রচুর ভিড়ের মধ্যে কাপড় বানাতেও দেরি হয় না। নিজের ইচ্ছামতো বাসায় বসে নিজের কাপড় বানালেই হয়।

তবে কেউ যদি সেলাইয়ের কাজ না পারেন, তাহলে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে সেলাইয়ের কাজ পারে এমন নারীদের দিয়েও কাপড় তৈরি করতে পারেন। অনেক নারীই এভাবে কাপড় সেলাই করেন।

তবে একান্তই যদি এই দুই পদ্ধতির কোনো পদ্ধতিতেই কাপড় বানানো সম্ভব না হয়, তাহলে প্রচলিত টেইলার্সে কাপড় বানানো যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে মাহ্রাম পুরুষ তার কাপড়ের মাপ নিয়ে টেইলার্সে দেবেন। অথবা আগের কোনো পোশাকের হুবহু মাপ দিয়ে আসবেন।

তবে এখন কোথাও কোথাও শুধু লেডিস টেইলার্স পাওয়া যায়। যেখানে মাপ নেয়া থেকে শুরু করে কারিগর পর্যন্ত সবাই নারী। অর্থাৎ সেখানে পর্দার খেলাফ হওয়ার কোনো শঙ্কা থাকে না। এসব টেইলার্সে চাইলে কাপড় বানানো যায়। তবে সব টেইলার্সে একটি সমস্যা হলো, কাপড় বানিয়ে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ধরুন এলাকার কারও সাথে আপনার পরিচয় রয়েছে এবং টেইলার্সের লোকদের সাথেও আপনাদের পরিচয় রয়েছে, এরপর সেই লোক যখন টেইলার্সে কাপড় বানাতে যাবেন, তখন টেইলার্সের লোকেরা কথায় কথায় বলেও ফেলতে পারে যে, অমুক তো তার স্ত্রীর জন্য এখানে কাপড় বানান সব সময়। কিছু দিন আগেও একটা বানাতে দিয়ে গেছেন, ওই যে দেখেন, ওটা ঝুলতেছে। তখন আপনার সেই পরিচিত লোক ঝুলন্ত কাপড় দেখলেই ঠাহর করতে পারবেন যে, আপনার স্ত্রী মোটা না কি চিকন। সে লম্বা না কি খাটো। অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনি আপনার স্ত্রীর আকার-আকৃতি অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিলেন। তাই

সেসব টেইলার্সে কাপড় বানাতে হলে আগে তাদের নিষেধ করে দিবেন যে, তারা যেন আপনার কাপড় ঝুলিয়ে না রাখে।

পুরোনো জিনিসপত্র কাপড়চোপড় বেচাকেনা

শহরের ফ্ল্যাটবাসায় ভাঙারি, পুরোনো কাগজ ক্রেতাদের আনাগোনা প্রায়ই দেখা যায়। ঘরের অতিরিক্ত আসবাব, পেপার ইত্যাদি বিক্রির জন্য তাদের প্রয়োজন রয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য এগুলো বিক্রি করে যৎসামান্য যাই আসে তাই অনেক। তবে এসব ক্ষেত্রে পর্দার বিধানের মারাত্মক অবহেলা দেখা যায়। দিন-দুপুরে পুরুষহীন ঘরের সামনে একজন গাইরে মাহরাম পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে এসব বেচাবিক্রি সুস্পষ্ট নাজায়েয। কেউ কেউ মুখের একাংশের ওপর ওড়না দিয়ে ঢেকে এরপর কথাবার্তা বলেন, দরদাম ইত্যাদি করেন, এতেও তো পর্দার বিধানের খেলাফ হলো।

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি সুরত হতে পারে :

১. সপ্তাহের যেদিন বাসায় পুরুষ থাকবে, সেদিন এসব বিক্রি করা। দরদাম ইত্যাদি সবকিছু পুরুষই করবেন। প্রয়োজনে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মা-বোনেরা তদারকি করবেন।

২. যদি ঘরে কোনো কারণে একেবারেই পুরুষ না থাকে, তাহলে পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাদের সাথে কথা বলে তাদের ঘরের পুরুষদের মাধ্যমে এসব বিক্রি করা যায়।

৩. মা-বোনদের ব্যবহারযোগ্য পুরোনো পোশাক বিক্রি বা বিনিময়ে পণ্য ক্রয় না করে দান করে দেয়া উচিত।

৪. এখানে দুটি মাসআলা বলে দিই।

ক. অনেকেই মাথার চুল জমিয়ে বিক্রি করেন। এটা জায়েয নয়। আসলে মানুষের কোনো অঙ্গই বিক্রি করা জায়েয নয়।[১১৩] এমনিভাবে চুল এমন কাউকে দান করা যাবে না, যে এগুলো বিক্রি করবে বা পরচুলা বানাবে।[১১৪]

খ. অনেক মা-বোন বা ভাই আছেন যারা কুরবানীর পর কুরবানীর পশুর হাড়,

---

১১৩. তাবয়ীনুল হাকাইক, ৪/৫১; ফাতহুল কাদীর, ৬/৪২৫
১১৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৮৯, ৫৫৯৩; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩৭৩

চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করে থাকেন। কুরবানীদাতার জন্য এগুলো বিক্রি করা জায়েয নেই। ভুলে বিক্রি করে থাকলে মূল্য সদকা করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো এগুলো কাউকে হাদিয়া দেয়া বা দান করা। তাহলে উক্ত ব্যক্তির জন্য এসব বিক্রি করা জায়েয হবে।[১১৫]

এসব খুঁটিনাটি ক্ষেত্রে পর্দার বিধানে গাফলতির কারণে শরীয়তের বিধানের যেমন লঙ্ঘন হয়, তেমনইভাবে শারীরিক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে।

তরকারিওয়ালা ও মাছওয়ালার সাথে পর্দা

পথে পথে ফেরি করে মাছ ও তরকারি বিক্রেতাদের সাথে পর্দার ব্যাপারে অনেকে গাফেল থাকেন। কেউ কেউ বোরকা ছাড়াই শুধু মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে বাসার নিচে নেমে যান। এরপর ওড়না দিয়ে শুধু মুখের নিচের অংশটুকু ঢেকে মাছ-তরকারি ক্রয় করেন। আবার অনেকেই তাদের সামনে মুখ খোলা রেখে ক্রয় করেন। এই উভয় সুরতেই মারাত্মকভাবে পর্দার খেলাফ হচ্ছে। তাই এসব ক্ষেত্রে সাবধান থাকা জরুরি।

এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্দার ব্যাপারে অনেকেই গাফলতি করেন। অনেক দ্বীনদার পরিবারেও এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অথচ পর্দা একটি ফরজ বিধান। সামান্য সময়ের জন্যও ইচ্ছাকৃতভাবে পর্দার খেলাফ করা জায়েয নয়।

বাজার-সদাইয়ের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাজার-সদাই করবেন মূলত ঘরের পুরুষেরা। একান্ত কারণবশত এভাবে মা-বোনদের মাছ বা তরকারি ক্রয় করতে হলে পর্দার সাথেই করতে হবে। ঘরে কোনো ছোট ছেলে থাকলে তার মাধ্যমেই সব কাজ করানো। কেউ না থাকলে পর্দা বা দরজার আড়াল থেকে করা। অনেক লজ্জাজনক একটি বিষয় হলো, অনেকেই নিজ এলাকায় এক বিক্রেতার কাছ থেকে এভাবে মাছ বা তরকারি কিনতে কিনতে একপর্যায়ে তার সাথে ফ্রি হয়ে যান। তার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন।

---

১১৫. ইলাউস সুনান, ১৭/২৫৯; বাদায়েউস সানায়ে, ৪/২২৫; আলমগীরী, ৫/৩০১

বারান্দায় কাপড় শুকোতে দেয়া

বারান্দায় কাপড় শুকোতে দেয়া আমাদের মা-বোনদের নিত্যদিনের অভ্যাস। বিশেষত শহুরে ফ্ল্যাটে বারান্দা ছাড়া উপায়ও নেই যেন। তবে এ ক্ষেত্রে অনেকেই মস্তবড় ভুলটি করে বসেন। শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় তারা বারান্দায় কাপড় শুকোতে দিয়ে রাখেন, এমনকি পরিধেয় বিশেষ পোশাকটিও তারা বারান্দায় উন্মুক্তভাবে রোদে দেন। এতে কিছু সমস্যা হতে পারে।

যেমন আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে এসব কাপড়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয়া হয়। এরপর এটা সীমা ছাড়িয়ে ইভটিজিংয়ে পরিণত হয়। ইভটিজিং না হলেও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা এসব কাপড় দেখেই অনেক মাপজোখ করে ফেলে। এরপর থেকে অসৎ উদ্দেশ্যে বারবার উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।

এ জন্য উত্তম হলো, বারান্দায় বড় কাপড় দিয়ে পর্দা লাগিয়ে দেয়া। কমপক্ষে গাঢ় কালারের নেট-জাতীয় পর্দা হলেও লাগিয়ে নেয়া যেতে পারে। এরপর বারান্দায় কাপড় শুকানো। অথবা বারান্দায় দুই স্তর করে রশি লাগানো। সামনের দিকে পুরুষদের কাপড় দিয়ে ভেতরের দিকে মহিলাদের কাপড় শুকাতে দেয়া। এতে করে বাইরে থেকে শুধু পুরুষদের কাপড়গুলোই দেখা যাবে।

কাপড় শুকানোর পর রশিতে তা ফেলে না রাখা। অনেকেই একদিন গোসল করে কাপড় শুকাতে দেয়ার পর পরদিন গোসলের সময় রশি থেকে কাপড় আনতে যান। আবার কেউ কেউ ছাদেও সারারাত ধরে কাপড় ফেলে রাখেন। এতেও বদজিনের আছর পড়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে।

এ ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কাপড় পরার সময় সব সময় বিসমিল্লাহ বলে পরা। পোশাক-আশাক খোলা ও পরিধানের সময় দুআ পড়া। এবং নিরাপত্তার দুআসমূহের ওপর আমল করা।

ভিডিও নাশীদ বা বয়ান শোনা

বর্তমান যুগে নারীদের ওপর শয়তানের মারাত্মক একটি ধোঁকা হলো, গাইরে মাহরাম পুরুষের ভিডিও বয়ান বা নাশীদ দেখা। এবং এটাকে তারা গুনাহ তো দূরের কথা, খুব উচ্চতর সওয়াবের কাজ মনে করেন।

এটা তো সবারই জানা কথা যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে গাইরে মাহরামের দিকে

তাকানো জায়েয নেই। এরপরও অনেক মা-বোন গাইরে মাহরামের ভিডিও বয়ান বা নাশীদ দেখেন। এবং এটা শুধু দেখা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সেই গাইরে মাহরামকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয়। তার বাচনভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি ভালোভাবে লক্ষ করা হয়। এরপর পরস্পরে সেগুলো আলোচনাও করা হয় যে, অমুক হুজুর দেখতে এমন, অমুক হুজুর এভাবে কথা বলেন, অমুক শিল্পীর পাগড়ি এমন, জুব্বা এমন ইত্যাদি ইত্যাদি।

শয়তান জানে, এসব দ্বীনদার নারীদের দিয়ে মুভি দেখাতে পারবে না, অথবা অশ্লীল কোনো ভিডিও তারা দেখবে না। অথচ এই অনলাইনের যুগে তারা এসব না দেখে গুনাহ থেকে দূরে থাকবেন, এটা শয়তান মানতে পারে না। তাই নেক সুরতে তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে যে, মুভি দেখা গুনাহ ঠিক আছে, কিন্তু বয়ান শোনা বা ইসলামী নাশীদ শোনা তো গুনাহ নয়!

এসব ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় হলো, কোনো নাশীদ বা বয়ান শুনতে ইচ্ছে হলে অডিও শোনা। এতে চাইলেও গাইরে মাহরামকে দেখা হবে না। অথবা ভিডিও চালু করে মোবাইল উল্টে রাখা। যাতে গাইরে মাহরামের দিকে দৃষ্টি না পড়ে। তবে কারও অডিও নাশীদ বা বয়ান শুনে যদি তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তাহলে তার অডিও শোনাও জায়েয নেই।

এমনকি নারীর জন্য কোনো পুরুষ কারীর তিলাওয়াত বা শিল্পীর নাশীদের অডিও শোনার সময় যদি তার প্রতি আলাদা ভালো লাগা কাজ করে, তবে তা থেকে বিরত থাকা চাই।

আর পুরুষের জন্য গাইরে মাহরাম নারীর সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত ও নাশীদ শোনা জায়েয নয়।[১১৬]

দেবর ও ভাশুরের সাথে পর্দা

দেবর-ভাশুর বিষয়ে ইতিপূর্বে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

মহিলাদের জন্যে দেবর, ভাশুর, ননদ-ননাসের জামাইসহ শ্বশুরালয়ের গাইরে মাহরাম আত্মীয়দের সঙ্গে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। প্রত্যেক গাইরে মাহরামের

১১৬. দ্রষ্টব্য : সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩২; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৮৮৫, হাসান; হাশিয়াতুত তাহতাওয়ী আলা মারাকিল ফালাহ, ২৪২; রদ্দুল মুহতার, ১/৪০৬

সাথেই পর্দা করা ফরজ। কিন্তু দেবর ও ভাসুরের ব্যাপারে এমন ভয় করা উচিত, যেমন মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। কেননা, এসব আত্মীয়স্বজনদের আপন মনে করে ঘরের মধ্যে প্রশ্রয় দেয়া হয় এবং নিঃসংকোচে খোলামেলাভাবে হাসি-তামাশা করা হয়। স্বামীও তাদের আপন ভেবে বাধা দেয় না। কিন্তু পরিস্থিতি আস্তে আস্তে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তখন একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, আনাগোনার মাত্রা বেড়ে যায়। কখনো কখনো স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে এমন-সব কাণ্ড ঘটে যায়, যা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। কেননা একজন সাধারণ পুরুষের পক্ষে কোনো স্ত্রীলোকের ওপর হস্তক্ষেপ করা এত সহজ নয়, যতটুকু সহজ এ ধরনের আত্মীয়দের পক্ষে। এসব কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের শ্বশুরালয়ের পুরুষদের সাথে বিশেষভাবে পর্দার তাগিদ দিয়েছেন। যেমন দেবরের সাথে পর্দার ব্যাপারে হাদীসে অনেক কঠোর বাক্য এসেছে।

একইভাবে পুরুষদের প্রতিও নির্দেশ রয়েছে, যেন ভাবি, শ্যালিকা ও শ্যালক-পত্নীদের সাথে খোলামেলা চলাফেরা না করে এবং চোখ তুলে না তাকায়।

অনেক নারী এমনও আছে, যাদেরকে ছোটবেলা হতে লালনপালন করার কারণে বড় হলে তাদের সাথে পর্দা করে না। পর্দার মাসআলা শোনালে সাথে সাথে বলে দেয়, ছোটবেলা থেকে ছেলেটাকে কষ্ট করে মানুষ করেছি, তার সাথে আবার কিসের পর্দা। এখানে দুটি অপরাধ হলো, একটি পর্দা না করার, অপরটি গুনাহকে গুনাহ বলে না মানার। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে মৃত্যুতুল্য বলেছেন, তার সম্মুখে আসাকে গুনাহ বলে মনে না করা কত মারাত্মক কথা!

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হলো, অনেকে মনে করে, স্বামী যার সাথে পর্দা করতে বলে তাদের সাথেই পর্দা করতে হবে। আর স্বামী যাদের সামনে আসতে বলে তাদের সাথে পর্দা করার প্রয়োজন নেই। পর্দার ক্ষেত্রে স্বামীর নির্দেশটিকে আসল মনে করে থাকেন। অথবা দেবরদের সাথে পর্দা করতে চাইলে তারা মনে কষ্ট পায়, শাশুড়ি মন খারাপ করে। তাই তারা দেবর বা ভাশুরদের সাথে পর্দা করে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা পর্দা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান। হাদীসে এসেছে,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

'স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য জায়েয নেই।'[১১৭]

তাই প্রথমে স্বামী ও শাশুড়িকে বোঝাতে হবে। যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে শরীয়তের হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে আপস করা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, হকপন্থীদের সাথে আল্লাহর সাহায্য সব সময় বিদ্যমান।

আমাদের দেশের অনেক গৃহিণীই দেবর-ভাশুরের সাথে পর্দা করে না। আরও আশ্চর্যের কথা শোনা যায় যে, অনেক নারী দেবর না থাকলে বিয়েই বসতে চায় না। এ জন্যেই কোনো কোনো এলাকায় দেবর-ভাবির অবৈধ প্রণয়ের কথা শুনতে পাওয়া যায়। অথচ ইসলাম দেবর-ভাশুরের সাথে কঠিন পর্দার আদেশ দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সাহাবীদের এক প্রশ্নের জবাবে দেবরকে মরণতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন। সেখানে কীভাবে দেবর-ভাবির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে! সহীহ বুখারীতে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ

'হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, সাবধান! তোমরা গাইরে মাহরাম মহিলাদের গৃহে প্রবেশ করো না। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, স্ত্রীলোকদের শ্বশুরালয়ের পুরুষদের (দেবর-ভাশুরের) সম্পর্কে কী আদেশ রয়েছে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শ্বশুরালয়ের পুরুষ আত্মীয় তো মৃত্যুতুল্য।'[১১৮]

উপরিউক্ত হাদীসের বিশ্লেষণে আমরা বলতে পারি যে, দেবর ও ভাবি দুটি স্পর্শকাতর নাম। আবহমানকাল থেকে এ দুটি সম্পর্কে প্রচুর দুর্বলতা দেখা যায়। এখানে শয়তান যেমন ক্ষণে-ক্ষণে সুযোগ কাজে লাগাতে চায়, অপরদিকে অন্যরা পরের বাড়িতে ভাবির দুর্বলতাকে পুঁজি করে ফায়দা লুটতে চায়। তাই

১১৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১০৯৫। সহীহ।
১১৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৩২; সহীহ মুসলিম, ২১৭২

এ স্থানটি যথেষ্ট সন্দেহজনক। বস্তুত এসব কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেবর-ভাসুরকে নারীর জন্যে মরণতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন। মৃত্যু যেমন অবধারিত সত্য, যাকে এড়ানো যায় না, তেমনি নারীর জন্য শ্বশুরবাড়িতে দেবর-ভাশুরের সাথে পর্দা করা তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। যাদের ব্যাপারে কোনোরকম ছাড় দেয়া যায় না।

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের সাথে পর্দা

বর্তমান বিশ্বে হিজড়ার পাশাপাশি ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে মানুষের স্বাভাবিক রূপ পরিবর্তন করে বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তরের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। তবে পর্দার বিধানের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য মানুষের মতোই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর হাদীস তার প্রমাণ বহন করে।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সকল পুরুষদের অভিশাপ প্রদান করেছেন, যারা নিজেরা (পুরুষত্ব নষ্ট করে) হিজড়া হয়ে যায়। এমনিভাবে ওই সকল মহিলাদেরও অভিসম্পাত করেছেন, যারা পুরুষের সুরত ধারণ করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন, এদের তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই অপরাধে) অমুককে বের করে দিয়েছেন। আর উমার রাযি.-ও অমুককে বের করে দিয়েছেন।'[১১৯]

আলোচ্য হাদীসে যেসব মহিলা বা পুরুষ আল্লাহপ্রদত্ত স্বাভাবিক শারীরিক আকার-গঠনকে পরিবর্তন করে ভিন্ন আকার-আকৃতি, লেবাস-পোশাক গ্রহণ

---

১১৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৬; সুনানে আবু দাউদ, ৪৯৩০

করে, তাদের প্রতি এ অভিসম্পাতের কথা বলা হয়েছে। জন্মগতভাবে যারা হিজড়া তাদের কথা ভিন্ন। কেননা এটা তাদের ইচ্ছার বাইরে। তবে যারা তাদের পথ অবলম্বন করে, যেমন : চুল লম্বা করে, পুরুষত্ব শেষ করে দেয়, অথবা মেয়েলি পোশাক পরিধান করে মেয়ে সাজে, হাদীসের দৃষ্টিতে এরা অবশ্যই অভিশপ্ত। এ-জাতীয় লোকদের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এদের সাথে পর্দা করা আবশ্যক।

মূলত হিজড়াদের ব্যাপারে ফকীহদের মত হলো, তৃতীয় লিঙ্গ বা রূপান্তরকামী বলে কিছু নেই। উত্তরাধিকার বণ্টনের মাসআলায় একজন হিজড়া হয় নারী নয়তো পুরুষ। আর এ ক্ষেত্রে তার লিঙ্গ নির্ধারণ হবে 'প্রস্রাবের রাস্তার' মাধ্যমে। অর্থাৎ পুরুষ লিঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করলে পুরুষ আর নারীর মতো হলে নারী।[১২০] অবশ্য এ ক্ষেত্রে কিছু জটিল ব্যতিক্রমও আছে। কোনো ব্যক্তি বা পরিবার লিঙ্গ নির্ধারণকেন্দ্রিক জটিলতায় পড়লে অভিজ্ঞ মুফতী ও চিকিৎসকদের সমন্বয়ে বিষয়টি সুরাহা করার চেষ্টা করবেন।

তবে মাসআলা হলো হিজড়াদের সাথে পর্দা করতে হবে। কারণ তাদের মধ্যে লিঙ্গ নিয়ে ব্যাপক লুকোচুরি, সমকামিতার কুপ্রভাব ও নারীকে পুরুষের দৃষ্টিতে দেখার কুৎসিত প্রবণতা রয়েছে।[১২১]

ট্রান্সজেন্ডার বলতে বোঝায় সে ব্যক্তিকে, যে সার্জারি, হরমোন ট্রিটমেন্টসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নারী থেকে পুরুষ বা পুরুষ থেকে নারীতে রূপ নেয়। এরা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বড় ফিতনার দ্বার খুলে দিচ্ছে। এটি এমন এক অরাজকতা ও অনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দিচ্ছে, যা মানুষের স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা-ভাবনার ধরন বদলে দিচ্ছে।

পশ্চিমা রাজনীতিবিদ ও পলিসিমেকাররা এই বিকৃত চিন্তাকে বৈধতা দানের মাধ্যমে মানবজাতিকে এক আশ্চর্য ও স্থায়ী ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, যার হাতে পশ্চিমা সাধারণ অমুসলিম জনগণ পর্যন্ত নিরুপায়। কারণ, কোনো স্বাভাবিক

---

১২০. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৩১৩৬৫; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ১২৫১৪, ১২৫১৮। সনদে দুর্বলতা থাকলেও ফকীহগণ এই বর্ণনার ভিত্তিতে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। শরহে মুখতাসার তহাবী (যাসসাস), ৪/১৪৯; নিহায়াহ, ২৫/২২০; মাওয়াহিবুল জলীল, ৬/৪২৯; আল-মাজমুউ শরহুল মুহাজ্জাব, ২/৪৭; আল-মুগনী, ৯/১০৯

১২১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৮০; মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/২০৫৭

বোধসম্পন্ন মানুষ একে মেনে নিতে পারে না। মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, এই ফিতনাকে মোকাবেলা করা। নিজ জনপদে যেন কিছুতেই এই ফিতনা শেকড় গেড়ে না বসতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা।

মিডিয়া, ইন্টারনেটে নানাভাবে এই বিকৃত চিন্তাকে মানবাধিকারের নামে প্রচার-প্রসার করা হয়। এমনকি বাচ্চাদের কার্টুনে পর্যন্ত এই চিন্তাকে যুক্ত করা হয়। নিজ পরিবার ও সন্তানের ঈমানের হেফাজতের জন্য এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি।

চিকিৎসকের সাথে পর্দা

চিকিৎসার সময় পর্দার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত জাবের রাযি.-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য :

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم أبا طيبة أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ

'হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত উম্মে সালামা রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজামা করানোর অনুমতি চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তাইবাকে আদেশ দিলেন যে, তাকে হিজামা করিয়ে দাও।

ঘটনাটি বর্ণনা করার পর হযরত জাবের রাযি. বলেন যে, আবু তাইবা (যিনি হিজামা করলেন) আমার মনে হয় তিনি হযরত উম্মে সালামার দুধভাই ছিলেন অথবা নাবালেগ ছিলেন।'[১২২]

উপরিউক্ত হাদীসটির মাধ্যমে বোঝা যায় যে, চিকিৎসার ব্যাপারেও মহিলাদের পর্দার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। কেননা যদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে পর্দার প্রয়োজন না হতো, তবে উম্মে সালামার হিজামা করানোর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত জাবের রাযি.-এর এ কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না যে, আবু তাইবা রাযি. তাঁর দুধভাই অথবা নাবালেগ ছেলে ছিলেন। অত্যন্ত

১২২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২০৬; সুনানে আবু দাউদ, ৪১০৫

পরিতাপের বিষয় যে, আজ আমাদের সমাজে যারা পর্দার দিকে লক্ষ রাখে, তারাও পরিবারে চিকিৎসার সময় পর্দার প্রতি যত্ন নেয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মহিলাদের চিকিৎসার জন্যে প্রথমত কোনো মাহরাম ব্যক্তি তালাশ করা উচিত। যদি না পাওয়া যায়, তাহলে নারী চিকিৎসক খুঁজতে হবে। যদি নারী চিকিৎসক খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে গায়রে মাহরাম ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের একটি মূলনীতির প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে; তা হলো, অপরিহার্য দরকারে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় কেবল প্রয়োজন পরিমাণই শিথিল করা যেতে পারে।

কাজেই একান্ত অপরাগতায় যদি গায়রে মাহরাম চিকিৎসককে শরীরের কোনো অংশ দেখাতেই হয়, তাহলে যতটুকু দেখানো প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই দেখাতে পারবে। যেমন চিকিৎসার জন্যে যদি শিরা দেখা বা অবস্থা বলার দ্বারা কাজ শেষ হয়ে যায়, তবে এর বেশি দেখানোর বা স্পর্শ করার অনুমতি নেই। তেমনি যদি শরীরের অন্য কোনো স্থানে জখম থাকে, তবে শুধু জখমের জায়গাটি চিকিৎসককে দেখাতে পারবে। আর যদি চোখ, নাক, দাঁত ইত্যাদি দেখাতে হয়, তবু সম্পূর্ণ খোলা জায়েয নেই। আরও লক্ষণীয় যে, প্রয়োজন অনুপাতে ডাক্তারকে যে অংশ দেখানো হচ্ছে সে অংশ ডাক্তার ব্যতীত অন্য কারও দেখার অনুমতি নেই। হ্যাঁ, যদি এমন অঙ্গ হয় যে, যা মাহরাম পুরুষদের অবলোকন জায়েয আছে, তবে মাহরাম আত্মীয়গণকে দেখাতে পারবে। ওপরের নির্দেশ পুরুষদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। একজন পুরুষ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোনো অঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা কোনো কারণে দেখানোর দরকার হলে শুধু ততটুকুই দেখাতে পারবে, যতটুকু দেখানো প্রয়োজন।[১২৩] কিন্তু উপস্থিত অন্য লোকদের জন্য এমন স্পর্শকাতর স্থানগুলো দেখা হারাম।

ইহরাম অবস্থায় হিজাব

ইসলামী শরীয়তে নারীদের ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারে এত বেশি তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, ইহরাম অবস্থায়ও হিজাব রক্ষা করতে বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, 'আমরা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

১২৩. রদ্দুল মুহতার, ৬/৩৭০

সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। সে সময় কোনো পুরুষ আমাদের সামনে দিয়ে গেলে আমরা মুখের ওপর চাদর ছেড়ে দিতাম, আবার সে চলে গেলে চাদর সরিয়ে ফেলতাম।'[১২৪]

ইহরামের হালতেও মহিলাদের জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা নিষেধ। তাই এ অবস্থায় এমনভাবে চেহারা আবৃত রাখা জরুরি, যাতে মুখমণ্ডলের সঙ্গে কাপড় লেগে না থাকে। এখন একধরনের ক্যাপ পাওয়া যায়, যা পরিধান করে সহজেই চেহারার পর্দা করা যায়।

অপর এক বর্ণনায় উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি.-এর সহোদরা আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. বলেন, (হজের সময়ও) আমরা পুরুষদের হতে আমাদের চেহারা ঢেকে রাখতাম (আর তা এমনভাবে, যাতে মুখমণ্ডলে কাপড় না লাগে) এবং ইহরামের পূর্বে চিরুনি করতাম।[১২৫]

হযরত আলী রাযি. মহিলাদের নিষেধ করতেন, তারা যেন ইহরাম অবস্থায় নেকাব ব্যবহার না করে। তবে চেহারার ওপর দিয়ে কাপড় ঝুলিয়ে দেবে।[১২৬]

তাবেয়ী তাউস রহ. থেকেও উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে।[১২৭]

ভিক্ষুকের সাথে পর্দা

শহর ও গ্রামে কমবেশি ভিক্ষুকের আনাগোনা থাকে। বেশিরভাগ ভিক্ষুক মধ্যবয়সি হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক নারীই তাদের সাথে পর্দা করেন না। অনেক নারীই তাদের সামনে বেপর্দা হয়েই যান। এটা জায়েয নেই। তারা অসুস্থ হলেও তাদের সাথে পর্দা করা ফরজ।

ঠিক একই কথা পুরুষদের ক্ষেত্রেও। নারী ভিক্ষুকদের সাথে তাদের পর্দা করাও ফরজ। তাই তাদেরকে ভিক্ষা দিতে হলে তাদের সাথে পর্দা করতে হবে। সবচেয়ে

---

১২৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮৩৩। এই হাদীসের সনদ দুর্বল, তবে আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর বোন আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. হতে সহীহ সনদে সমার্থক হাদীস রয়েছে, যা সামনে আসছে।

১২৫. মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ১৬৬৮। সনদ সহীহ।

১২৬. মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১৪৩২৯। সহীহ; আদিল্লাতুল হিজাব, ৩২৯-৩৩৪; নাইলুল আওতার, ৫/৭১; মানাসিক, ১১৫; ফাতহুল বারী, ৩/৪৭৫; ইলামুল মুআককিয়ীন, ১/১২২-১২৩

১২৭. মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১৪৩৩০

উত্তম হলো, ছোট কাউকে তাদের সামনে পাঠানো। এমন কেউ না থাকলে দরজার আড়াল থেকেই দিতে হবে।

তবে বাসায় যদি পুরুষ না থাকে, তাহলে ভিক্ষুক এলে দরজা খোলার ব্যাপারে সাবধান থাকা জরুরি। আগে দরজার ফাঁক দিয়ে ভালো করে দেখে নেয়া। সবচেয়ে উত্তম হলো, স্বামী বা ঘরে অন্য পুরুষদের অবর্তমানে গাইরে মাহরাম কেউ এলে দরজাই না খোলা। কারণ, এভাবে চুরি-ডাকাতিসহ বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটে যায়।

গৃহশিক্ষকের সাথে পর্দা

গৃহশিক্ষকের সাথে পর্দার ব্যাপারে অনেকেই গাফলতি করেন। প্রথম কথা হচ্ছে, গাইরে মাহরাম শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছে পড়া জায়েয নেই। হোক বাসায় বা অন্য কোথাও। সব ক্ষেত্রেই একই বিধান। তাই ছেলেদের জন্য পুরুষ শিক্ষক আর মেয়েদের জন্য নারী শিক্ষিকা রাখা আবশ্যক। তবে এরপরও পর্দার খেলাফ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন শিক্ষকের সাথে অনেক ছাত্রের মা বা বোন পর্দা করেন না। পর্দা ছাড়াই শুধু গায়ে ওড়না জড়িয়েই নাশতা নিয়ে আসেন। অথবা শিক্ষিকার সামনে ছাত্রীর ভাই বা বাবা কথা বলতে বা বেতন দিতে চলে আসেন। এর মাধ্যমে পর্দার খেলাফ হয়। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকা চাই।

গৃহশিক্ষকের সাথে পর্দা না করার কারণে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটার নজির আমাদের সামনেই রয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রায়ই এসব সংবাদ দেখি আমরা। অথচ অনেক পরিবারেই গৃহশিক্ষককে ঘরের লোকের মতো মনে করা হয়। তার সাথে পর্দা করা হয় না। তাকে দিয়ে ঘরের বিভিন্ন কাজ করানো হয়। মোটকথা তাকে ঘরেরই একজন সদস্য মনে করা হয়। কিন্তু পরে যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তখন আফসোসের আর শেষ থাকে না। বস্তুত আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য পর্দার বিধান দিয়েছেন তাদের কল্যাণার্থেই। এর মাধ্যমে তারা পার্থিব জীবনে বিভিন্ন আপদ-বিপদ থেকে বাঁচতে পারবে। অথচ মানুষ পর্দার ফরজ বিধানকে অবজ্ঞা করে, গুরুত্ব দেয় না। এরপর যখন কোনো বিপদে পড়ে, তখন ঠিকই পর্দার গুরুত্ব বুঝে আসে। কিন্তু তখন তো সবকিছুই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

অনেক পরিবারের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন স্কুল বা মাদরাসায় পড়াশোনা

করে। প্রায়ই দেখা যায় এসব ছেলেমেয়েকে তার মা বা বোন আনা-নেয়া করেন। এ সময় অনেক মা-বোন মাদরাসার শিক্ষকদের সাথে সরাসরি কথা বলেন। ফোনে কথা বলেন। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই।

আমাদের জানামতে উত্তরার এক মাদরাসা কাম স্কুলের কিছু পর্দানশীন মহিলা অভিভাবক এক শিক্ষকের সাথে টুকটাক আলাপে জড়ান। সেখান থেকে বাচ্চাকে আলাদা কেয়ারের নামে গৃহশিক্ষক হিসেবে ঘরে প্রবেশ করেন। এবং শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি দ্বীনদার বলে পরিচিত একাধিক পরিবারের নারীগণ আলেম নামের সেই কুলাঙ্গারের লালসার শিকার হয়। এসব ফাঁদে একবার পা দিলে বেড়িয়ে আসা মুশকিল। ওপরে ওপরে দাওয়াতের মেহনত হচ্ছে, তালীম হচ্ছে, বড় বড় কথা হচ্ছে, কিন্তু ভেতরটা কলুষতায় ভরে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের মা-বোনদের হেফাজত ফরমান।

নূপুর পরিধানের শরয়ী বিধান

অনেক নারী বাইরে যাওয়ার সময় নূপুর পরিধান করে যান। এবং হাঁটার সময় নূপুর থেকে শব্দও হয়। আবার অনেক দ্বীনদার নারী পর্দা করলেও নূপুর পরিধান করে বাইরে যান। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান সুস্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবে স্বামীর জন্য ঘরের মধ্যে নূপুর পরিধান করা জায়েয। তবে বাইরে পরে যাওয়া জায়েয নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট বাণী রয়েছে,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> 'তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[১২৮]

একবার আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর কাছে একটি মেয়ে আসে, যার পায়ে নূপুর ছিল এবং তা শব্দ করছিল। তখন আয়েশা রাযি. বললেন, তার পায়ের নূপুর না খুলে তাকে আমার কাছে আনবে না। তিনি আরও বলেন, আমি

১২৮. সূরা নূর, (২৪) : ৩১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ঘরে ঘণ্টা (বাজনাদার বস্তু) থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[১২৯]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে বোঝা যায়, পরপুরুষকে আকৃষ্ট করে এমন-সব কাজ থেকে বিরত থাকা ঈমানদার নারীর কর্তব্য। কারণ পরপুরুষকে নূপুরের আওয়াজ শোনানোর উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ যখন নিষেধ করা হয়েছে, তখন যে সকল কাজ, ভঙ্গি ও আচরণ এর চেয়েও বেশি আকৃষ্ট করে তা নিষিদ্ধ হওয়া তো সহজেই বোঝা যায়। মুসলিম নারীদের জন্য এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু মৌলিক নীতিমালা

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান অত্যন্ত যৌক্তিক ও উপকারী। একটা বিষয় মাথায় রাখা চাই, শরীয়ত বিশেষ কোনো পোশাক সুনির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইন বা আকৃতিও বলে দেয়নি যে, এ ধরনের পোশাকই তোমাদের পরতে হবে, জুব্বা বা পাঞ্জাবিই পরতে হবে; বরং বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল, আবহাওয়া ও মৌসুম ভেদে পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে কিছু মৌলিক নীতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এ ধরনের পোশাক গ্রহণীয় ও এ ধরনের পোশাক বর্জনীয়। সুতরাং মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এসব নীতিমালা ও সীমারেখা মেনে চলা জরুরি। যে পোশাক এই নীতিমালা ও সীমারেখা অনুযায়ী হবে, সেটাই শরীয়তসম্মত পোশাক বলে গণ্য হবে।

এক. পোশাক যেন আঁটোসাঁটো ও ছোট মাপের না হয়, যা শরীরের সাথে একেবারে লেপ্টে থাকে এবং দৈহিক গঠন ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।

আবু ইয়াযীদ মুযানী রহ. বলেন, হযরত উমর রাযি. মহিলাদের কাবাতী (মিসরে প্রস্তুতকৃত একধরনের সাদা কাপড়) পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা বলল, এই কাপড়ে তো ত্বক দেখা যায় না। তিনি বললেন, ত্বক দেখা না গেলেও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।[১৩০]

---

১২৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৩১। মুসনাদে আহমাদ, ২৬০৫২, আমলযোগ্য।

১৩০. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৭৯২। সনদ মাওকুফ ও মুনকাতি। তবে মাওকুফ সহীহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৯২৫৩

এখন অনেক নারী টাইটফিট বোরকা পরিধান করেন। এতে দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ ফুটে ওঠে। এমন বোরকা দ্বারা পর্দা আদায় হওয়া তো দূরের কথা, এসব বোরকা পরিধান করাই জায়েয নয়। আবার অনেক পুরুষও টাইটফিট পোশাক পরিধান করেন, যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং নামাজের সময় তা সমস্যা সৃষ্টি করে। কারও কারও প্যান্ট সিজদায় গেলে নিচে নেমে যায়। কেউ কেউ টাইট প্যান্ট পরার কারণে ইস্তিঞ্জার পর ভালোভাবে পবিত্রও হতে পারে না।

দুই. পোশাক যেন এত পাতলা ও মিহি না হয়, যাতে শরীর দেখা যায় এবং সতর প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন : পাতলা সুতির কাপড়, জর্জেটের কাপড়, নেটের কাপড় ইত্যাদি। তবে কেউ যদি পাতলা কাপড়ের নিচে সেমিজ জাতীয় কিছু ব্যবহার করে, তাহলে তা জায়েয হবে। তবে এসব পোশাক না পরাই উত্তম।

হযরত আলকামা ইবনে আবু আলকামা তার মা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হাফসা বিনতে আবদুর রহমান তার ফুফু উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি.-এর নিকটে এল। তখন তার পরনে ছিল একটি পাতলা ওড়না। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন।[১৩১]

অনেক নারীই এমন রয়েছে, যারা বাইরে বেপর্দা হয়ে যান, উপরন্তু তারা এতটাই পাতলা পোশাক পরিধান করেন যে, ভেতরের বিশেষ পোশাকটিও দেখা যায়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা রুচির দৈন্যতার পরিচায়ক।

তিন. পোশাকের ক্ষেত্রে কাফের-মুশরিক ও ফাসেক লোকদের অনুসরণ-অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না। বিশেষত সেসব পোশাকের ক্ষেত্রে, যা অমুসলিমদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'উসফুর' (ছোট ধরনের হলদে বর্ণের ফুল গাছ) দ্বারা রাঙানো দুটি কাপড় পরতে দেখে বললেন, 'এগুলো হচ্ছে কাফেরদের পোশাক। অতএব তুমি তা পরিধান করো না।'[১৩২]

তা ছাড়া অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

১৩১. মুয়াত্তা মালেক (মুসআব যুহরি), ১৯০৭। সহীহ।
১৩২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৭৭; নাসায়ী, হাদীস নং ৫৩১৬

করেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।'[১৩৩]

চার. পোশাকের মাধ্যমে অহংকার ও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্য হওয়া যাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুখ্যাতি ও প্রদর্শনীর পোশাক পরবে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।'[১৩৪]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি অহংকারবশত মাটিতে কাপড় টেনে টেনে চলে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।'[১৩৫]

পাঁচ. পুরুষদের জন্য মেয়েলি পোশাক এবং নারীদের জন্য পুরুষদের পোশাক পরা এবং একে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করা নিষেধ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব পুরুষের ওপর লানত করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে (তাদের মতো আকৃতি, তাদের পোশাক ও তাদের চালচলন গ্রহণ করে)। আর সেসব নারীর ওপরও লানত করেছেন, যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।'[১৩৬]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন।[১৩৭]

ছয়. পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় করা, বিলাসিতা করার জন্য বা শখের বশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক ক্রয় করা অথবা মাত্রাতিরিক্ত উচ্চমূল্যের পোশাক ক্রয় করা নিষেধ।

---

১৩৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১; মুসনাদে আহমাদ, ৫১১৫। হাসান।
১৩৪. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৬২৪৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৯। হাসান।
১৩৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৭
১৩৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৫
১৩৭. সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ২৫৫৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৬০৫। হাসান।

হযরত আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা খাও, পান করো, অন্যদের দান করো এবং কাপড় পরিধান করো, যে পর্যন্ত অপচয় ও অহংকার করা না হয়।'[১৩৮]

সাত. গায়রে মাহরাম ও পরপুরুষের সামনে অলংকার ও পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না, যাতে তারা সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

> 'আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না।'[১৩৯]

উক্ত আয়াতে নারীদের হুকুম করা হয়েছে, তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের সামনে নিজেদের পুরো শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা আবৃত করে রাখে। যাতে তারা সাজসজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়।

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, 'যেসব কর্ম নারীর ওপর লানত করে তা হলো, অলংকার ও আকর্ষণীয় পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ করা। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার ...।'[১৪০]

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

> 'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো, সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। যেমন প্রাচীন জাহেলি যুগে প্রদর্শন করা হতো।'[১৪১]

প্রাচীন জাহেলি যুগে নারীরা নির্লজ্জ সাজসজ্জার সাথে নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াত। আজকের নব্য জাহেলিয়াতের অশ্লীলতা এতটাই উগ্র যে, তার সামনে প্রাচীন জাহেলিয়াত ম্লান হয়ে গেছে।

আট. পুরুষের জন্য টাকনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা নিষেধ এবং তা কবীরা গুনাহ।

---

১৩৮. সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ২৫৫৯; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩১০৫

১৩৯. সূরা নূর, (২৪) : ৩১

১৪০. আল-কাবায়ের, পৃষ্ঠা ১৩৫ (কবিরা গুনাহ নং ৩৩)

১৪১. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৩

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কাপড়ের যে অংশ টাকনুর নিচে যাবে, তা (টাকনুর নিচের অংশ) জাহান্নামে জ্বলবে।'[১৪২]

হযরত আবু হুবাইব ইবনে মুগাফফাল গিফারী রাযি. মুহাম্মাদ কুরাশীকে লুঙ্গি টেনে চলতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে অহংকারবশত পায়ের নিচে কাপড় ফেলে চলবে, সে জাহান্নামে গিয়ে এভাবে চলবে।'[১৪৩]

আল্লাহ তাআলা মহিলাদের সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো। এ আয়াতে একটি মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে যে, নারীর আসল জায়গা ও কর্মস্থল তার ঘর। গৃহকর্ম ও খান্দান গড়ে তোলাই তার দায়িত্ব। যেসব তৎপরতা এ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায়, তা নারীজীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এর অর্থ এমন নয় যে, ঘর হতে বের হওয়া তার জন্য একদম জায়েয নয়। অতি প্রয়োজনে ঘর হতে বের হওয়া জায়েয। তবে কিছু আদব ও নিয়ম মেনে চলতে হবে।

১. পুরো শরীর বড় এবং মোটা চাদর দ্বারা অথবা সমগ্র শরীর ঢাকা যায় এমন বোরকা দ্বারা আবৃত করে ফেলবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের কোনো অংশ খোলা রাখা যাবে না। চেহারা, উভয় হাত কবজিসহ এবং উভয় পা টাকনু বা গোড়ালিসহ আবৃত করবে। পথ-ঘাট দেখার জন্য শুধু চোখ খোলা রাখা যাবে। প্রয়োজনে হাত ও পায়ের মোজা এবং চেহারার জন্য আলাদা নেকাব ব্যবহার করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ

'হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের মুখের ওপর তাদের চাদর নামিয়ে দেয়।'[১৪৪]

---

১৪২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৭

১৪৩. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫৬০৫। সহীহ।

১৪৪. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৫৯

অন্য আয়াতে মুমিন নারীদের সম্বোধন করে বলেছেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْــنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

'তোমরা সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। যেমন প্রাচীন জাহেলি যুগে প্রদর্শন করা হতো।'[১৪৫]

মনে রাখতে হবে, টাকনু পর্যন্ত কদম, কবজি পর্যন্ত হাতের পাতা এবং চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তা নামাজের সময় খোলা রাখা যাবে। কিন্তু এসব অঙ্গ পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ফলে গায়রে মাহরাম ও পরপুরুষের সামনে তা খোলা রাখা যাবে না।

২. ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় মেকআপ, সাজসজ্জা গ্রহণ করবে না এবং কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মহিলা সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হয় এবং লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, যাতে তারা তার খুশবু গ্রহণ করে, তবে সে ব্যভিচারিণী।[১৪৬]

৩. স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'নারী স্বামীর ঘর হতে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বের হবে না, যদি বিনানুমতিতে বের হয় তবে সে ঘরে ফিরে আসা বা তাওবা না করা পর্যন্ত আযাব ও রহমতের ফেরেশতারা তার প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকে।'[১৪৭]

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণির মানুষের নামাজ কবুল হয় না। ১. যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে যায়, ২. পলাতক কৃতদাস ৩. এবং এমন ইমাম, যার প্রতি তার মুকতাদীগণ (শরীয়তসম্মত কারণে) অসন্তুষ্ট।'[১৪৮]

৪. দূরের সফর হলে একা যাবে না; বরং কোনো মাহরাম পুরুষের সাথে যাবে।

---

১৪৫. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৩

১৪৬. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৯৭১১; সুনানে আবু দাউদ, ৪১৭৩; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৮৬। সহীহ।

১৪৭. মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসী, ২০৬৩; মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাহ, ১৭১২৪; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ১৪৭১৩; কাশফুল আসতার, ১৪৬৪। সনদ হাসান গরীব।

১৪৮. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাহ, ৪১১২। ইমাম বুসিরীর মতে সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকলেও বর্ণনাকারীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। হাসান। ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহাররাহ, ১০৯৯।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাষণে বলতে শুনেছি, কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া নির্জনে অবস্থান করবে না। এবং কোনো নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না।[১৪৯]

৫. এমনভাবে চলবে না যে, অলংকারের শব্দ মাহরাম নয় এমন কেউ শুনতে পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

'মুসলিম নারীদের উচিত, মাটিতে এমনভাবে পা না ফেলা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজসজ্জা জানা হয়ে যায়।'[১৫০]

৬. গায়রে মাহরাম তথা বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

'হে নবী, মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।'[১৫১]

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে করণীয় কী জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করেছিলেন।[১৫২]

৭. মাহরাম নয় এমন পুরুষের সাথে অতি প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না। একান্ত যদি বলতেই হয়, তবে নরম ও কোমল ভাষায় বলবে না, যাতে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

---

১৪৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪১
১৫০. সূরা নূর, (২৪) : ৩১
১৫১. সূরা নূর, (২৪) : ৩১
১৫২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫৯; সুনানে তিরমিযী, ২৭৭৬

'তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বলো সংগত কথা।'[১৫৩]

মাহরাম ছাড়া নারীদের সফর : শরয়ী দৃষ্টিকোণ

ইসলামী শরীয়ত নারীদের সম্মান-মর্যাদা ও তাদের সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। তাই যে ক্ষেত্রে তাদের সম্মান-মর্যাদা বা সুরক্ষা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত তাদের জন্য বিশেষ বিধান দিয়েছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শরীয়তের সাধারণ বিধান হচ্ছে, কোনো নারীর জন্য স্বামী বা মাহরাম ছাড়া আটচল্লিশ মাইল (সাতাত্তর কিলোমিটার) বা তার বেশি দূরত্বে একাকী সফর করা বৈধ নয়। চাই সেটা হজের সফর হোক বা উচ্চশিক্ষার জন্য।

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ সফর এবং হজের সফর সকল ক্ষেত্রেই মাহরাম ছাড়া নারীদের একাকী সফর করতে নিষেধ করেছেন।

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

'হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাহরামকে সঙ্গে না নিয়ে কোনো নারী তিন দিন দূরত্বের পথে সফর করবে না।'[১৫৪]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

---

১৫৩. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩২
১৫৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৮

'যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য নিজের বাবা, ছেলে, স্বামী, ভাই বা অন্য কোনো মাহরামকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিন বা ততধিক দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।'[১৫৫]

এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মাহরাম ছাড়া হজের মতো সফরেও বের হওয়া যাবে না। আর এত সুস্পষ্ট হাদীস থাকার পর এখানে ভিন্ন কোনো যুক্তি দাঁড় করানো বাঞ্ছনীয় নয়।

এমনিভাবে বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

'হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবীজী বলেছেন, কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সঙ্গে তার মাহরাম ব্যতিরেকে একাকী অবস্থান না করে। তখন এক ব্যক্তি উঠে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়েছি। ওদিকে আমার স্ত্রী হজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে। নবীজী বললেন, ফিরে যাও। তোমার স্ত্রীর সাথে হজ করো।'[১৫৬]

উপরিউক্ত বর্ণনাগুলোতে একটু চিন্তা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নারীর জন্য মাহরাম ব্যতীত ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার ওপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে স্বামীকে জিহাদের মতো পবিত্র দায়িত্বের পরিবর্তে স্ত্রীকে নিয়ে হজ করতে বলা হচ্ছে।

এ ছাড়াও হজ ফরজ হওয়ার পরও মাহরাম ছাড়া কোনো মহিলার জন্য তা আদায় করা ওয়াজিব নয়; বরং তার জন্য হুকুম হলো, যদি মৃত্যু পর্যন্ত মাহরাম পাওয়া না যায়, তাহলে সে মৃত্যুর পূর্বে হজের অসিয়ত করে যাবে।

---

১৫৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪০
১৫৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪১

এখানে আরেকটি বিষয় হলো, একজন ব্যক্তি ইবাদত ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উমরা করে থাকে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশা করা নিরর্থক ও বোকামি।

তা ছাড়াও ইসলামী শরীয়তে একজন নারীর সফরের জন্য মাহরামের শর্ত করা হয়েছে তার সম্মান ও সুরক্ষার জন্য, সফরে তার নিরাপত্তা ও পেরেশানী লাঘব করার জন্য। তাই নারীদের উচিত শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলা এবং ইসলামী শরীয়তকে নিজের রক্ষাকবজ হিসেবে বিবেচনা করা।

তাই নারীর জন্য মাহরাম ব্যতীত সফর করা জায়েয নেই, চাই তা হজ-উমরার জন্যই হোক বা শিক্ষার জন্যই হোক এবং সে একা সফর করুক বা নারীদের কাফেলার সাথে হোক, সে যুবতি হোক বা বৃদ্ধা। সাধারণভাবে নারীদের জন্য মাহরাম ছাড়া সফর করা জায়েয নেই। এর হেকমত হলো, সফরে স্বামী ও মাহরাম ব্যক্তি একজন নারীর যতটুকু সম্মান ও সুরক্ষা করতে পারে, অন্য মহিলারা তা রক্ষা করতে পারে না; বরং সেই মহিলারা নিজেরাই তো তাদের নিরাপত্তা দিতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, যদি বেশি জরুরত দেখা দেয়, যেমন বর্তমানে এমন হয় যে, কোনো নারী হজের জন্য টাকা জমা দিয়েছে বা সবকিছু রেডি তখন হঠাৎ করে স্বামী মারা গেল বা যে মাহরামের সাথে হজে যাবে সে মারা গেল, তখন অন্য নিরাপদ মহিলাদের সাথে হজে যেতে পারবে। অন্যথায় তো তার এই টাকাটা বৃথা যাবে। যেহেতু এটা কতয়ী হুকুম না, তাই এ ধরনের জটিল ওজরের ক্ষেত্রে মাহরাম ছাড়াও হজে যেতে পারবে।[১৫৭]

গভীর রাতের মাহফিল সমাচার

ওয়াজ-নসীহত, দ্বীনী আলোচনা নিঃসন্দেহে মুমিনদের জন্য উপকারী। ওয়াজ-নসীহত নব্য আবিষ্কৃত কোনো বিষয় নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগ থেকেই এর প্রচলন চলে আসছে। তবে যুগের পরিবর্তনে এর ধরনেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। প্রচলিত গভীর রাতের

---

১৫৭. আলবাহরুর রায়েক, ২/৩১৪-৩১৫; আদদুররুল মুখতার, ২/৪৬৪-৪৬৫; মানাসিক, মোল্লা আলী কারী, পৃষ্ঠা : ৭৬ ও ৭৮; গুনয়াতুন নাসিক, পৃষ্ঠা : ২৬-২৭ ও ২৯; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ২/১৫৬; বাদায়েস সানায়ে, ২/১২৩

মাহফিল নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। তবে পুরুষের মতো মহিলাদের প্রকাশ্যে মাঠে-ময়দানে ডেকে এনে এভাবে সম্মেলন করা এবং মহিলা বক্তা কর্তৃক সেখানে মাইকে আলোচনা করার প্রচলিত পন্থাটি শরীয়তসম্মত নয়।

তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে গ্রামীণ এলাকায় অবস্থান ও সফরের সূত্রে অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখেছি তা বেশ পীড়াদায়ক। অনেক এলাকায় ওয়াজ ও মাহফিলে মা-বোনদের যাতায়াতের সুযোগ নিয়ে বিপথগামী কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতি এমনকি বয়স্কদের মধ্যে নৈতিক পদস্খলনের ঘটনা শোনা যায়।

সার্বিক বিবেচনায় এ পদ্ধতির সম্মেলন বা ওয়াজ-মাহফিল বর্জনীয়। কেননা,

ক. প্রচলিত পদ্ধতির এই মহিলা সম্মেলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের তালীম-তরবিয়ত ও তাদের অনুসৃত পথের পরিপন্থী। মানুষকে দ্বীন শেখানোর অন্যতম মাধ্যম এই ওয়াজ-নসীহতের পথ ও পন্থা শরীয়ত নির্দেশিত উপায়ে হওয়া আবশ্যক। শরীয়ত সমর্থন করে না এমন সব পন্থা সব ক্ষেত্রেই বর্জন করা জরুরি।

এটা তো অনস্বীকার্য বিষয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের নারীগণ দ্বীন শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি আগ্রহী এবং সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত অমিয়-সুধা শোনার জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। তাই তিনি তাদেরকে যে পন্থায় ওয়াজ-নসীহত করেছেন মূলত সেটাই আমাদের অনুসরণীয়। সে পদ্ধতি কী ছিল লক্ষ করুন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, একবার কিছুসংখ্যক নারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার মজলিসে পুরুষদের সাথে বসতে পারি না। আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করুন, যাতে সেদিনটিতে আমরা আপনার নিকট আসতে পারি। তিনি বললেন, “مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ” অর্থাৎ নির্ধারিত দিন অমুক মহিলার ঘরে জমায়েত হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করলেন।[১৫৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের ওয়াজ-নসীহত করার জন্য

---

১৫৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৩৩

পুরুষদের দৃষ্টির আড়ালে ঘরোয়া একটি পরিবেশ ও স্থান নির্বাচন করেছেন। তাদের আবদারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ্য স্থান যেমন : মসজিদে নববীর কথা না বলে সরাসরি বলে দিলেন, "مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ" অমুক মহিলার গৃহে অবস্থান করো। মূলত তাঁর এই নির্দেশ মহিলাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের যে কুরআনী নির্দেশনা রয়েছে তারই অংশ।

খ. এসব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের ব্যাপকভাবে পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হয়। যা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু তারা যদি যথাযথভাবে পর্দা মেনেও উক্ত সম্মেলনে আসার পাবন্দী করে নেয়, তবুও এভাবে নারীদের ওয়াজ-মাহফিলে উপস্থিত করা শরীয়তের রুচি-প্রকৃতি ও স্বভাববিরুদ্ধ। শরীয়তের চাহিদা হলো, মহিলাদের ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে তাদের সকল কর্মকাণ্ড পুরুষদের থেকে আলাদা ও অতি গোপনীয় হবে। পুরুষের জন্য যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে এসে জামাতের সাথে আদায় করা শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ হুকুম, সেখানে তাদেরকে গৃহাভ্যন্তরে নামাজ আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। মসজিদে নববীতে যেখানে এক রাকাত নামাজ এক হাজার রাকাতের সমান,[১৫৯] এক বর্ণনামতে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সমান,[১৬০] এর সাথে আবার আল্লাহর রাসূলের মতো ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য তো রয়েছেই। তা সত্ত্বেও সে সময় নারী সাহাবীদের তাদের গৃহাভ্যন্তরের সর্বাধিক নির্জন স্থানে নামাজ পড়াকে উত্তম বলা হয়েছে।[১৬১]

গ. এসব সম্মেলনে নারীরা পর্দার সাথে আসলেও যেসব ওয়াজ-মাহফিলে বক্তাকে দেখানোর জন্য প্রজেক্টর লাগানো হয়, সেখানেও তো পর্দার খেলাফ হয়। প্রজেক্টরের মাধ্যমে ওয়াজ দেখানোর ক্ষেত্রে বেগানা পুরুষকে দেখার বিষয়টি ছাড়াও আরও ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। জানা কথা যে, বর্তমানে কোনো কোনো বক্তা নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যার কারণে তাকে সরাসরি দেখে কোনো যুবতি নারী ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না; বরং কিছু নারী ফিতনায় পতিত হচ্ছে বলেই শোনা যায়।

---

১৫৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৪, ১৩৯৫

১৬০. সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৪১৩; তাবারানী, মুজামুল আওসাত, ৭/১১২ হাদীস নং ৭০০৮। সনদ দুর্বল।

১৬১. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৭০। হাসান। সহীহ ইবনে খুযাইমা, ১৬৮৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, ২২১৭। হাসান সহীহ।

ঘ. কোথাও কোথাও নারী বক্তা দিয়ে মহিলা সম্মেলন হয়। এসব মহিলা সম্মেলনে মহিলা বক্তা কর্তৃক মাইকে আলোচনা করা, সুরেলা কণ্ঠে বয়ান করা, যার আওয়াজ সভাস্থলের গণ্ডি পার হয়ে কেবল আশপাশের পুরুষগণই নয়; বরং দূরদূরান্তের লোকদের কাছেও পৌঁছে যায়, তা শরীয়তের নির্দেশনার যে সুস্পষ্ট সীমালঙ্ঘন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নারীর প্রতি শরীয়তের বিধান ও চাহিদা হলো, তার কণ্ঠস্বর যেন প্রয়োজন ছাড়া পরপুরুষ শুনতে না পায়। এ বিধান কেবল সাধারণ ক্ষেত্রেই নয়; বরং ইবাদত-বন্দেগী ও আমলের ক্ষেত্রেও তা পূর্ণমাত্রায় লক্ষ রাখা হয়েছে। যেমন :

১. মুয়াজ্জিনের এত অধিক মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও নারীর কণ্ঠস্বর যেন বিনা প্রয়োজনে পরপুরুষ শুনতে না পায় এ জন্য তাদের ওপর আজানের বিধান দেয়া হয়নি।[১৬২]

২. উচ্চ আওয়াজ-বিশিষ্ট ফরজ নামাজের কেরাত তাদের জন্য নিম্ন আওয়াজে পড়ার বিধান রয়েছে।[১৬৩]

৩. নামাজে ইমামের কোনো ভুলত্রুটি হলে তা অবগত করানোর জন্য পুরুষ মুক্তাদীদের 'সুবহানাল্লাহ' বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে একই বিষয়ে নারীদেরকে 'তাসফীক' অর্থাৎ এক হাতের পিঠ অন্য হাতের তালুতে মেরে শব্দ করতে বলা হয়েছে। যেন পুরুষরা আওয়াজকারী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বুঝতে না পারে।[১৬৪]

৪. হজের তালবিয়া পুরুষগণ উচ্চ আওয়াজে পড়বে। কিন্তু মহিলারা পড়বে নিম্ন আওয়াজে। এ ধরনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পার্থক্য বিদ্যমান।[১৬৫]

হ্যাঁ, প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে পর্দার আড়ালে থেকে টুকটাক দরকারি কথা বলা নিষেধ নয়। তবে এ ক্ষেত্রেও কোমলতা, নম্রতা পরিহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

১৬২. এটাই সালাফদের মত। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ৫১৬৪-৫১৬৯; বাদায়িউস সানায়ে, ১/১৫২; মুদাওয়ানাহ, ১/১১৩; আল-হাওয়িল কাবীর, ২/৫১; আল-মুগনী, ২/৮০

১৬৩. ফাতহুল কাদির, ১/২৬০; মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ, ১৬/১৯০

১৬৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২২

১৬৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ১৪৬৬২, ১৪৬৬৪, ১৪৬৬৬; আল মুগনী, ৫/১৬০; ফাতহুল কাদীর, ২/৫১৪

লক্ষণীয় বিষয় হলো, কণ্ঠস্বরের কোমলতা পরিহারের নির্দেশ সরাসরি নবীযুগের নারীদের দেয়া হয়েছে। এখন কথা হলো, তাদের ব্যাপারেই যদি এমন নির্দেশ হয়ে থাকে, তাহলে এ যুগের মহিলা বক্তাদের মাইকে আলোচনা করা এবং সুরেলা কণ্ঠ দেয়া কতটা শরীয়ত-বিরোধী কাজ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দ্বীনের জরুরি ইলম শিক্ষা করা নারীদের ওপরও ফরজ। তাদেরকে সঠিক ঈমান-আকীদা শিক্ষা দেয়া, তালীম-তরবিয়ত করা, ওয়াজ-নসীহত শোনানো খুবই দরকারি। তবে এর পদ্ধতি হতে হবে অবশ্যই শরীয়তসম্মত। আর এর অনুসৃত পদ্ধতি তো তা-ই, যা হাদীস শরীফে এসেছে। অর্থাৎ ঘরের পুরুষরা দ্বীন শিখে তাদের নারীদের শেখাবে। এতে প্রত্যেক ঘরেই দ্বীনী তালীমের চর্চা হবে এবং ঘরে ঘরে দ্বীনী পরিবেশ কায়েম হবে। পুরুষরা কর্মব্যস্ততার কারণে যদি অধিক সময় না পায়, তবে তাদের থেকে নারীরা শিখে ঘরের মেয়েদের, অনুরূপ আশপাশের মেয়েদের সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন মাজীদ শেখাবে, প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শেখাবে, হক্কানী উলামায়ে কেরামের রচিত কিতাব থেকে ওয়াজ-নসীহত শোনাবে। মাঝে মাঝে হক্কানী আলেম ও বুযুর্গদের এনে ঘরোয়াভাবে পর্দা-পুশিদার সাথে ওয়াজ-নসীহত শুনবে। ইনশাআল্লাহ শরীয়তসম্মত উক্ত পদ্ধতিতে তাদের অধিক ফায়েদা হবে।

অতএব প্রত্যেক মাহফিল কমিটির কর্তব্য হলো, মহিলাদের জন্য মাহফিলে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা থেকেই বিরত থাকা। কেননা এর দ্বারা মহিলাদের ব্যাপারে শরীয়তের অনেকগুলো বিধান ও নির্দেশনার লঙ্ঘন হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা পুরোপুরি নাজায়েযের আওতায় চলে যেতে পারে। তাই নিজেদের আবেগ ও চাহিদা অনুযায়ী আমল না করে শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় এবং শরীয়তের চাহিদা অনুযায়ী আমল করাই মুসলমানদের করণীয়।

প্রকাশ থাকে যে, দ্বীনের জরুরি ইলম শিক্ষা করা নারীদের ওপরও ফরজ। তাদেরকে সঠিক ঈমান-আকীদা শিক্ষা দেয়া, তালীম-তরবিয়ত করা খুবই দরকার। তবে এর পদ্ধতি হতে হবে অবশ্যই শরীয়তসম্মত। আর তা হলো ঘরের পুরুষরা দ্বীন শিখে তাদের নারীদের শেখাবে। এমনিভাবে বাড়িতে বাড়িতে ঘরোয়া দ্বীনী মাহফিল এবং ঘরোয়া দ্বীনী তালীমের আয়োজন করা। আর বাসার কাছে মেয়েদের অনাবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা থাকলে সেখানে গিয়ে দ্বীন

শিখে আসতে পারে। এতে প্রত্যেক ঘরেই দ্বীনী তালীমের চর্চা হবে এবং ঘরে ঘরে দ্বীনী পরিবেশ কায়েম হবে, ইনশাআল্লাহ।

ঈদের জামাতে মহিলাদের উপস্থিতি

ঈদের নামাজ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও সজ্ঞান পুরুষের ওপর ওয়াজিব। মেয়েদের ওপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব নয়। আর মেয়েরা ঈদের নামাজের জন্য ঈদগাহে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফদের অনেকেই মেয়েদের ঈদগাহে যেতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَائَهُ فِي الْعِيْدَيْنِ.

'নাফে রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পরিবারের নারীদের দুই ঈদে ঈদগাহে যেতে দিতেন না।'[১৬৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عُــرْوَةَ، عَنْ أَبِيــهِ، أَنَّــهُ كَانَ لَا يَدَعُ امْــرَأَةً مِنْ أَهْلِــهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْــرٍ، وَلَا إِلَى أَضْحَى.

'উরওয়া তাঁর পিতা (যুবাইর রাযি.—যিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর একজন) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজ পরিবারের নারীদের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার জামাতে যেতে দিতেন না।'[১৬৭]

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী রহ. বলেন,

لَا نَعْرِفُ خُرُوْجَ الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ عِنْدَنَا فِي الْعِيْدَيْنِ.

'আমাদের সময়ে দুই ঈদের জন্য যুবতি নারীদের বের হওয়ার প্রচলন ছিল না।'[১৬৮]

ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন,

---

১৬৬. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৫৮৯০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৫৭৯৫; ২১২৯। সহীহ।
১৬৭. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং ৫৭৯৬; ইবনে মুনযির নিশাপুরী, আল-আওসাত, ২১২৯, সহীহ।
১৬৮. ইবনে মুনযির নিশাপুরী, আল-আওসাত, ২১২৯; উমদাতুল কারী, ৩/৩০৫

يُكْرَهُ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ.

'উভয় ঈদে মহিলাদের (নামাজের জন্য) বাইরে যাওয়া মাকরূহ।'[১৬৯]

নারীদের তারাবীর জামাত

রমজান মাসে অনেক বাসায় মহিলাদের জন্য তারাবীর নামাজের ব্যবস্থা করা হয়। এবং এতে আশেপাশের মহিলারাও এসে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম কথা হচ্ছে, তারাবীর জামাতের জন্য মহিলাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে এভাবে একত্র করা শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারে অপছন্দনীয়। ফরজ নামাজের জামাতের বিশেষ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের নিজ ঘরের অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করাকে অধিক উত্তম ও সওয়াবের কাজ বলেছেন। হাদীসে এসেছে, হযরত উম্মে হুমাইদ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সাথে নামাজ পড়তে পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানি, তুমি আমার সাথে নামাজ পড়তে পছন্দ করো। কিন্তু তোমার জন্য ঘরের ভেতর নামাজ পড়া বাইরের কামরায় নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। ঘরের ভেতরের ছোট কামরায় নামাজ পড়া বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। আর বাড়ির নামাজ পড়া মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।[১৭০]

এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই ফরজ নামাজের জামাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। ফরজ নামাজের জামাতে মহিলাদের এত নিরুৎসাহিত করা হলে তারাবীর ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সুতরাং বিভিন্ন বাসা থেকে কোনো বাড়িতে বা মসজিদে মহিলাদের তারাবীর জামাতের জন্য একত্র হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। মহিলাদের জন্য নিজ নিজ ঘরে একাকী তারাবী পড়াই উত্তম।

---

১৬৯. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস ৫৭৯৪; ইবনে মুনযির নিশাপুরী, আল-আওসাত, ২১২৯, সহীহ।

১৭০. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৭০৯০। হাসান।

তবে কেউ চাইলে নিজ ঘরের মাহরাম নারীদের নিয়ে জামাতে তারাবীর নামাজ পড়তে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই।[১৭১]

কাজের লোকের সাথে পর্দা

একবার উত্তরার এক মুবাল্লিগ সাথির বাসায় গেলাম। ব্যক্তিগতভাবে ভদ্রলোক এবং তার স্ত্রী বেশ দ্বীনদার এবং পর্দার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তো আমরা ড্রয়িংরুমে বসে আছি। কিছুক্ষণ পর এক মহিলা নাস্তা নিয়ে আসলেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, মহিলাটি তাদের বাসার গৃহপরিচারিকা। অর্থাৎ কাজের মহিলা।

অনেকেই ইসলামের দাসী-বাঁদির মাসআলা টেনে এনে মনে করেন যে, কাজের লোক বা কাজের মেয়েদের সাথে পর্দা নেই। বিষয়টা মোটেও এমন নয়। কারণ, আমাদের ঘরের কাজের লোকজন আমাদের কেনা গোলাম-বাঁদি নয়। তারা আমাদের ঘরের কাজের সহযোগী। অর্থের বিনিময়ে কাজের চুক্তিতে আবদ্ধ। ব্যক্তিগতভাবে তারা স্বাধীন। তাই এ ক্ষেত্রে মাসআলাটা গাইরে মাহরামের।

ঘরের কাজের সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত নারী বা পুরুষের সাথে বেপর্দা হয়ে চলা সামাজিক ব্যাধির রূপ ধারণ করেছে। তাদেরকে সবাই ঘরেরই লোক মনে করে। ফলে তাদের সাথে পর্দাও করে না। অথচ এটা সুস্পষ্ট হারাম। অনেক কাজের মহিলা এমন পোশাক পরিধান করে কাজকর্ম করে যে, দেহের অনেকাংশই উন্মুক্ত থাকে। এ ব্যাপারেও তাকে সতর্ক করে দেয়া। যাতে বেপর্দা হয়ে ঘরে কাজকর্ম না করে। ঘরের পুরুষদের জন্য আবশ্যক হলো, তার সাথে পরিপূর্ণ পর্দা করা। সে যেই ঘরে কাজ করবে সেই ঘরে পুরুষ থাকা যাবে না। এমনইভাবে ঘরে নিযুক্ত পুরুষ কাজের লোকের সাথেও মহিলাদের পর্দা করা ফরজ। তাদের সাথে যাবতীয় কথাবার্তা বলবেন ঘরের পুরুষ। হ্যাঁ, কোনো কারণে নারীদের কথা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকেই বলতে হবে।

এখানে একটি জরুরি বিষয়। অনেক সময় বাসায় মাহরাম মহিলাদের অনুপস্থিতিতে ছুটা কাজের বুয়া (অনাবাসিক গৃহ পরিচারিকা) আসে বা কাজের মেয়ে ঘরে রয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য একাকী বাসায় কোনোভাবেই

---

১৭১. সহীহ বুখারী, ৮৬৯; সহীহ মুসলিম, ৪৪৫; সুনানে আবু দাউদ, ৫৬৯ ; বাদায়েউস সানায়ে, ১/৬১৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৯; আদ্দুররুল মুখতার, ১/৫৬৬-৫৬৭

থাকা উচিত না। এতে ফিতনায় পড়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়। যে ঘরে গাইরে মাহরাম নারী ও পুরুষ থাকে, সেখানে তৃতীয়জন অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা বেড়ে যায়। আজকে সফল না হলেও প্রতিদিন সে তাদের গুনাহে জড়ানোর চেষ্টা করতেই থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

'কোনো পুরুষ অন্য নারীর সাথে একাকী অবস্থান করবে না। কারণ, সে সময় তাদের মধ্যে (কুমন্ত্রণা দিতে) তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান উপস্থিত থাকে।'[১৭২]

আমার আম্মা যখনই শুধু কাজের মহিলাকে বাসায় রেখে বাইরে যেতেন, আমাদেরও বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। এটাই নিয়ম যে, মাহরাম মহিলা না থাকলে কাজের বুয়াকে ফিরিয়ে দেয়া হবে কিংবা তিনি আসলে পুরুষরা বেরিয়ে যাবে। এর মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।

ড্রাইভারের সাথে পর্দা

ব্যক্তিগত গাড়ির ড্রাইভারের সাথেও নারীদের জন্য পর্দা করা ফরজ। তবে কোনো নারীর জন্য উচিত নয় যে, মাহরাম ছাড়া গাইরে মাহরাম পুরুষ ড্রাইভারের সাথে একই গাড়িতে বসে সফর করা। বিশেষ করে দূরের সফর তো জায়েযই নেই। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। আর কাছাকাছি কোথাও আসা-যাওয়া করলেও এতে পর্দার খেলাফ হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন আপদ-বিপদেরও শঙ্কা থাকে। একান্ত কারণবশত এভাবে গাড়িতে চড়তে হলে পূর্ণ পর্দার সাথেই উঠতে হবে। কেউ কেউ নিজের সাবালিকা মেয়েকে ড্রাইভারের সাথে স্কুলে বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেন। এটাও ঠিক নয়। নিজের মেয়ে বা স্ত্রীকে নিজের সাথেই নিয়ে যেতে হবে। অথবা তাদের সাথে অন্য কোনো মাহরামকে পাঠাতে হবে। এবং ড্রাইভারের উপস্থিতিতে গাড়ির ভেতর মুখের ওপর থেকে পর্দা সরানো যাবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

১৭২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৭। সহীহ।

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

'নারী হলো গোপন বস্তু। যখন সে বাইরে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।'[১৭৩] (অর্থাৎ নারীকে বা অন্য কাউকে ফিতনায় আক্রান্ত করার চেষ্টা করে।)

আরেক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

'কোনো পুরুষ অন্য নারীর সাথে একাকী অবস্থান করবে না। কারণ, সে সময় তাদের মধ্যে (কুমন্ত্রণা দিতে) তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান উপস্থিত থাকে।'[১৭৪]

র‍্যাগ-ডে, নবীনবরণ অনুষ্ঠান : অশ্লীলতার অপর নাম

র‍্যাগ-ডের নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজে পার্টি, উদ্দাম নৃত্য, বুলিং, অশ্লীলতা ও নগ্নতা এখন পুরোনো দৃশ্য। এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে সবাই এখন এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, এটা যে মারাত্মক একটি গুনাহের কাজ, এ ব্যাপারে কারও ভ্রুক্ষেপও নেই। এমনকি অনেক মেয়ে বোরকা-হিজাব পরেও এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে।

একাকী গুনাহের আযাব সে ব্যক্তিই ভোগ করে; কিন্তু দলবদ্ধভাবে যে গুনাহ করা হয়, সমাজে যে গুনাহ মহামারির রূপ ধারণ করে, তার শাস্তি সমাজের সবাই ভোগ করে। র‍্যাগ-ডে বা নবীনবরণের অনুষ্ঠানগুলো এখন দলবদ্ধ গুনাহের অনুষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। একটি মুসলিম দেশে এমন নির্লজ্জ কাজ দেখেও যদি আমাদের অন্তরাত্মা কেঁপে না ওঠে, তাহলে এটা ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক।

একটু ভেবে দেখুন, এসব অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ অশ্লীলতা ও নোংরামি হয়, আল্লাহ না করুন, এর কারণে যদি কোনো আযাব চলে আসে, তাহলে কী অবস্থা হবে? অথচ এর কারণে আমাদের ভেতর কোনো আফসোস নেই। এসব বন্ধ করারও কোনো প্রয়াস নেই। চলছে চলুক, তাতে আমার কী! আমি তো

---

১৭৩. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১১৭৩। সহীহ।
১৭৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৭। সহীহ।

আর যাচ্ছি না। অথচ শরীয়তের দাবি হলো, গুনাহের কাজে বাধা না দিলে ভালো লোকদেরও ধ্বংস অনিবার্য। হযরত নুমান বিন বাশীর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে আমরা এমনটিই পাই।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ القَائِمِ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوْا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيْعًا

হযরত নুমান বিন বাশীর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর হুদুদ অর্থাৎ শরীয়তের আহকামের ওপর যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত আর যে ব্যক্তি শরীয়তের আহকাম মান্য করে না, তাদের উদাহরণ ওই সমস্ত লোকদের মতো, যারা একটি জাহাজে আরোহণ করেছে। লটারির মাধ্যমে কারও স্থান ওপর তলায় আর কারও স্থান নিচতলায় নির্ধারিত হয়েছে। নিচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজনে ওপরে অবস্থানকারীদের নিকট যেতে হয়। এখন যদি নিচতলায় অবস্থানকারীরা চিন্তা করে, আমাদের বারবার যাতায়াতের কারণে ওপরে অবস্থানকারীদের কষ্ট হয়। সুতরাং আমরা জাহাজের নিচে ছিদ্র করে পানির ব্যবস্থা করি, তাহলে ওপরওয়ালাদের আর কষ্ট হবে না। এমতাবস্থায় যদি ওপরে অবস্থানকারীরা ('নিচের লোকেরা যা মন চায় করুক, তাতে আমাদের কী আসে যায়' এ কথা চিন্তা করে) নিচের লোকদের বাধা না দেয়, তাহলে জাহাজ ডুবে ওপর-নিচের সবাই পানিতে ডুবে মারা যাবে। আর যদি তারা নিচের লোকদের বোকামিকে প্রতিহত করে, তাদের জাহাজ ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখে, তাহলে সবাই নিরাপদ থাকবে।[১৭৫]

আরেক হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সমাজে যখন গুনাহের পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে,

১৭৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৯৩; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২১৭৩

তখন তাদের ভেতর নেককার লোক থাকার পরও ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার কঠিন আযাব আসার সমূহ আশঙ্কা থাকে।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ভেতর মুত্তাকী ও সৎ ব্যক্তি থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, যখন গুনাহ বেশি হবে। (অর্থাৎ সওয়াবের কাজ থেকে গুনাহের কাজ যখন বেশি হবে তখন ভালো লোক বিদ্যমান থাকলেও তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে)।[১৭৬]

এসব অনুষ্ঠানের নোংরামি ও অশ্লীলতায় বাধ্য হয়ে এখন অনেক কর্তৃপক্ষ এসব অনুষ্ঠান বন্ধেরও ঘোষণা দিয়েছে। বছর দুয়েক আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও র‍্যাগ-ডে বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে।

আমাদের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা এখন পাশ্চাত্যের ধাঁচে বড় হতে চায়। তারা তাদের মতো আধুনিক হতে চায়। নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। নিজেদের আত্মপরিচয় ভুলে নতুন এক পরিচয়ে পরিচিত হতে গর্ববোধ করে। প্রকাশ্যে এসব অশ্লীলতায় যোগদান করে। অথচ তারা ভুলে যায়, তাদের একজন রব আছেন। এসব নতুন পরিচয় একদিন শেষ হয়ে যাবে। শীঘ্রই এমন এক দিন আসছে, যেদিন আর কোনো পরিচয় কাজে আসবে না। যেদিন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কোনো সভ্যতাই টিকবে না। সেদিন টিকে থাকবে কেবল তারাই, যারা নিজেদেরকে র‍্যাগ-ডের হোলির রঙে নয়; বরং আল্লাহ তাআলার রঙে রাঙিয়েছিল। যারা একদিনের জন্য এসব গুনাহে জড়ায়নি। নিজের মর্যাদাকে বিলীন করে বন্ধুদের সাথে এসব অনুষ্ঠানে যায়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে চাপ দিয়েছে, জোর করেছে, এসব অনুষ্ঠানে থাকতেই হবে বলেছে, তারপরও তারা কোনো চাপকে ভয় পায়নি। এসব জোরজবরদস্তিকে তারা পরওয়া করেনি; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানকেই সামনে রেখেছিল। তাঁদের আদেশের সামনে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিক, তবুও তারা এসব গুনাহে এক মুহূর্তের জন্যও জড়ায়নি।

---

১৭৬. সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৪৬, ৩৫৯৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮৮০; জামে' তিরমিযী, হাদীস ২১৮৭

এখানে মনে রাখার বিষয় হলো, এসব অনুষ্ঠানের উৎপত্তি, ধারণা ও ধরন সবই পশ্চিমের ভোগবাদী, বিকৃত ও পচে যাওয়া সমাজব্যবস্থা থেকে হয়েছে। একজন মুসলমানের জন্য নিজের জীবনে কাফের মুশরিকদের রীতিনীতি অনুসরণ করার সুযোগ নেই।

পবিত্র কুরআনে রহমান তথা দয়াময় আল্লাহর বান্দাদের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

'এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।'[১৭৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহ. বলেন, 'মিথ্যা কাজে যোগদান না করার অর্থ হলো, গানবাজনা ও অশ্লীল অপকর্মে যোগদান না করা।'[১৭৮]

আমাদের সন্তানদের অভিভাবকরাও এখন গাফেল হয়ে গিয়েছে। সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কী করছে কোনো পরোয়া নেই; বরং অভিভাবকের উলটো কথা হলো, বছরে এই এক দিনেই তো ওরা একটু আনন্দ-ফুর্তি করবে, এতেও যদি বাধা দিই, তাহলে তো ওদের জীবনে আনন্দ বলতে কিছুই রইল না। এভাবেই মূলত সন্তানদের নিজ হাতে জাহান্নামের দিকে ঠেলে পাঠানো হয়। এসব সন্তানই কিয়ামতের দিন তাদের অভিভাবকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে নালিশ করবে যে, এরা জানা সত্ত্বেও আমাদের গুনাহের কাজ থেকে বাধা দেয়নি। আজকে যারা সন্তানকে গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে, কিয়ামতের দিন এসব সন্তানই তাদের বিরুদ্ধে বড় সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।

র‍্যাগ-ডে শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতেই নয়, সামাজিকভাবেও ঘৃণিত

আমাদের ছাত্রছাত্রী ভাইবোনদের এসব অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা চাই। বিশেষ করে আমার মাধ্যমে যদি একটি প্রতিষ্ঠানে বা একটি শ্রেণি কিংবা শাখায় এ ধরনের গুনাহের প্রচলন শুরু হয় তবে এর দায় আমাকেও নিতে হবে।

১৭৭. সূরা ফুরকান, (২৫) : ৭২
১৭৮. তাফসীরে বাগাভী, ৬/৯৮

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
>
> নিশ্চয়ই যারা চায় মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।[১৭৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো সুন্দর ধারা চালু করল পরে লোকেরা সে সুন্দর ধারা অনুযায়ী কাজ করল, সেই ব্যক্তি পরবর্তীদের আমলের সমান সওয়াব পাবে; যদিও পরবর্তীদের সওয়াবের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে মন্দ কোনো ধারা চালু করল, পরে লোকেরা সে মন্দ ধারা অনুযায়ী কাজ করল, সেই ব্যক্তির আমলনামায় পরবর্তীদের গুনাহে কোনো হ্রাস ঘটানো ছাড়াই তাদের গুনাহের দায় লেখা হবে।'[১৮০]

অতএব র‍্যাগ-ডে'র মতো গর্হিত গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা চাই।

র‍্যাগিং : কলেজ-ভার্সিটির নবাগতদের সাথে এক অমার্জনীয় অন্যায়

বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এমন অসংখ্য সংবাদ পাওয়া যায়, যেখানে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করছে যে, র‍্যাগিংয়ের নামে তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করেছে। এখানে শুধু একজন ভুক্তভোগীর বক্তব্য উল্লেখ করছি :

'আমি ও আমার এক বন্ধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম।

---

১৭৯. সূরা নূর, (২৪) : ১৯
১৮০. সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৭।

এটা ২০১৪ সালের কথা। ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমরা আমানত হলে উঠি। পরের দিন পরীক্ষা ছিল না। তাই দুই বন্ধু সেই রাতে প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত পড়াশোনা করি। ঘুমাতে যাব এমন সময় মনে হলো কে যেন বাইরে থেকে দরজা ঠেলছে। দরজা খুলে দেখলাম চার বড় ভাই। তারা আমাদের উলটাপালটা বিভিন্ন প্রশ্ন করল। ভয় পেয়ে গেলাম। একজন বলল, গান গাইতে জানিস? অন্য একজন বলল, নাচতে জানিস? আমি বলেছিলাম, গান গাইতে জানি না। সে জন্য আমাকে ১০ বার কান ধরে উঠবস করতে হয়েছিল। আমার বন্ধু নাচতে জানে না, এ জন্য তাকে শরীরের জামা কাপড় খুলে এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। পরের দিন সকালে আমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই আমার বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পালিয়ে যায়। সে গরিব ঘরের সন্তান ছিল। অনেক স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। কিন্তু র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হয়নি।'[১৮১]

র‍্যাগিংয়ের কারণে শুধু এই একটি ছেলেই পালিয়ে গেছে এমন নয়; বরং লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী এ রকম অনেক ছেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসেও পালিয়ে যায়। এটা কোনোভাবেই সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এটি পশ্চিমা আগ্রাসী সমাজব্যবস্থারই একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ।

সদ্য ভর্তি হওয়া নবীন ছাত্রদের প্রতি আগ্রাসী আচরণ ও মনীবের মতো ব্যবহার করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষাঙ্গনে যারা আসে সবাই ছাত্র। হ্যাঁ, বয়সে বড় হলে বড় হিসেবে সম্মান প্রাপ্য। তাই বলে জুনিয়রদের এভাবে জুলুম করা শরীয়ত ও সমাজ উভয় দৃষ্টিকোণেই অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۙ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا
يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۗ ﴿٤٣﴾

'জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো বেখবর মনে করো না। তিনি তো তাদের ওইদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন,

১৮১. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২ অক্টোবর ২০১৮

যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে। তারা মস্তক ওপরে তুলে ভীত-বিহ্বল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে।'[১৮২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জালেমদের ছাড় দিয়ে থাকেন। তবে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

'আর আপনার প্রতিপালক যখন কোন জালেম জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর।'[১৮৩]

এক হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

'হে আমার বান্দাগণ, আমি নিজের ওপর জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি আর তোমাদের মাঝেও একে হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অপরের প্রতি জুলুম করো না।'[১৮৪]

শিক্ষাঙ্গনে নবীন ছাত্ররা বিদেশ-বিভূঁইয়ে পরিবার ছেড়ে পড়ে থাকা লোকদের মতো নিঃসঙ্গ। এখানে তারা বড় ভাইদের সহমর্মিতা ও পথনির্দেশ চায়। তা না করে যদি উলটো র‍্যাগিং করা হয়, তাহলে এটা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের অভিভাবকগণ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন। তারা যদি নিজ সন্তান ও ছাত্রদের সাবধান করে দেন, খোঁজখবর রাখেন, তাহলে এই জুলুমের পরিমাণ অনেকটাই কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

---

১৮২. সূরা ইবরাহীম, (১৪) : ৪২, ৪৩

১৮৩. (সূরা হূদ, ১১ : ১০২) সহীহ বুখারী, ৪৬৮৬; সহীহ মুসলিম, ২৫৮৩।

১৮৪. সহীহ মুসলিম, ২৫৭৭।

বিধর্মীদের উৎসবে গমন : শুধু পর্দা নয়, ঈমানেরও ক্ষতি

সাম্প্রতিক সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে যে সমস্ত ফিতনা বেড়ে চলেছে, তার অন্যতম একটি হলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিংবা ধর্মীয় আচার-সংবলিত পারিবারিক অনুষ্ঠানে মুসলমান নারী-পুরুষের অবাধ অংশগ্রহণ। এতে পর্দার খেলাফ যেমন হয়, তেমনই শিরক ও কুফরের মজলিসে উপস্থিতি এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গকৃত খাবার ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে মারাত্মক ঈমানী ঝুঁকি তৈরি হয়।

এই আলোচনায় আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় উৎসবে একজন মুসলমানের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে কথা বলব।

১. বিধর্মীদের ধর্মীয় উৎসবের ব্যাপারে আমার মূল্যায়ন কী হবে?

এ ব্যাপারে হযরত উমর রাযি. বলেছেন,

اِجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللهِ فِي عِيدِهِمْ

‘তোমরা আল্লাহর দুশমনদের উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকো।’[১৮৫]

আরেকটি বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেছেন,

مَنْ بَنَى بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যারা অনারব (বিধর্মীদের) অঞ্চলে অবস্থান করবে এবং তাদের মতো নওরোজ ও মেহেরজান (নববর্ষ উদযাপন ইত্যাদি) করবে, আর তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এই অবস্থানে থেকেই মারা যাবে, তারা তাদেরই মতো। কিয়ামত দিবসে তাদের হাশর ওই লোকদের সাথেই হবে।’[১৮৬]

২. বিধর্মীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানানো বা যোগদান করা যাবে কি?

এই প্রশ্নে উত্তর হলো, না।

---

১৮৫. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ১৮৮৬২। সহীহ।
১৮৬. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ১৮৮৬৩। সহীহ।

এটা এ জন্য হারাম যে, কেউ এসব কাজ নিজে না করলেও বিধর্মীদের অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানানোর অর্থ হলো সে এসব শিরকী কাজকে স্বীকৃতি দিল। অথচ একজন প্রকৃত মুসলিম কখনো এসব কুফরী কাজকে স্বীকৃতি দিতে পারে না, কারণ আল্লাহ তাআলা এসব কাজকে স্বীকৃতি দেন না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অন্বেষণ করে, তা তার থেকে কখনোই গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে হবে ব্যর্থদের অন্তর্গত।'[১৮৭]

অন্যত্র বলেন,

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

'যদি তোমরা কুফরী করো, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি তাঁর বান্দাদের কাফের হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তা পছন্দ করেন। একের পাপের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত।'[১৮৮]

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'কাফেরদের উৎসবে তাদের সম্ভাষণ জানানো আলেমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হারাম। এটা কাউকে মদ খাওয়া বা খুন করা বা ব্যভিচার করায় সাধুবাদ

---

১৮৭. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ৮৫

১৮৮. সূরা যুমার, (৩৯) : ৭

জানানোর মতো। যাদের নিজের দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই, তারাই কেবল এ ধরনের ভুল করতে পারে। যে অন্যকে আল্লাহর অবাধ্যতা, বিদআত অথবা কুফরীতে জড়ানোর কারণে শুভেচ্ছা জানাল, সে যেন আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিল।'[১৮৯]

৩. বিধর্মীদের ধর্মীয় উৎসব ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

'এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।'[১৯০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম যাহহাক ও অধিকাংশ তাফসীর বিশারদের মতে এখানে 'শিরক' না করা বোঝানো হয়েছে।

মুজাহিদ রহ.-এর মতে মুশরিকদের উৎসবকে স্বীকৃতি না দেয়া।

কাতাদা রহ.-এর মতে বাতিলকে বাতিল কাজে সহযোগিতা না করা।

মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া রহ.-এর মতে অশ্লীল ও অপকর্মের সাক্ষ্য না দেয়া ইত্যাদি।[১৯১]

উমর রাযি. বলেন,

لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

'তোমরা অনারব (বিধর্মী দেশের) পরিভাষা শিখো না আর মুশরিকদের উৎসবের সময়ে তাদের উপাসনার স্থানগুলোতে প্রবেশ করো না। কেননা সেখানে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ বর্ষিত হয়।'[১৯২]

---

১৮৯. কিতাবু আহকামিয যিম্মাহ, ১/৪৪১

১৯০. সূরা ফুরকান, (২৫) : ৭২

১৯১. তাফসীরে বাগাভী, ৬/৯৮

১৯২. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ১৬০৯; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ১৮৮৬১। সহীহ। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে ২৬২৮১ নম্বরে হযরত আতা রহ. থেকেও কাছাকাছি বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

ফকীহদের মতে যেখানে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর উপাসনা করা হয় সেখানে প্রবেশ করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ।[১৯৩]

ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ রহ. বলেন, চার ইমামের মাযহাবের কিতাবাদি অনুসরণে এই ঐকমত্য পাওয়া যায় যে, 'মুসলমানের জন্য বিধর্মীদের উৎসবে উপস্থিত হওয়া জায়েয নয়। কেননা তারা মিথ্যা ও নিষিদ্ধ উৎসব করে থাকে। আর সৎ কর্মশীলগণের জন্য বদকারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা তাদের প্রতি স্বীকৃতি বা সন্তুষ্টি প্রকাশেরই নামান্তর, যা আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাবের আশঙ্কাকে প্রবল করে।'[১৯৪]

এ ছাড়াও হোলিসহ এসব অনুষ্ঠানে প্রচুর ফাহেশা কাজ হয়ে থাকে, যা একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাই প্রতিটি মুসলিম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব হলো, এ ধরনের পরিবেশ থেকে নিজেকে হেফাজত করা। নিজের ঈমান ও আখলাককে হেফাজত করা।

মোবাইলে ছবি তোলা নষ্ট করে পর্দানশীনের পর্দা[১৯৫]

প্রযুক্তি মানুষের উপকার করে, প্রযুক্তি মানুষের ক্ষতি করে। যেমন আগুন মানুষের উপকার করে, আগুন মানুষের ক্ষতিও করে। এর উপকার-অপকার নির্ভর করে আমাদের ব্যবহারের ওপর। আমরা ইচ্ছে করলে এগুলোকে কল্যাণে ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারি। আর আমরা যদি এগুলোর ব্যবহার করি মন্দ পথে, তাহলে তা অকল্যাণ বয়ে আনবে বৈকি। মোবাইলও তেমন একটি যন্ত্র।

---

১৯৩. রাদ্দুল মুহতার, ১/৩৮০

১৯৪. আহকামুয যিম্মাহ, ২/৩৪২। ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর ইবারত...

وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي كُتُبِهِمْ، فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللهِ بْنُ [الْحَسَنِ] بْنِ مَنْصُورٍ الطَّبَرِيُّ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْضُرُوا أَعْيَادَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى مُنْكَرٍ وَزُورٍ، وَإِذَا خَالَطَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ أَهْلَ الْمُنْكَرِ بِغَيْرِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ كَانُوا كَالرَّاضِينَ بِهِ الْمُؤْثِرِينَ لَهُ، فَنَخْشَى مِنْ نُزُولِ سُخْطِ اللهِ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ فَيَعُمُّ الْجَمِيعَ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُخْطِهِ

১৯৫. খাদিজা বিনতে যায়নুল আবিদীন, মাসিক আলকাউসার। ঈষৎ পরিবর্তিত।

আগের দিনে যারা দ্বীনদার তাদের জীবনে হয়তো একটা-দুইটা প্রয়োজনীয় ছবি থাকত। কারও হয়তো জীবনে একটি ছবিও থাকত না। পর্দানশীন নারীদের ছবি তো দূরের কথা, তাদের ছায়াও কেউ দেখত না। তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের ছবি তো তুলতেনই-না। এ ধরনের পরিবেশ থেকেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতেন। এটা বেশি দিন আগের কথা নয়।

মোবাইলে যেদিন থেকে ক্যামেরা যুক্ত হলো এবং ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল সহজলভ্য হতে থাকল, তখন থেকেই এ বিষয়ে শিথিলতা দেখা দিল। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ছবি তোলা শুরু হলো। দ্বীনদার-সাধারণ সকলের মাঝেই এ প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম প্রথম দ্বীনদার শ্রেণি একটু বিরত থাকল। (আলহামদুলিল্লাহ, এখনো এমন দ্বীনদার মানুষের সংখ্যা একেবারে কম নয়, যারা ছবির ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক।) তারপর ধীরে ধীরে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল যত ব্যাপক হলো, কিছু দ্বীনদার মানুষের মাঝেও এ বিষয়ে শিথিলতা তত বাড়তে থাকল।

মোবাইলে ছবি তোলা জায়েয-নাজায়েয প্রসঙ্গে আমি যেতে চাই না। আমি শুধু দ্বীনদার শ্রেণি, বিশেষ করে দ্বীনদার পর্দানশীন নারীদের এর ক্ষতির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

১. স্বামীর মোবাইলে স্ত্রীর ছবি

অনেকেই মোবাইলে নিজের স্ত্রীর ছবি তুলে রাখেন। অন্যদের মতো তা হয়তো মোবাইলের স্ক্রিনে দিয়ে রাখেন না; কিন্তু ছবির ফোল্ডারে তো তা থাকেই। ফলে নিজের বন্ধু বা ভাই যখন মোবাইল ধরে তখন সে ছবি তারা দেখে ফেলে। অথচ এই নারী পর্দানশীন। কখনো পরপুরুষের সামনে নিজের চেহারা খোলেন না। পর্দার অন্যান্য অনুষঙ্গও যথাযথ মেনে চলেন। কিন্তু এই একটি শিথিলতার জন্য পর্দার একটি বড় রোকন নষ্ট হয়। সুতরাং এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সতর্ক হতে হবে এবং পরস্পর সহযোগিতা করতে হবে। একজনের মাঝে শিথিলতা দেখা দিলে অপরজন তা শুধরে দেবে ও সতর্ক করবে।

২. বিবাহের সময় ছবি তোলা

আগের দিনে যারা দ্বীনদার নন, তারা বিবাহ-অনুষ্ঠানে ক্যামেরা ভাড়া করে

আনত। আর যারা দ্বীনদার তারা এ সকল অনুষ্ঠানে বা সাধারণ অবস্থায় ছবি তোলার চিন্তাই করত না। কারও কাছে ক্যামেরা থাকলেও ছবি তুলতে সাহস করত না, বা তুলতে গেলে যার ছবি তোলা হচ্ছে সে নিজেই বাধা দিত। কেউ কোনোভাবে তুললে তাও নষ্ট করে ফেলা হতো। কিন্তু মোবাইল ব্যাপক হওয়াতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যারা দ্বীনদার তাদেরও অনেকে ছবি তোলাকে একেবারে স্বাভাবিক মনে করছেন। তবে এখনো আল্লাহর অনেক বান্দা আছেন যারা এ বিষয়ে পূর্ণ সতর্ক থাকছেন।

বিবাহের অনুষ্ঠানে কখনো বর নিজেই নিজের মোবাইলে বউয়ের ছবি তুলতে থাকে। এটা কোনো কোনো দ্বীনদার লোকের মাঝেও দেখা যায়। আর কখনো বর বা কনের পরিবারের লোকজন বা বউ দেখতে আসা মেহমান তাদের নিজ নিজ মোবাইলে ছবি তুলতে থাকে। এমনকি পর্দানশীন পরিবারে যেখানে কনের কাছে কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ পৌঁছতে পারে না, সেখানেও মেয়েরা ছবি তোলার কারণে অন্যান্য পুরুষ এই পর্দানশীন কনেকে দেখে ফেলে। আর যেহেতু কোনো পুরুষ ছবি তুলছে না, তাই কনেও নিষেধ করে না বা অন্য কেউ বাধা দেয় না। ফলে কী হয়? পর্দা নষ্ট হয় এবং পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলার পরেও মেয়েটিকে সবাই দেখে ফেলে।

অনেক সময় পর্দানশীন মেয়েটি না চাইলেও তার করার কিছু থাকে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সবার আগে সতর্ক হতে হবে মেয়ের পরিবার ও স্বামীকে। সাথে সাথে স্ত্রীকেও সাবধান থাকতে হবে যে, কেউ যেন তার ছবি তুলতে না পারে। প্রয়োজনে মুরব্বীদের সহায়তা নিতে হবে। আর আমাদেরও মানসিকতার সংশোধন করতে হবে, নতুন বউ দেখার প্রবণতা ছাড়তে হবে। তাহলে আমাদের ও নতুন বউয়ের সবারই আল্লাহর হুকুম মানা সহজ হবে এবং আমরা হব দ্বীনদারীতে পরস্পরের সহযোগী।

৩. নতুন পোশাক পরে ছবি তোলা

অনেক সময় মেয়েরা নতুন পোশাকের আনন্দে মোবাইলে ছবি তোলে। পর্ব-উৎসবে বা এমনি কেউ হয়তো নতুন জামা পরেছে, তো আত্মীয়স্বজনের কেউ বলেন, দাঁড়াও তো তোমার একটা ছবি তুলি বা পাশের বাসার ভাবি বলছেন, বাহ! ভাবি, আপনাকে তো খুব সুন্দর লাগছে! দাঁড়ান একটা ছবি তুলি। এভাবে

আনন্দের আবহে ছবি তোলা হয়ে যায়। এরপর কখনো কখনো তা গায়রে মাহরাম পুরুষেরও চোখে পড়ে আর পর্দা নষ্ট হয়। এ ছাড়া আরও কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে ছবি তোলার বিষয়ে বা পর্দার অন্যান্য বিষয়ে শিথিলতা হয়ে যায়। সতর্ক হলে আমরা নিজেরা তা থেকে বাঁচার পথ বের করতে পারব। আল্লাহ আমাদের তাকওয়া ও খোদাভীতি দান করুন এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার তাওফীক দান করুন। দ্বীনদারীতে পরস্পর সহযোগিতার মানসিকতা দান করুন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

'সৎকাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ কাজ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।'[১৯৬]

আরেকটা ব্যাপারে বলতেও অস্বস্তি লাগে, কিন্তু অপারগ হয়ে বলতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষ, এমনকি কোনো কোনো দ্বীনদার ব্যক্তিও নিজ স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন অন্তরঙ্গ সময়ের ছবি-ভিডিও নিজ ফোনে রাখেন। হয়তো আলাদা ফোল্ডারে বা লক করে রাখেন। কিন্তু রাখেন। এর ভয়াবহতার কথা চিন্তাও করা যায় না। কারণ, আমি যতই ভাবি ডিলিট করে দেব, নানা পরিস্থিতিতে এটা সম্ভব নাও হতে পারে। অনেক সময় মোবাইল মেরামত করতে দিতে হয়। সেখান থেকে ছবি ছড়িয়ে যায়। এমনকি ডিলিট করা ছবি ফিরিয়ে আনা এখন খুবই সহজ। আমার ফোন চুরি হতে পারে। অন্য হাতে যাওয়া ফোন থেকে আমার স্ত্রীর নগ্ন বা বেপর্দা ছবি সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। এখন টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকসহ নানা জায়গায় এসব ছবি আদান-প্রদানের জঘন্য গ্রুপ দেখা যাচ্ছে।

সামান্য মজা করতে গিয়ে একজন পর্দানশীন নারীর ছবি ভাইরাল হওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে!

---

১৯৬. সূরা মায়িদা, (৫) : ২

বৃদ্ধ বয়সে পর্দা

বেগানা নারীর সাথে পর্দা করা ফরজ। বয়স্কা মহিলার সাথেও পরপুরুষের পর্দা করা জরুরি। তবে অতিশয় বৃদ্ধা মহিলা, চরম বার্ধক্যের কারণে যারা বিয়ের উপযুক্ত থাকে না, এ ধরনের বৃদ্ধা মহিলার ক্ষেত্রে শুধু চেহারার পর্দার ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। এ বয়সেও পরপুরুষের সামনে চুল ইত্যাদি পরিপূর্ণ ঢেকে রাখতে হবে। অবশ্য এগুলো ঢেকে শুধু চেহারা খোলা রাখা বৈধ।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'আর বয়স্কা বৃদ্ধা নারীগণ যাদের বিবাহের কোনো আশা নেই, তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের (অতিরিক্ত) বস্ত্র খুলে রাখে, তাহলে তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।'[১৯৭]

উল্লেখ্য, অতিশয় বৃদ্ধা মহিলার সাথে চেহারার পর্দার বিধানের উক্ত শিথিলতা নির্দিষ্ট কোনো বয়সের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বৃদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি চেহারার আকর্ষণ এবং গড়ন ভেঙে পড়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তাই কোনো মহিলার বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হয়ে গেলেই তার সাথে পরপুরুষের দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়েয, এমন কথা ব্যাপকভাবে বলা ঠিক নয়; বরং ৬৫ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও কোনো মহিলার শারীরিক গঠন ও চেহারার আকর্ষণ যদি বাকি থাকে, তাহলেও ওই মহিলার চেহারার পর্দার হুকুম বহাল থাকবে। তার ক্ষেত্রে উক্ত ছাড় প্রযোজ্য হবে না।[১৯৮]

সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ায় পৌঁছার কারণে এখন আমরা বৃদ্ধ কর্তৃক কিশোরী বা শিশু ধর্ষণের সংবাদ পাই, অথবা যুবক কর্তৃক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের সংবাদ পাই।

---

১৯৭. সূরা নূর, (২৪) : ৬০

১৯৮. আহকামুল কুরআন, জাসসাস, ৩/৩৩৪; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/৪৮৬-৭; তাফসীরে কুরতুবী, ১২/২০৩

তাই ফিতনাময় এ যুগে যতটা পারা যায় গাইরে মাহরাম থেকে পর্দা করে থাকাই উত্তম।

এমনইভাবে ছোট মেয়েদেরও গাইরে মাহরাম বৃদ্ধ লোকদের কাছে পাঠানোর ব্যাপারে সাবধান থাকা চাই। অপরিচিত কারও সাথে নিজের ছোট মেয়ে বা বোনকে পাঠানো উচিত না। তার সাথে এক রুমে একাকী থাকতে দেয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না।

প্রবাসীর স্ত্রী, পরকীয়া, বিচ্ছেদ : কিছু কথা, আফসোস

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ একটু স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন খোঁজে। যে জীবনে থাকবে না কোনো হতাশা, থাকবে না না-পাওয়ার কোনো আফসোস। চাইলেই যেকোনো কিছু পাওয়া যাবে। আর এর জন্য প্রথমেই দরকার প্রচুর অর্থ। অর্থহীন জীবন আসলেই 'অর্থহীন'। মানুষ তো দুনিয়ায় বেশি কিছু চায় না, থাকার জন্য শুধু একটি বাড়ি, চলার জন্য একটি গাড়ি, আর স্থায়ী আয়ের কোনো ব্যবস্থা। এই ব্যস। এর চেয়ে বেশি কিছু না।

ওপরের কথাগুলো আমাদের অনেক ভাইয়ের দিলের মধ্যে গেঁথে বসে আছে। ফলে তারা বিয়ের পরপরই সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে রেখে বিদেশে পাড়ি জমান অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে। বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন প্রবাসে। অথচ একজন নারীর যেমন জৈবিক-মানবিক চাহিদা রয়েছে, একজন পুরুষেরও তদ্রূপ রয়েছে। বিয়ের পরপরই স্ত্রীর থেকে স্বামীর দূরে চলে যাওয়ার ফলে সমাজে নানান অসংগতির সৃষ্টি হচ্ছে। পরকীয়া, ব্যভিচারসহ নানান অপরাধ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এদিকে নিজের স্ত্রী অনলাইন বা অফলাইনে বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে, ওদিকে স্বামীও স্ত্রীকে কাছে না পাওয়ায় অনেক হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ছে। উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই। সমাজের পরতে পরতে এর লাখ লাখ তাজা উদাহরণ রয়েছে।

বিয়ের আগে যারা খারাপ ছিল বিয়ের পর তারাই এসব করে, এমনটা নয়। অনেক দ্বীনদার নারী-পুরুষও এমন কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। এমনটাই তো হওয়ার কথা। একজন নারী কতদিন স্বামী ব্যতীত থাকতে পারবেন? একজন স্বামী কতদিন তার স্ত্রীর নৈকট্য ব্যতীত থাকতে পারবেন? অথচ সেখানে বছরের পর বছর দূরে থাকা হচ্ছে। কেউ কেউ ২০-৩০ বছর পর্যন্ত দূরে থাকছেন।

একজন মানুষের জৈবিক চাহিদা থাকে। কোনো-না-কোনোভাবে সে সেটা পূরণ করেই। বিয়ের পর যেসব স্বামী-স্ত্রী এত বছর ধরে দূরে থাকে, তারাও তো কোনো-না-কোনোভাবে তাদের সেই চাহিদা পূরণ করেছে।

এভাবে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে রেখে বিদেশ গমনের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা জেনে নেয়া যাক।

প্রথমত, স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করা স্বামীর অন্যতম একটি কর্তব্য। ভাত-কাপড়ের পাশাপাশি এটিও তার মৌলিক অধিকার। আর সামাজিক শৃঙ্খলার জন্যও এটি অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিয়ের পর বিদেশ গমনকারীরা স্ত্রীর এ অধিকার পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত, ব্যাপারটা অনেকাংশেই নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর চাহিদার ওপর। স্বামী ছাড়া একজন স্ত্রী কতদিন ধৈর্যধারণ করতে পারেন, এটা তার সহজাত ব্যাপার। তারপরও এ ব্যাপারে ইসলাম সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ফরমান স্মরণীয়। একবার তিনি এক বিরহিণী নারীকে এই কবিতা পাঠ করতে শুনলেন :

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهْ ... وَطَالَ عَلَيَّ أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهْ

فَوَاللهِ لَوْلَا خَشْيَةُ اللهِ وَحْدَهْ ... لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

বীভৎস এ রজনি হয়েছে আরও প্রলম্বিত
নাহি আজ প্রেমাস্পদ মোর আকাঙ্ক্ষিত।
আল্লাহর ভয় যদি না থাকত এ অন্তরে,
পালঙ্ক মোর কলঙ্কিত হতো প্রণয়ের ভারে।

এরপর তিনি তার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েলোক স্বামী ছাড়া সর্বোচ্চ কতদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারে?'

হাফসা রাযি. বললেন, 'চার মাস অথবা ছয় মাস।'

তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'মুজাহিদদের মধ্যে কাউকে আমি এ সময়ের অধিক যুদ্ধে আটকে রাখব না।'

তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে সব সেনাপতিকে লিখে পাঠালেন, উপরিউক্ত সময়ের অধিক কোনো বিবাহিত মুজাহিদই যেন তার স্ত্রী-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে।[১৯৯]

এর থেকে উত্তরণের উপায় :

প্রথম কথা হচ্ছে, এভাবে দুনিয়া উপার্জনের জন্য স্ত্রী-পরিজন রেখে বিদেশে যাওয়া আবশ্যক নয়। এই কথাটা আগে মাথায় আনতে হবে। অসংখ্য ঘটনা এমন রয়েছে যে, জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশে কাটিয়েছে। দেশে কাড়ি কাড়ি টাকা পাঠিয়েছে। বিদেশে বসে স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসা, আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু জীবনের শেষ-মুহূর্তে এসে তারা স্ত্রী-সন্তানও হারিয়েছে। বাবা-মায়ের আদর-সোহাগও হারিয়েছে। দিনশেষে তাদের জীবনে আফসোস ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকেনি। একটু ভেবে দেখুন, এই জীবনের কী লাভ! আপনি কি এমন জীবনই চেয়েছিলেন? আপনি প্রচুর অর্থকড়ি উপার্জন করবেন, কিন্তু দিনশেষে সবকিছুই আপনি খুইয়ে ফেলবেন, এটাই কি আপনি আশা করছিলেন?

দ্বিতীয়ত, যদি বিদেশে যেতেই হয়, তাহলে বিয়ের আগেই যাওয়া উচিত। এরপর বিয়ের আগেই এতটুকু প্রস্তুতি সেরে নেয়া উচিত, যাতে বিয়ের পর স্ত্রীকে নিজের সাথে নেয়া যায়। যদি এটা সম্ভব না হয়, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফিরে আসা আবশ্যক। ভাবছেন যে, তাহলে পরে কী খাবেন? কীভাবে চলবেন? কীভাবে বাড়ি বানাবেন? অথচ আল্লাহ্ তাআলা আপনার জন্মের বহু বছর আগেই আপনার রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই দেশে বসেই হালালভাবে উপার্জনের ফিকির করুন। বিদেশে বসে মাস শেষে লাখ টাকা উপার্জন করে স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবার ভালোবাসা হারানোর চেয়ে দেশে বসে দশ হাজার টাকা উপার্জন করে সবাইকে নিয়ে সুখে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এর জন্য প্রথমে নিজের ভেতর থেকে দুনিয়ার লোভ-লালসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা দূর করতে হবে। দুনিয়ালোভী ব্যক্তি দুনিয়াও হারায়, আখিরাতও হারায়।

---

১৯৯. বাইহাকী, সুনানুল কুবরা, ১৭৮৫০; সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর, ৬৪৬৩; ইবনে কাসীর, ১/৬০৪

অতিরিক্ত লোভের কারণে সে দুনিয়ার কিছুই পায় না। যা পাওয়ার কথা সেটাও হারিয়ে ফেলে। ওদিক দিয়ে আখিরাত তো কবেই খুইয়ে ফেলেছে।

অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ অনেক ব্যক্তি স্ত্রীকে রেখে বিদেশে যেতে না চাইলেও পরিবারের লোকদের চাপে যেতে বাধ্য হয়। পরিবার থেকে চাপ দেয়া হয়, এই সামান্য বেতনে কী করবি? সামনে কীভাবে চলবি? যা, কয়েকটা বছর বিদেশে থেকে আয়। দেশের অবস্থা ভালো না। এরচেয়ে বিদেশে যাওয়াই ভালো। এভাবে বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করে সন্তানকে বিদেশে পাঠানো হয়। কিন্তু সন্তান যখন কয়েক বছর পর দেশে ফিরে আসতে চায়, তখন আবারও বাধা দেয়া হয় এই বলে যে, এখন এসে কী করবি? এখনো তো তোর ধারের টাকাই শোধ হয়নি! আর দেশে একটা বাড়ি করার আগে এসে কী করবি? কী খাবি? অমুক পাড়ার অমুকের ছেলে বিদেশে গিয়ে দেশে বড় একটা বাড়িও বানিয়ে ফেলেছে। তুই কী করলি? এভাবে মানসিক চাপ দেয়া হয় ছেলেকে।

এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রধানতম উপায় হচ্ছে, নিজেদের ভেতর দ্বীনের বুঝ আনা। অল্পতুষ্টিতে অভ্যস্ত হওয়া। দুনিয়ার লোভ ত্যাগ করা। তাহলে হাজারও সমস্যা থেকে এমনিতেই বাঁচা যাবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনহীন পরিবেশে কীভাবে পর্দা করতে হবে

অসংখ্য বোনের প্রশ্ন এই একটাই, বাসায় পর্দার পরিবেশ নেই, তারা পর্দা করতে দেবে না, এখন কীভাবে পর্দা করব? এমন অজস্র প্রশ্নে আমরা জর্জরিত। অনলাইনে হুশআপে নেয়া একটি জড়িপে আমরা অনেক ঘটনা পেয়েছি, যেখানে বোনেরা পর্দা করার জন্য হাঁসফাঁস করছে; কিন্তু পর্দা করতে পারছে না। নিজের বাবা-মায়ের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। নিজের স্বামীর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। নিজের পরিবার-পরিজন, সমাজ সবাই তাকে বাধা দিচ্ছে পর্দা করা থেকে।

আফসোস সেসব বোনের জন্য, যারা নিজেদের বোরকাকে বানিয়েছে ফ্যাশনের মাধ্যম। অথচ এই বোরকাটাই পড়ার জন্য কত বোন দিনের পর দিন নিজের পরিবারের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কত বোন এই পর্দাটুকু করার কারণেই অসংখ্যবার জুলুমের শিকার হচ্ছে। কারও কারও নামে মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে। আমরা এক বোনের ঘটনা এমন পেয়েছি, দ্বীনের বুঝ আসার পর তিনি পর্দা করা

শুরু করেন, নিয়মিত নামাজ আদায় শুরু করেন। বাসায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রাতে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ পড়তেন। কিন্তু তার বাসায় দ্বীনী পরিবেশ ছিল না। ফলে পরিবারের লোকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। এমনকি একদিন তার জন্মদাতা বাবা তাকে গরম খুনতি দিয়ে প্রহার করেন শুধু এই অভিযোগে যে, তিনি বোরকা পরেন কেন? তাকে নাকি জঙ্গিদের মতো লাগে!

আরেক বোন বাসায় লুকিয়ে লুকিয়ে নামাজ পড়তেন, একদিন তার দরজার আড়াল থেকে দেখে ফেললে তাকে ঝাড়ু দিয়ে মারাত্মকভাবে প্রহার করা হয়। একপর্যায়ে রক্তাক্ত হয়ে গেলে তাকে পাশের হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আরও আশ্চর্য ঘটনা শুনুন, এক বোন দীর্ঘদিন বাসায় নামাজ পড়তেন, তিলাওয়াত করতেন। বাসা থেকে বের হতেন বোরকা ছাড়া। পরে কোনো বান্ধবীর বাসায় গিয়ে বোরকা পরতেন। একদিন তার মা এসব জেনে ফেলায় তার বোরকা আগুনে পুড়ে ফেলেন। কুরআন পড়া অবস্থায় তার দিকে ঝাড়ু নিক্ষেপ করেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই, আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে এই অবস্থা অনেক আগ থেকেই চলে আসছে। কারণ আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম হলেও আমাদের দেশে প্রকৃত মুসলিমের সংখ্যা খুবই কম।

এসব নির্যাতনের ঘটনা লিখতে গেলে বইয়ের কলেবর বড় হয়ে যাবে। তাই সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করলাম।

এসব বোনের জন্য করণীয় হলো, **প্রথমত**, তারা দ্বীন-ঈমানের ওপর অটল থাকবেন। যত ঝড়ঝাপটা আসুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই দ্বীন-ঈমান থেকে বিন্দুমাত্র সরা যাবেন না। এ জন্য বেশি বেশি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের জীবনী পাঠ করতে হবে। কারণ দ্বীনের জন্য তাদের চেয়ে বেশি কষ্ট-মুজাহাদা আর কেউই করেনি।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু ফরজ ইবাদতগুলোতে মনোযোগ দিতে হবে। সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায়েরও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। নফল ইবাদত ছুটে গেলেও সমস্যা নেই। ফরজ ইবাদত যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে জন্য চাইলে নফল ইবাদত ছাড়তে পারবে।

ফরজ নামাজের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। সুযোগ বুঝে নামাজগুলো আদায় করতে হবে। যেমন : ভোরবেলা সাধারণত দেখা যাবে বাসার সবাই ঘুমিয়েই কাটায়,

তাই তাদের ওঠার আগেই চুপেচুপে ফজরের নামাজ সারতে হবে। দুপুরবেলা বাসায় সাধারণত শুধু মা, বোন থাকে। তারা যখন গোসল করতে যাবে বা রান্নায় ব্যস্ত থাকবে, তখন দ্রুত জোহরের নামাজ সারতে হবে। আসরের সময়েও ঘরের লোকজন সাধারণত ঘুমিয়ে কাটায়। তাদের ওঠার আগেই আসরের নামাজ সারতে হবে। মাগরিবের সময় কোনো বান্ধবীর বাসায় গিয়ে নামাজ পড়া যায়। অথবা মাগরিব পড়ার জন্য অন্য কোনো বাসায় টিউশনি ঠিক করা। যাতে সেখানে গিয়ে মাগরিব পড়া যায়। এশার নামাজের জন্য সমস্যা হওয়ার কথা না, বাসায় লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন এশার নামাজ আদায় করা যাবে। অনেক রাত করে এশার নামাজ পড়লেও সমস্যা নেই।

তৃতীয়ত, এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন আর ইবাদত করা যাবে! তাই আবশ্যক হলো, বাসায় দ্বীনী পরিবেশ কায়েমের ফিকির করা। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর এটাই একজন মেয়ের জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয়।

ঘাবড়ানোর কিছু নেই, চেষ্টা আর দুআ জারি রাখলে এটাও হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। দাওয়াতের কারণে কত বড় বড় কাফের ঈমান আনল, সেখানে একজন আমলহীন মুসলিমকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনা কঠিন কিছু নয়। শুধু দরকার হিম্মত, অনবরত চেষ্টা আর দুআ।

এর জন্য প্রথমে উত্তম আখলাকের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে। শরীয়ত অনুমোদিত ক্ষেত্রগুলোতে বাবা-মায়ের পুরোপুরি অনুগত হয়ে যান। পাশাপাশি বিভিন্নভাবে তাদের খেদমত করার চেষ্টা করতে থাকবেন। মোটকথা, আপনার জীবনে নববী আখলাককে ধারণ করার এক প্রাণান্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকুন। প্রথম কিছুদিন এটাই হবে প্রাথমিক দাওয়াত। আপনাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে ফেলুন, যেন সবাই আপনাকে নিয়ে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সবাই যেন আপনাকে নিয়ে আলাদাভাবে ইতিবাচক ভাবতে বাধ্য হয়। এ পর্যায়ে মোটামুটি সফলতা অর্জনের পর দেখুন, বাসায় কার অন্তর সবচেয়ে নরম। কার সাথে কথা বললে তিনি কথা রাখেন। তিনি হতে পারেন মা, অথবা বড় বোন, অথবা ভাই, অথবা বাবা। প্রথমে তাকে টার্গেট করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু দুর্বল মুহূর্ত থাকে, যখন সে খুব নরম থাকে, অমায়িক হয়ে যায়; যেমন বিভিন্ন বিপদাপদ বা কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুতে। তখন তাকে যা-ই বলা হয়, সে সেটাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। যেমন ধরুন, আপনার মা অথবা বাবার

মাথাব্যথা করছে। আপনি এই সুযোগটাকে কাজে লাগান। তাদের মাথার কাছে বসে খেদমত করতে করতে ধীরে ধীরে কথা বলা শুরু করুন। ধীরে ধীরে পর্দার গুরুত্ব বোঝান। তাদের বয়স হয়ে যাচ্ছে, আর কতকাল পর্দা ছাড়া থাকবেন, মৃত্যু আসতে পারে যেকোনো সময়ই। মৃত্যুর আগেই যদি পর্দা শুরু না করেন, তাহলে মৃত্যুর পরের ভয়াবহতার ব্যাপারে তাদের বলুন। এক দিনেই সব হয়ে যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন একাগ্রতার সাথে টানা মেহনত।

দাওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রথমে নামাজ-রোযা সহ একেবারে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজবোধ্য বিষয়গুলোর দাওয়াত দিন। শুরুতেই এমন কোনো বিষয়ে দাওয়াত না দেওয়াই ভালো, যা বোঝা সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টকর।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা জরুরি, অনেক বোনের অভিভাবক উলটো অভিযোগ করেন যে, মেয়ে আগেই ভালো ছিল। ঘরের কাজকর্ম করত। আমাদের সেবা করত। কিন্তু এখন এসব কিছুই করে না। রান্নাঘরেও আসে না। আমাদের সেবা করে না। সারাদিন ঘরের মধ্যে দরজা লাগিয়ে বসে থাকে আর কী যেন করে। পরিবারের এমন অভিযোগ মূলত আপনার জন্যই ক্ষতিকর। তাই প্রথমেই আমরা বলেছি, দ্বীনের পথে ফেরার পর প্রথম দিকে ফরজ ইবাদতে গুরুত্ব দিতে হবে, নফল ইবাদত না করতে পারলেও সমস্যা নেই। আপাতত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বাসার কাজে কোনো কমতি তো করা যাবেই না; বরং সম্ভব হলে আগের চেয়েও বেশি কাজ করতে হবে। আগের চেয়ে বাবা-মায়ের বেশি সেবা করতে হবে। যেন তারা আপনাকে ভালো চোখে দেখেন। তারা যেন এই অভিযোগের সুযোগ না পান যে, মেয়ে তো আগেই ভালো ছিল। আগে সেবা করত। কাজকর্ম করত। এখন কিছুই করে না; বরং এখন যেন তারা আরও ভাবেন যে, মেয়ে তো আগের চেয়েও ভালো হয়ে গিয়েছে। আগের চেয়েও বেশি পড়ালেখা করছে। তাহলে দ্বীনের পথে আসলেই বোধহয় মেয়েরা বেশি ভালো হয়ে যায়। দ্বীনদারী মনে হয় নারীদের আরও ভালো পথেই নিয়ে আসে।

পরিবারের লোকদের অন্তরে এমন ধারণা নিয়ে আসা আপনার জন্য আবশ্যক। যদি আপনি এই ধারণা তাদের অন্তরে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে আপনি সফল। আপনার দ্বীনের পথে চলার অনেক বাধা-বিপত্তি এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

আবার অনেক পরিবার থেকে অভিযোগ পাওয়া যায় যে, মেয়ে এখন আমাদের

সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমাদের কাফের-ফাসেক বলে ফতওয়া দেয়। আমাদের সাথে একসঙ্গে খেতে চায় না। আমাদেরকে বেনামাজী বলে দূরে সরে যায়। এটাও অনুচিত কাজ। এতে বরং আপনার পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ আপনার সামনে অপার সম্ভাবনা রয়েছে যে, আপনি দাওয়াত দিয়ে পুরো পরিবারকেই দ্বীনের পথে নিয়ে আসবেন। অথচ আপনি শুরুতেই তা বন্ধ করে নিজের ক্ষতিই করলেন।

একদিন রাতে রুমের দরজা খুলে তাহাজ্জুদ পড়ে দুআ শুরু করুন। কান্নার আওয়াজে যেন মায়ের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি এসে যখন আপনাকে কান্নারত অবস্থায় দেখবেন, তখন তার মন এমনিতেই নরম হয়ে যাবে। এই সুযোগে আপনি তাকে দাওয়াত দিতে পারেন।

ঘরে দ্বীনী কিছু বই রাখুন। নিজে পড়ুন। অনর্থক কাজে ব্যস্ত না থেকে আমলে সময় কাটান। এ-সংক্রান্ত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অনেক ভাই বা বোন দ্বীনের পথে ফিরে আসলেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকেন। ফলে তার আমলের প্রভাব তার ঘরেই পড়ে না। এতে তারা দাওয়াতও গ্রহণ করেন না। উলটো তারা এ নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন যে, ও আসছে দাওয়াত দিতে, ও নিজেই তো এখনো মোবাইলে মুভি দেখে, গান শোনে। এখন নামাজ পড়লে কী হবে, আগের মতোই তো অমুক মেয়ের সাথে বা অমুক ছেলের সাথে যোগাযোগ রাখে। এসব অভিযোগ অত্যন্ত মারাত্মক। আপনি পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের পথে ফিরে না আসলে, প্রকাশ্য গুনাহগুলো ত্যাগ না করলে পরিবারের লোকদের দাওয়াত দিতে পারবেন না। তারা কখনোই আপনার এই দাওয়াত গ্রহণ করবে না।

মোটকথা, পরিবার বা সমাজে দাওয়াত দিতে চাইলে বাহ্যিকভাবে তাদের চোখে ভালো হতে হবে। পূর্বের প্রকাশ্য গুনাহগুলো অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। তারা যেন আপনার আমূল পরিবর্তন দেখতে পান। বাহ্যিক চরিত্র, আমানতদারী, সততা, দ্বীনদারী, চালচলন, আখলাক, কথাবার্তা, মোদ্দাকথা সব দিক থেকেই তাদের কাছে আপনার পরিবর্তন ফুটে উঠতে হবে। তখন আপনি সহজেই তাদের দাওয়াত দিতে পারবেন। তারাও আপনার এই পরিবর্তন দেখে নিজে থেকেই প্রভাবিত হবেন।

চতুর্থ : ঘরে দ্বীনী পরিবেশ কায়েমের অন্যতম পরীক্ষিত উপায় হচ্ছে তালীম চালু করা। কিতাব নির্ধারণের ব্যাপারে স্থানীয় কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করা যায়। তবে ঘরে তালীমের জন্য সবচেয়ে উপকারী কিতাব হচ্ছে 'ফাযায়েলে আমাল'। কেউ কেউ অজান্তে বা কারও প্ররোচণায় এই কিতাব নিয়ে অভিযোগ করেন, এটাকে পাঠের অযোগ্য মনে করেন; কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, যুগের পর যুগ ধরে অসংখ্য পরিবারে দ্বীনী পরিবেশ ফিরে এসেছে এই কিতাবের তালীমের মাধ্যমে। অসংখ্য নারী দ্বীনের পথে ফিরে এসেছেন এই কিতাব পড়ে। এর কারগুজারী লিখতে গেলে আরেকটি স্বতন্ত্র বই হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, আনন্দের বিষয় হলো, এই কিতাবের নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে চলিত ভাষায় অনুবাদসহ প্রত্যেক হাদীস ও বর্ণনার সূত্র ও হুকুম যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।[২০০]

প্রথম দিকে কিতাবটি ঘরে প্রকাশ্য কোনো জায়গায় রেখে দিতে হবে। এরপর সুযোগ করে প্রতিদিন যেকোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে অল্প সময় উঁচুস্বরে কিতাবটি পড়তে হবে। এটা পাঁচ মিনিটও হতে পারে, ১০ মিনিটও হতে পারে। অথবা শুধু একটি হাদীসও হতে পারে। শুরুর দিকে কেউ আপনার এই পড়া শুনতে চাইবে না। বা কেউ কেউ রাগও করতে পারেন। তবে থেমে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, এটা আপনার পরিবারের জন্য ওষুধের মতো। তাই রোগীর আপত্তি সত্ত্বেও ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে।

এ ক্ষেত্রে শুরুর দিকে শুধু নামাজ-সংক্রান্ত হাদীসগুলো পড়া যায়। নামাজ পড়ার উপকারিতা, নামাজ না পড়ার শাস্তি, এসব হাদীস বারবার পড়া। পরিবারের লোকজন কতদিন আর এসব হাদীসকে উপেক্ষা করবেন। কুরআন ও হাদীসের বাণী কানে যেতে যেতে ধীরে ধীরে তাদের দিল নরম হবেই। হঠাৎ একদিন তাদের কানে এমন একটি হাদীস যাবে, যা তাদের দিলকে নাড়িয়ে দেবে। তখন তারা এসে পাশে বসবে। বলবে, আবার পড়ো হাদীসটা। এভাবেই ঘরে দ্বীনী পরিবেশ কায়েমের পথ খুলবে ইনশাআল্লাহ।

বাসায় একটানা দীর্ঘদিন এভাবে তালীম চালু রাখলে ধীরে ধীরে বেদ্বীনী পরিবেশ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বানিয়ে বলছি না এসব, চোখের সামনে অসংখ্য পরিবারের বাস্তব ঘটনা রয়েছে।

২০০.কিতাবটি উমেদ প্রকাশের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান দারুল ফিকর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পঞ্চম : এরপরের কাজ হলো, বাসায় কোন গুনাহটা বেশি হয়, সেটা খুঁজে বের করা। এরপর সেই গুনাহ বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে ধীরে ধীরে। তবে এতদিনে পরিবারের লোকদের মধ্যে দ্বীনের মোটামুটি বুঝ এসে যাওয়ায় তারাই এসব নিয়ে চিন্তা করবেন ইনশাআল্লাহ। ধরুন আপনার বাসায় টিভি রয়েছে, যেটা দিয়ে সবাই এতদিন মুভি দেখত, আপনি সেটা সরানোর ব্যবস্থা করুন। এতদিনের অভ্যাস পরিবর্তনে একটু কষ্ট লাগবে। তাই প্রথমেই কড়া ব্যবহার দেখাতে যাবেন না। মনে রাখবেন, দাঈর ভাষা কখনো রূঢ় হয় না। যদি তা-ই হতো, তাহলে তায়েফ আর মক্কার মুশরিকরা সেই কবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদুআয় মরে সাফ হয়ে যেত। এখন সেখানে ইসলামের নাম-গন্ধও থাকত না। দাঈ যত নরম হবে, তার দাওয়াতের প্রভাব তত মজবুত হবে।

ষষ্ঠ : ঘরে দ্বীনী পরিবেশ চালু করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে দুআ। চেষ্টা যতটুকু করা হবে, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি করতে হবে দুআ। আমরা দুআকে গুরুত্ব দিই না, অথচ দুআ হলো সমস্ত আমলের মূল মগজ। 'হতেই পারে না' এমন বিষয়কেও দুআর দ্বারা অর্জন করা সম্ভব।

সপ্তম : আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সবর। শুরুর দিকে প্রচণ্ড সবর করতে হবে। সবরের পরাকাষ্ঠা যত দেখানো যাবে, ততই সফলতার মুখ দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ। পরিবার থেকে যদি অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন সবর করতে হবে। আমরা এই আলোচনার শুরুতেই বলেছি, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবির-আসলাফের জীবনী পড়তে হবে। কারণ তাঁদের চেয়ে বেশি কষ্ট আর কেউই করেননি। তখন বেশি বেশি দুআ করতে হবে। নিজে দ্বীনের ওপর অটল থাকার জন্য দুআ করতে হবে। পরিবারের লোকদের জন্য দুআ করতে হবে। কোনো মাজলুম যখন অশ্রুভেজা চোখে দুআ করে, তখন সেই দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অষ্টম : যিকির।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

'জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।'[২০১]

---

২০১. সূরা রাদ, (১৩) : ২৮

কেউ যখন নিজের পরিবারে লোকদের দ্বারা দ্বীন মানার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন তার মন বিক্ষিপ্ত থাকে, সবসময় অস্থির ও পেরেশান থাকে, এই অস্থিরতা ও পেরেশানী থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার যিকির। তাই মনে মনে সবসময় যিকির করতে থাকা চাই। পরিবেশের কারণে বাহ্যিক যে ঘাটতিটুকু হয়ে যাচ্ছে, যিকিরের মাধ্যমে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। সম্ভব হলে রাতে বা সকালে কিছুক্ষণ জায়নামাযে যিকিরে নিমগ্ন থাকা চাই, এটা সম্ভব না হলে জবানে যিকির চালিয়ে যাওয়া, এটাও সম্ভব না হলে মনে মনে যিকির চালিয়ে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে সব অস্থিরতা ও পেরেশানী লাঘব হবে।

এসব পদ্ধতি মূলত নির্দিষ্ট নয়। সব পদ্ধতি সবার ক্ষেত্রেই হুবহু কার্যকর হবে তা নয়। তবে এগুলো দীর্ঘদিন অসংখ্য পরিবারে কার্যকরী হয়েছে বিধায় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরও নিজের পরিবারের অবস্থা বুঝে অন্যান্য পদ্ধতিও অবলম্বন করা যাবে। মৌলিক বিষয় দুটি—চেষ্টা আর দুআ। সাথে হিম্মত আর সবর। ইনশাআল্লাহ ফলাফল আসবেই আসবে।

পর্দার বিধান মানার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা

পৃথিবীতে সবাই সফল হতে চায়। ব্যর্থতার গ্লানি কেউই টানতে চায় না। কেউই চায় না তার জীবনে ব্যর্থতার কালিমা লেপন হোক। কিন্তু প্রকৃত সফলতা কোনটি? এটাই অনেকে বুঝতে পারে না। ফলে সফলতার নামে আসলে সে ব্যর্থতার দিকেই দৌড়ায়। পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের মন ও মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, জীবনকে উপভোগ করো, তাহলেই তুমি সফল। এই ক্ষুদ্র জীবনে বিধিনিষেধ বলে কিচ্ছু নেই। কয়দিন আর বাঁচবে! তাই যা ইচ্ছা করে নাও। পরে তো আর সুযোগ পাবে না। তারা আমাদের নারীদের শিখিয়েছে, ঘরে বন্দী রয়েছ কেন? বের হও বন্দীশালা থেকে। স্বামীর সেবা আর কতকাল করবে! তোমারও তো জীবন রয়েছে, রয়েছে নিজের স্বাধীনতা। অন্যের পরাধীন হয়ে কয়দিন থাকবে? কালো বোরকার আড়ালে তোমার সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখছ কেন? এটাকে প্রকাশ করো। বিশ্বকে দেখিয়ে দাও তোমার রূপ। ঘরের কাজকর্ম করে লাভ কী! এর চেয়ে বরং পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চাকরি করো। একসাথে বাসের হাতল ধরে যাতায়াত করো।

এরূপ অসংখ্য কু-প্ররোচনায় পড়ে আমাদের বোনেরা ভুলে যায় তাদের আত্মপরিচয়। ভুলে যায় তাদের স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদাবোধ। এরপর ভুল পথে পা বাড়িয়ে নিজের খেই হারিয়ে ফেলে। অথচ এটাকেই সে মনে করছে তার চূড়ান্ত সফলতা। বেপর্দা হয়ে চলাকে সে ভাবছে সফলতা। ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হতে পারলেই সে মনে করছে, এটাই হলো আসল সফলতা। অথচ কে প্রকৃত সফল আর কে ব্যর্থ, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বহু জায়গায় সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। এখানে সংক্ষেপে কিছু আয়াত উল্লেখ করছি,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

'প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।'[২০২]

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. قَالَ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: فَمَنْ

'তোমাদের কারও চাবুক (-এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ) পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ায় অবস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।'

হযরত সাহল রাযি. বলেন, এ কথা বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

২০২. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৮৫

'যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম।'[২০৩]

কুরআন মাজীদে আরও ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ.

'সেদিন (কিয়ামতের দিন) যে ব্যক্তি থেকেই তা (জাহান্নামের শাস্তি) দূর করে দেয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ বড়ই দয়া করলেন। আর সেটাই স্পষ্ট সফলতা।'[২০৪]

সূরা মুমিনে মুমিনদের জন্য ফেরেশতাদের দুআর একটি অংশ লক্ষ করুন,

وَ قِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

'(হে আমাদের প্রতিপালক,) তাদেরকে সব রকম মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করুন। আর সেদিন আপনি যাকে মন্দ বিষয়গুলো (অর্থাৎ জাহান্নাম ও জাহান্নামের শাস্তি) থেকে রক্ষা করলেন, নিশ্চয় তার প্রতি দয়া করলেন। আর সেটাই মহা সফলতা।'[২০৫]

কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার মাধ্যমে মুমিনদের সফলতা লাভের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

'(হে নবী,) সেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের দেখবেন, তাদের সামনে ও ডান দিকে তাদের নূর ছোটাছুটি করছে। (তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার

২০৩. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০১৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৭৪১৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ৩১৭০। সহীহ।
২০৪. সূরা আনআম, (৬) : ১৬
২০৫. সূরা মুমিন, (৪০) : ৯

পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সফলতা।'[২০৬]

যে সফলতা কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, যে সফলতা হাদীসে নববীর বক্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত এবং বিবেকবান প্রত্যেক মুসলমানের চিন্তা ও ভাবনায় যা সুপ্রতিষ্ঠিত, এটাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সফলতার পেছনে ছুটছে আমাদের বোনেরা!

এই সফলতা দুনিয়াবি কোনো ডিগ্রির দ্বারা পাওয়া যায় না। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সভ্যতা এই সফলতা দিতে পারে না। এই সফলতার মাপকাঠিও কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এই সফলতার প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বেশ কয়েকটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে। মূলত যার ভেতর ঈমান ও আমলে সালেহ রয়েছে, সে-ই প্রকৃত সফল।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا
الۡاَنۡهٰرُ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡكَبِيۡرُ

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। এটাই মহা সফলতা।'[২০৭]

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ
وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ
يُؤْتَى إِلَيْهِ.

'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার কাছে যেন এমন অবস্থায় মৃত্যু আসে, যখন সে

---

২০৬. সূরা হাদীদ, (৫৭) : ১২
২০৭. সূরা বুরূজ, (৮৫) : ১১

আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, তার প্রতি অন্যের যেমন আচরণ সে পছন্দ করে।'[২০৮]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা। আর পর্দা হলো আল্লাহ তাআলার একটি ফরজ বিধান। সুতরাং পর্দার বিধান মানার মধ্যেও রয়েছে সফলতা।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা তাতে থাকবে চিরদিন। আর এটাই মহা সফলতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।'[২০৯]

এই আয়াতে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে রয়েছে জান্নাত, আর তাঁর অবাধ্যতায় রয়েছে জাহান্নাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

'আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে (তাকওয়া অবলম্বন করে), তারাই সফলকাম।'[২১০]

---

২০৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস, ৪১৯১

২০৯. সূরা নিসা, (৪) : ১৩-১৪

২১০. সূরা নূর, (২৪) : ৫২

আরও ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿۵۱﴾ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿۵۲﴾ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿۵۳﴾ كَذٰلِكَ ۟ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿۵۴﴾ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿۵۶﴾ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۵۷﴾

‘নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যানরাজিতে ও প্রস্রবণে। তারা ‘সুনদুস’ ও ‘ইসতাবরাক’ তথা পাতলা ও মোটা রেশমি কাপড় পরিহিত অবস্থায় সামনাসামনি বসা থাকবে। তাদের সাথে এমনই ব্যবহার করা হবে। আমি ডাগর ডাগর চোখবিশিষ্ট হুরদের সাথে তাদের বিয়ে দেব। সেখানে তারা অত্যন্ত নিশ্চিন্তে সব রকম ফলের ফরমায়েশ করবে। (দুনিয়ায়) তাদের যে মৃত্যু প্রথমে এসেছিল, তা ছাড়া সেখানে (অর্থাৎ জান্নাতে) তাদেরকে কোনো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না এবং আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। এসব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ হবে। এটাই মহা সফলতা।’[২১১]

ইরশাদ হয়েছে,

وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

‘যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। কোনো কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না। এবং তাদের থাকবে না কোনো দুঃখ।’[২১২]

যার ভেতরে তাকওয়া রয়েছে, খোদাভীতি রয়েছে, তারাই প্রকৃত সফল। দুনিয়ার জীবনেও তারা সফল, আর আখিরাতে তো তাদের জন্য চিরস্থায়ী সফলতা

২১১. সূরা দুখান, (৪৪) : ৫১-৫৭
২১২. সূরা যুমার, (৩৯) : ৬১

অপেক্ষা করছেই। কিন্তু যেসব বোন পর্দার বিধানকে মনে করেন সেকেলে, যারা ইসলামের এই ফরজ বিধানকে অবজ্ঞা করেন, যারা ইসলামের গণ্ডির বাইরে গিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিতে চান, তাদের ভেতর তো খোদাভীতি নেই সুনিশ্চিতভাবে। কারণ, তাদের ভেতর যদি তাকওয়া থাকতই, তাহলে এই দুঃসাহস তারা কখনোই করতে পারত না।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

> قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.
>
> '(কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলা বলবেন, এটা সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীদের তাদের সত্যতা উপকৃত করবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহা সফলতা।'[২১৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ، وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.
>
> 'মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে-অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা

---

২১৩. সূরা মায়েদা, (৫) : ১১৯

এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন), যা সতত সজীব জান্নাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সফলতা।'[২১৪]

এই আয়াত দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বোঝা যায়। তা হলো, পর্দার ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি দেখানো, একে অপরকে সব রকমের সহযোগিতা করা জরুরি। এটাও সফলতার অন্যতম উপায়।

আপনার কোনো বান্ধবী পর্দা করতে চাচ্ছেন, কিন্তু পারিবারিক বাধায় পারছেন না। তাহলে আপনার জন্য আবশ্যক হলো তাকে এ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সাহায্য করা। তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, মনোবল বাড়িয়ে সাহায্য করা। মোটকথা, দ্বীনের পথে চলতে তার যত ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, একজন মুমিন নারী হিসেবে সেটা আপনার জন্য করা আবশ্যক।

দ্বীনের পথে ফেরার পর বোনদের জন্য এমন সাহায্যকারীর খুব প্রয়োজন পড়ে। পুরুষদের মতো তারা সবকিছু সামাল দিয়ে উঠতে পারেন না। উলটো অনেকেই পরিবারের অত্যাচারে, ভার্সিটি থেকে বারবার বাধা পেয়ে মানসিকভাবেই ভেঙে পড়েন। তখন তারা পাশে কাউকে পাওয়া তো দূরের কথা, নিজের সহপাঠীরাই তাকে ইনসাল্ট করতে থাকে। 'কিরে ভূত সাজলি কেন? জামা নাই না কি? ধুর! তুই এভাবে বোরকা পরে আমাদের সাথে যাবি কী করে? এভাবে হুজুর হয়ে গেলি কেন? হুজুরের বউ হবি নাকি?' এমন অসংখ্য তিক্ত কথার বাণে অনেকেই জর্জরিত পড়েন।

আরও লোমহর্ষক ঘটনা হলো, এক বোন লুকিয়ে লুকিয়ে পর্দা করতেন। বাসা থেকে বের হয়ে বোরকা পরতেন। কিন্তু তার কিছু বান্ধবী এটা তার বাসায় জানিয়ে দেয়ার কারণে তার ওপর নেমে আসে অত্যাচারের স্টিম রোলার। একের পর এক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একপর্যায়ে বোনটি পর্দা করাই ছেড়ে

২১৪. সূরা তাওবা, (৯) : ৭১-৭২

দেন। কারণ প্রথমত দ্বীনের পথে চলার সময় কারও সাহায্য পাননি, দ্বিতীয়ত অত্যাচারের মুহূর্তে কারও থেকে মানসিক সাপোর্ট পাননি।

তাই আপনার কোনো বান্ধবী যদি দ্বীনের পথে ফিরতে চান, অথবা সদ্যই ফিরে আসেন, তাহলে তাকে দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা করা আপনার কর্তব্য। দ্বীনের পথে ফেরার পর একজন ব্যক্তির সামনে বিশেষত একজন মেয়ের সামনে হাজারও বাধা-বিপত্তি এসে দাঁড়ায়। কখনো বাধা আসে পরিবার থেকে, কখনো আসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে, আবার সমাজ থেকেও কখনো কখনো বাধা আসে।

আফসোসের বিষয় হলো, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে থাকলেও আমাদের সমাজ ইসলামবান্ধব নয়; বরং কিছু ক্ষেত্রে মনে হয়, আমরা কি সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশেই বসবাস করছি, না কি ইউরোপ-আমেরিকার কোথাও বসবাস করছি! তাই শরীয়তের অন্যতম একটি ফরজ বিধান পর্দাকে রক্ষা করতে গিয়েও আমাদের অনেক বোন জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে হ্যারেজমেন্টের শিকার হচ্ছেন। তারা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন।

প্রকাশ্যে পর্দার বিধানের অবজ্ঞা করা হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে। আমাদের বোনদের পশ্চিমাদের মুখস্থ বুলি শেখানো হচ্ছে, ‘দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়’। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আয়োজন করা হচ্ছে। ফ্যাশন শো আর হরেক রকম শো-এর নামে আমাদের মুসলিম বোনদের নগ্ন করা হচ্ছে। দর্শক সারিতে বসে অসংখ্য মানুষ লোলুপ দৃষ্টিতে তাদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, আর তাদের বলা হচ্ছে, হ্যাঁ এটাই তো তোমার প্রকৃত সফলতা। আর আমাদের বোনরাও তা গোগ্রাসে গিলে খাচ্ছে।

এর বিরুদ্ধে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের অন্য বোনদেরই এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের কোনো সহপাঠী দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে আছেন, পর্দার বিধান থেকে দূরে সরে আছেন, তাহলে তাদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে। তাকে দাওয়াত দিতে হবে। তাকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে যা যা করা প্রয়োজন সবই করতে হবে। তাহলেই তারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকৃত সফলকাম হবে ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়াও একজন বোনকে দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা, তাকে বাধা-বিপত্তি থেকে রক্ষা

করা, তার চলার পথ সুগম করে দেয়া যে অনেক বড় একটি সদকায়ে জারিয়া, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বোন যতদিন আমল করবেন, তার মাধ্যমে অন্য যারাই দ্বীনের পথে আসবেন, সবার সওয়াব থেকে আপনিও সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত নেকীর স্রোতধারা চালু থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কিয়ামত দিবসের বিবরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ.

‘তারা যে সবর করেছিল সে কারণে আজ আমি তাদের এমন প্রতিদান দিলাম যে, তারা সফল হয়ে গেল।’[২১৫]

ধৈর্যের বিনিময়ে জান্নাতের কথা কুরআন মাজীদের আরও বেশ কয়েকটি আয়াতে এসেছে। মূলত ধৈর্যের বড় একটি প্রকার হলো, ইবাদত-বন্দেগী যথাযথভাবে আদায় করার ক্ষেত্রে ধৈর্য। আরেকটি প্রকার হলো, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ধৈর্য। ধৈর্যের তৃতীয় প্রকারটি হলো, বালা-মুসিবত ও বিপদাপদে ধৈর্য। এর মধ্যে দ্বীনের পথে চলতে গিয় যত বাধা আসে, অত্যাচার নেমে আসে, সেসবের ওপর ধৈর্যের কথাও রয়েছে। মোটকথা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্যের গুণটি অপরিহার্য। ধৈর্য সম্পর্কে কুরআন মাজীদের আরেকটি আয়াত এই :

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

‘তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব।’[২১৬]

দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে নানানভাবে জুলুমের শিকার হওয়া লাগতে পারে। তখন ভেঙে পড়লে চলবে না। কেউ কেউ দ্বীন থেকেই সরে যান। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, এ ক্ষেত্রে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এবং

২১৫. সূরা মুমিনূন, (২৩) : ১১১
২১৬. সূরা মুমিনূন, (২৩) : ১১১

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-দের জীবনী সামনে রাখা চাই। তাঁদের জীবনী বেশি বেশি পাঠ করা চাই।

তবে সবরের অর্থ এই না যে, পর্দা করাই ছেড়ে দিতে হবে; বরং পর্দা অবশ্যই করতে হবে, দ্বীনের পথে অবশ্যই চলতে হবে। কখনো এই জুলুম-নির্যাতন আসতে পারে পরিবার থেকে। বিশেষত বিয়ের সময় এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। আমাদের বোনেরা চান দ্বীনদার পাত্রের কাছে যেতে, অথচ তার পরিবার বলে উলটো কথা। তার পরিবার চায় তাদের মতোই দুনিয়াদার, ওয়েস্টার্ন কালচারের কারও কাছে বিয়ে দিতে। যাতে সে দুনিয়ার জীবনে সুখী হতে পারে। অথচ প্রকৃত সুখ ও সফলতা তো দ্বীনদারীর মাঝেই নিহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : অভিভাবকরা কি আসলেই সন্তানের কল্যাণ চান?

প্রত্যেক মা-বাবাই সন্তানের কল্যাণ চান। প্রত্যেক মা-বাবাই চান যে, তার সন্তান ভালোভাবে জীবনযাপন করুক। এ জন্য তারা সারাজীবন কষ্ট করেন অনবরত। ঠিক তেমনইভাবে সন্তানের বিয়ের সময়ও তারা চান যে, সন্তানের বিয়েটা এমন জায়গায় হোক, এমন ব্যক্তির সাথে হোক, যে আমার সন্তানকে, আমার আদরের মেয়েকে সুখে রাখতে পারবে। বাবা-মায়ের এতদিনের পালিত রাজকন্যাকে তারা আরেক রাজপুত্রের হাতেই তুলে দিতে চান। মোটকথা প্রত্যেক বাবা-মায়েরই আশা থাকে যে, তার সন্তান সব ক্ষেত্রেই সফল হোক, সফলতার শীর্ষ চূড়া তার পদচুম্বন করুক।

কিন্তু প্রকৃত সফলতা কী? এটা নির্ধারণেই অনেক অভিভাবক ভুল করে ফেলেন। আর এই ভুল যেনতেন ভুল নয়; বরং এই এক ভুলই তাদের সন্তানকে সফল হওয়া তো দূরের কথা, ঠেলে দেয় ব্যর্থতার অতল গহ্বরে।

সেসব অভিভাবক শুধু সন্তানের পার্থিক সফলতাই চান। দুনিয়াতেই তাকে সুখী দেখতে চান। ফলত তারা সন্তানের পার্থিব জীবন সুখী হওয়ার উপকরণের ব্যবস্থা করেন শুধু। অথচ সন্তানের সামনে যে অনন্ত এক সময় পড়ে রয়েছে, সেই সময়ে সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তাই থাকে না। যেন তারা মনে করছে, আমার সন্তান শুধু দুনিয়াতে সফল হলেই হবে, পরকালের কথা আপাতত মাথায় আনার দরকার নাই।

প্রকৃত সফল কারা, এ নিয়ে আমরা খানিক পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্ তাআলার একের পর এক বাণী দিয়ে আলোকপাত করেছি, প্রকৃত সফলতা কাকে বলে আর প্রকৃত সফল কে? সেসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বারবার এটাই বুঝিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, আর যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে, সে-ই প্রকৃত সফল।

মোটকথা, যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানীতে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির নিবাস জান্নাত লাভ করবে, তারাই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। যারা জান্নাত পাবে আর যারা পাবে না, উভয়ে সমান নয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لَا يَسْتَوِيٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

'জাহান্নামবাসী আর জান্নাতবাসী সমান হতে পারে না। মূলত জান্নাতবাসীগণই সফল।'[২১৭]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبّيْكَ رَبّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ! وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! وَأَيّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ:أُحِلّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً.

'আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ, উত্তরে তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমরা উপস্থিত এবং আপনার কাছে উপস্থিত হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান! নিশ্চয় সকল কল্যাণ আপনার হাতে!

আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, তোমরা কি (জান্নাত পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়েছ?

তারা বলবে, কেন সন্তুষ্ট হব না হে আমাদের রব! আপনি তো আমাদের এমন

২১৭. সূরা হাশর, (৫৯) : ২০

জিনিস দিয়েছেন, যা আপনার অন্য কোনো মাখলুককে দেননি।

আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উত্তম জিনিস দেব না?

তারা বলবে, এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কী আছে হে আমাদের রব!

আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি ঘোষণা করলাম। এরপর আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।'[২১৮]

দুনিয়ার জীবনে কে সন্তুষ্ট হলো আর কে হলো না, এটা সফলতা না; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই মহা সফলতা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

'আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন), যা সতত সজীব জান্নাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সফলতা।'[২১৯]

এটাই হলো কুরআন মাজীদে বর্ণিত সফলতা ও সফলতা লাভকারীদের গুণ-পরিচয়। এইসব গুণ ও সফলতা প্রত্যেক ঈমানদারেরই একান্ত আরাধ্য এবং সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। এই সফলতার মূল বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য।

সুতরাং যারা তাদের সন্তানকে শুধু দুনিয়ার জীবনেই সুখী দেখতে চান, আখিরাত নিয়ে যাদের কোনো চিন্তাই নেই, তারা মূলত সন্তানের প্রকৃত সফলতা চান না।

বিশেষ করে বিয়ের সময় এই সমস্যা দেখা যায়। মেয়ে চায় দ্বীনদার পাত্র, আর পরিবার চায় দুনিয়াদার পাত্র। মেয়ে চায় আখিরাতের প্রকৃত সফলতা, আর পরিবার চায় দুনিয়াবি সফলতা।

---

২১৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫১৮; সহীহ মুসলিম, ২৮২৯

২১৯. সূরা তাওবা, (৯) : ৭২

এটা তো সুস্পষ্ট কথা যে, আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্য করার মধ্যে কোনো সফলতা নেই। পার্থিব জীবনে সামান্য সুখ-শান্তির আভাস পাওয়া গেলেও বাস্তবে সেটা কোনো সুখ নয়। উপরন্তু এর কারণে আখিরাতের স্থায়ী সুখও হারাতে হয়। অপরদিকে দ্বীনদার পাত্রের কাছে বিয়ে দেয়ার অর্থ তো এটা নয় যে, আমার মেয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, এখন প্রতিটি সেক্টরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনী পরিবার ও দ্বীনদার ছেলে রয়েছে। বিয়ে দেয়ার সময় সমন্বয় করলে দ্বীনদারীর সাথে সাথে আমার দুনিয়া-কেন্দ্রিক যে অস্থিরতা ছিল, তাও দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং একজন সচেতন অভিভাবক কখনোই চাইবেন না যে, তার সন্তান ব্যর্থ হোক। তিনি কখনোই চাইবেন না, তার সন্তান আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্য করে কিয়ামতের দিন স্থায়ী আযাবের উপযুক্ত হোক।

নারীর পর্দা রক্ষায় পুরুষের দায়িত্ব

নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মানবসমাজ। ইসলাম উভয়কেই যেমন পবিত্র, অশ্লীলতামুক্ত জীবনযাপন করতে নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি সকলকেই নির্দেশ দিয়েছে পরস্পরে কল্যাণ ও পবিত্রতার পথে সহযোগিতা, উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করতে। প্রকৃতিগতভাবে নারী পুরুষের তুলনায় দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কিছুটা দুর্বল এবং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষগণই নারীদের প্রভাবিত ও পরিচালিত করে থাকেন। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুরুষেরা মেয়েদের মনমানসিকতা ও চালচলন প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করে। এ জন্য নারীদের প্রতি পুরুষের দায়িত্ব অপরিসীম।

নারীর অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যেমন পুরুষের দায়িত্ব অনেক বেশি, তেমনি নারীসমাজের শালীনতা রক্ষা ও পবিত্রতার প্রসারের ক্ষেত্রেও পুরুষের দায়িত্ব সীমাহীন। প্রকৃতপক্ষে নারী জাতি সামষ্টিকভাবে পুরুষদের জন্য কঠিন পরীক্ষা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর ও কষ্টকর কোনো পরীক্ষা আমি রেখে যাইনি।'[২২০]

---

২২০. সহীহ বুখারী, ৫০৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস, ২৭৪০, ২৭৪১; জামে তিরমিযী, ২৭৮০; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৯৮

প্রকৃতিগতভাবে পুরুষের মন চায় অন্য নারীকে উন্মুক্ত করে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। যিনি নিজের মনের কামনা ও প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর স্বাধীনতার নামে নারীকে অনাবৃত হতে উৎসাহ দিলেন, মেলামেশার মাধ্যমে মানসিক অস্থিরতা, পারিবারিক অশান্তি ও অশ্লীলতা প্রসারের পথে নারীদের ধাবিত করলেন, তিনি এ পরীক্ষায় পরাজিত হলেন। অপরপক্ষে সামাজিক পবিত্রতা ও মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণের জন্য যিনি নিজের কামনা-বাসনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীর ওপর অত্যাচার রোধের পাশাপাশি নারী জাতিকে শালীনতা ও পবিত্রতার সাথে উৎসাহিত করতে পারলেন, তিনিই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সকল অন্যায়, অনাচার, শরীয়ত-বিরোধী অশ্লীলতার ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব সাধ্যমতো সংশোধনের চেষ্টা অথবা অন্তর থেকে তা ঘৃণা করা, সংশোধনের জন্য দুআ ও ইচ্ছা পোষণ করা।

হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায়, তবে সে যেন তার হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে। এতেও যদি সক্ষম না হয়, তবে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে। আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম স্তর।'[২২১]

বিশেষভাবে পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও নিজের অধীনস্থ মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব বেশি। নিজের জন্য সতর আবৃত করা যেমন ফরজ, তেমনিভাবে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সতর আবৃত করাও বাড়ির কর্তার ওপর ফরজ। কারও পুত্র যদি নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানের কোনো অংশ অনাবৃত করেন বা এভাবে বাইরে যান, তবে পুত্রের ন্যায় পিতাও পাপী হবেন।

তেমনিভাবে কারও স্ত্রী বা কন্যা যদি চুল, মাথা, ঘাড়, গলা, কনুই, বাহু বা

২২১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২১৭২

অন্য কোনো অঙ্গ অনাবৃত করে বাইরে যায় বা ঘরের মধ্যে অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয় পুরুষের সামনে যায়, তবে স্ত্রী-কন্যার সাথে স্বামী বা পিতাও সমানভাবে ফরজ দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে পাপী হবেন।

অথচ আজকাল বাবা তার মেয়েকে বেপর্দা হতে উদ্বুদ্ধ করছেন। বাবার সামনে সন্তান শরীয়ত-বিরোধী কাজ করছে, বেপর্দা হয়ে চলছে, ভাইয়ের সামনে বোন বেপর্দা হয়ে চলছে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিরুদ্ধে চলছে, অথচ তাদের কোনো মাথাব্যথাই নেই। কিয়ামতের দিন এই সন্তানই বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। এই বোনই তার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে যে, তারা জানা সত্ত্বেও আমাকে বাধা দেয়নি। আমাকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনেনি।

উলটো অনেক পরিবারের পুরুষরা তাদের মেয়েদের পর্দা করতে বাধা দেন। দ্বীন পালন করার ক্ষেত্রে তারাই বাধা হয়ে দাঁড়ান। যেখানে দায়িত্বে অবহেলার কারণেই কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, সেখানে দ্বীনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে পরিণতি কী হবে তা বলাই বাহুল্য। অসংখ্য বোন প্রতিনিয়ত তাদের পরিবারের সাথে যুদ্ধ করে পর্দা মেনে চলছেন। পরিবারের লোকদের আড়ালে দ্বীন মেনে চলছেন। অথচ পরিবারের লোকদের দায়িত্ব ছিল, তাদের মেয়েকে দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে পূর্ণ রাহবারী করা।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকুল। আল্লাহ তাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে, যা তাদের আদেশ করা হয়।’[২২২]

অধীনস্থদের দায়িত্বের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও

২২২. সূরা আত-তাহরীম, (৬) : ৬৬

স্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল, সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখো, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২২৩]

তাই আমাদের নিজেদের স্বার্থে নিজেকে ও পরিবারের সদস্যদেরকে ইসলামী বিধান শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করতে হবে। অন্যথায় কিয়ামতের দিন দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।

ইসলামের পর্দা বিধান : মুমিন-মুনাফিকের পরিচয় নিরূপণের ঐশী মানদণ্ড

পর্দা যে ইসলামের একটি বিধান তা মুসলিম-সমাজের সকলেই জানেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দ্বীনদার-দ্বীনহীন সবারই জানা আছে যে, বেগানা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে পাপ। সমাজের ব্যাপক পর্দাহীনতার কারণে এই পাপের অনুভূতি ক্রমশ লোপ পেলেও মূল বিধানটি সবারই জানা আছে। এ ধরনের বিধানকে, যার সাথে মুসলিম-সমাজের ছেলেবুড়ো সবাই পরিচিত,

২২৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৯

পরিভাষায় 'জরুরিয়াতে দ্বীন' বলে। অর্থাৎ দ্বীন-ধর্মের সর্বজনবিদিত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

জরুরিয়াতে দ্বীনের প্রসঙ্গটি অতি সংবেদনশীল। এটি ব্যক্তির ঈমান ও ইসলামের মানদণ্ড। ইসলাম তো আর কিছু নয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও সমর্পণেরই পারিভাষিক নাম। তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যে বিধান ও শিক্ষা দ্ব্যর্থহীন ও সর্বজনবিদিত, তা সমর্পিতচিত্তে মেনে নেয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তি কীভাবে মুমিন-মুসলমান থাকতে পারে?

মুসলিম হওয়ার মানদণ্ড জ্ঞান নয়, সমর্পণ। জ্ঞান তো কাফেরদেরও ছিল এবং আছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

'আরা তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?'[২২৪]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

'যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে এমনভাবে চেনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।'[২২৫]

সুতরাং নিছক জ্ঞান মুসলিম হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মুসলিম তো সে, যে আল্লাহর বিধানের সামনে সমর্পিত হয়। তো অন্য অনেক বিধানের মতো পর্দা-বিধানও যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান, এ সম্পর্কে কোনোরূপ অস্পষ্টতা

২২৪. সূরা নামল, (২৭) : ১৪
২২৫. সূরা আনআম, (৬) : ২০

নেই। পর্দার সকল মাসআলা সবার জানা নাও থাকতে পারে, কোনো কোনো মাসআলায় ইমামদের মতভেদও থাকতে পারে; কিন্তু মূল পর্দা-বিধান সম্পর্কে কোনোরূপ অস্পষ্টতা নেই এবং এ বিষয়ে কারও কোনো মতভেদও নেই। এখন এটা এক ঈমানী পরীক্ষা যে, এই বিধানের সামনে নিজেকে বিনীত ও সমর্পিত করতে পারছি কি না?

দুই. পর্দা একটি কুরআনী বিধান। কুরআন মাজীদের অনেক আয়াত পর্দা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। পর্দা ইসলামের ওই সকল বিধানের অন্যতম, যেগুলোর বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে কুরআন মাজীদে আছে। তেমনি হাদীস শরীফেও এর আরও দিক পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পর্দা-বিধান হচ্ছে ইসলামের একটি অটল ও অকাট্য বিধান।

তিন. পর্দার বিধান পরিষ্কারভাবে কুরআন-সুন্নাহয় ঘোষিত হওয়ার কারণে এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমাও রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগে মুসলিম-সমাজের ব্যবহারিক জীবনেও তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বস্তুত পর্দা-বিধান হলো কুরআনের ভাষায় 'সাবীলুল মুমিনীন', যা পরিত্যাগকারীকে জাহান্নামের কঠিন হুঁশিয়ারি শোনানো হয়েছে।[২২৬]

সুতরাং সকল মুমিনেরই অপরিহার্য কর্তব্য, পর্দার বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করা। নিজের ও অধীনস্থদের বাস্তব জীবনে তা প্রতিষ্ঠিত করা।

পর্দা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ ধারণা। পর্দার বিধানের প্রতি অনেক মুসলমানের মানসিক আনুগত্য থাকলেও পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেই। বহু ভ্রান্ত ও খণ্ডিত ধারণা পর্দা সম্পর্কে দেখা যায়। পর্দার বিধানকে আমরা বলতে পারি, পর্দা-ব্যবস্থা। এর অনেক দিক আছে, অনেক নীতি ও বিধান আছে, যা মুসলমানের ব্যক্তি-জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সবগুলোর সমষ্টির নাম পর্দা-বিধান। সুতরাং তা অন্যান্য সাধারণ বিধানের মতো নয়। একজন সমর্পিত মুসলিমের কর্তব্য, ইসলামের এই পর্দা-ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করা। এরপর নিজের ও অধীনস্থদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা।

পর্দা সম্পর্কে খণ্ডিত ধারণার কারণে অনেকে মনে করেন যে, পর্দা শুধু নারীদের বিধান, পুরুষ এই বিধান থেকে মুক্ত। এই ধারণা ঠিক নয়। নারী-পুরুষ

---

২২৬. সূরা নিসা, (৪) : ১১৫

উভয়কেই পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। এমনকি কুরআন মাজীদেও শুধু নারীকে নয়, নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। তবে নারী-পুরুষের সত্তা ও স্বভাবগত ভিন্নতা এবং কর্ম ও দায়িত্বগত পার্থক্যের কারণে অন্য অনেক বিষয়ের মতো পর্দার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা ও পার্থক্য হয়েছে। আমরা যদি ইসলামের সামগ্রিক পর্দা-ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করি, তাহলে তিন ধরনের বিধান পাই : ১. কিছু বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন সতরের বিধান, নজরের বিধান, নারী-পুরুষের মেলামেশার বিধান ইত্যাদি। ২. কিছু বিধান শুধু নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন গৃহে অবস্থানের বিধান, প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় নিজেকে আবৃত করার বিধান, সজ্জা ও অলংকার প্রদর্শন না করার বিধান ইত্যাদি। ৩. কিছু বিধান মৌলিকভাবে পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন পরিবারের কর্তা হিসেবে অধীনস্থদের পর্দা সম্পর্কে অবগত করার বিধান এবং তাদের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের বিধান এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে সর্ব শ্রেণির মুসলিম নর-নারীর জন্য পর্দার বিধান জানা ও মানার ব্যবস্থা, পর্দা-বিরোধী সকল অপতৎরতা বন্ধ এবং সমাজে পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতা বন্ধে সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করার বিধান ইত্যাদি।

মোটকথা, ইসলামের পর্দা-বিধান শুধু নারীর জন্য নয়, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। তেমনি পর্দা-বিধান শুধু ব্যক্তিজীবনের বিষয় নয়। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেরও বিষয়।

ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা যদি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে মুসলিম নর-নারীর ব্যক্তি-জীবনের সাথে সাথে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনও সুস্থ ও পবিত্র হবে। পক্ষান্তরে পর্দা-বিধান কার্যকর না থাকলে যেখানে যেখানে তা অনুপস্থিত সেখানে সেখানেই পঙ্কিলতা ও অস্থিরতার অনুপ্রবেশ ঘটবে। এ কারণে ইসলামের পর্দা-বিধান হলো ব্যক্তি ও সমাজের রক্ষাকবচ। এই সত্য আমরা যত দ্রুত উপলব্ধি করব তত দ্রুত কল্যাণ লাভ করব। এ কারণেই ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থার যারা বিরোধী, তারা শুধু দ্বীন-ধর্মেরই বিরোধী নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও বিরোধী; তারা মানব ও মানবতার মুক্তি ও কল্যাণেরও বিরোধী। সংগত কারণেই পর্দা-বিধানকে বলা যায় বর্তমান মুসলিম-সমাজের জন্য আসমানি ফুরকান তথা এমন এক ঐশী মানদণ্ড, যা মুমিন-মুনাফিকের মাঝে টেনে দেয় পরিষ্কার পার্থক্যরেখা।

আজ সকল মুসলিমের ঈমানী কর্তব্য, পর্দার বিধানের দিকে ফিরে আসা। ব্যক্তি ও পরিবার এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং স্বস্তি ও পবিত্রতা রক্ষার এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। মেহেরবান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সত্যকে সত্য জানার এবং সমর্পিতচিত্তে তা অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুসলিম বোনদের প্রতি খোলা চিঠি[২২৭]

প্রিয় বোন, বিশ্বাস করো, তোমার সমালোচনা করা আমার অভিপ্রায় নয়। তোমাকে মন্দ ঠাওরানোতেও কোনো লাভ নেই আমার। পর্দা মেনে চলো বা না চলো, যেহেতু তোমার মাঝে ঈমান আছে তাই তুমি আমার বোন। গোড়ায় আমাদের বাবা ও মা অভিন্ন। আমাদের বিশ্বাস ও আদর্শ অভিন্ন। তুমি যে দেশ বা যে ধর্মেরই হও না কেন, আদি পিতার এ সম্পর্ক নস্যাৎ করার সাধ্য কার? আমার মিনতি, কথাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলাও। একটুখানি ভেবে দেখো খোলা মনে।

ভেবো না পৃথিবী আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সাফল্য ও সমৃদ্ধির শীর্ষ চূড়ায় উপনীত হয়েছে। ধূলির ধরা ছাড়িয়ে মানুষ এখন পৌঁছে গেছে নানা গ্রহে-উপগ্রহে। সারা বিশ্ব এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। সুতরাং এখন পর্দা করা মানে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া! পর্দা করা মানে নিজেকে বঞ্চিত করা! আমাদের মুক্তি নারী স্বাধীনতায়! মুক্তি ইসলাম উপেক্ষায়!

ইতিহাস পড়ে দেখো, ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে মুক্তি দিয়েছে। নারীকে ভোগের পণ্য হতে দেয়নি শান্তির ধর্ম ইসলাম। একমাত্র ইসলামই কন্যাসন্তান প্রতিপালনে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। ইসলামই পুরুষের চারিত্রিক শুচিতা যাচাইয়ে স্ত্রীর সাক্ষ্যের কথা বলেছে। ইসলামে কোনো সুযোগ রাখা হয়নি মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে বউ নিয়ে সুখে থাকার, অথবা জন্মের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো পর্বে মাকে অবমূল্যায়ন করার। স্ত্রী, কন্যা ও মাতা—নারীজীবন তো এর বাইরে নয়। এ ক্ষেত্রের কোনোটিতেই ইসলামের চেয়ে বেশি দিতে পারেনি কোনো ধর্ম বা কোনো জাতি।

---

২২৭. ইবনে তৈয়ব, মাসিক আলকাউসার। বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ৪

আমার ভার্সিটিপড়ুয়া কিংবা কর্মজীবী বোন, তুমি পাশ্চাত্যের মেকি স্বাধীনতায় প্রবঞ্চিত হয়ো না। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর 'হৃদয়কাড়া' চিত্র দেখে ধোঁকায় পড়ো না। নাটক-সিনেমা আর ইউরোপ-আমেরিকার সুখের ছবি দেখে নিজেকে হতভাগী ভেবো না। পশ্চিমা-সমাজের একটু ভেতরের খবর নিলেই জানতে পারবে বাস্তব অবস্থা।

যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, প্রায়ই পত্রিকায় সংবাদ আসছে পশ্চিমা তরুণীরা স্বাধীনতার (!) শেকলে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হার সবচেয়ে বেশি। একটি বইয়ে (কয়েক বছর আগে ঢাকা থেকে 'অন্যপথের কন্যারা' নামে বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে) ৪০ জন মার্কিন তরুণীর কথিত নারী-স্বাধীনতা পরিহার করে পর্দার ধর্ম ইসলামে আগমনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে। তারা সবাই নারী-স্বাধীনতার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এ স্বাধীনতাকে তারা কৃত্রিমতা ও প্রবঞ্চনা এবং ইসলামের পর্দার বিধানকে মুক্তি ও সুরক্ষা বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্রিটেনের 'সান ডে এক্সপ্রেস' পত্রিকার মহিলা সাংবাদিক রিডলি, যিনি আফগানিস্তানে বোরকা সম্পর্কে তালেবানদের ভূমিকার কঠোর সমালোচক ছিলেন, তিনিই কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংবাদ সম্মেলন করে ইসলামের পর্দার ছায়াকে শান্তির ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছেন। ভারতে খোলামেলা লেখালেখির জন্য আলোচিত মালায়াম ও ইংরেজি ভাষার লেখিকা কমলা দাস এখন ইসলাম গ্রহণ করে পর্দা করছেন। এমন নজির একটি দুটি নয়; বরং অনেক। এদের সবাই 'সুশিক্ষিতা'। এরা কেউ আবেগের বশে বা চাপে পড়ে ইসলাম কবুল করেননি।

উচ্চাভিলাষী বোন আমার, ইসলামের সীমানায় থেকে তুমি সবই করতে পারো। যদি পড়তে চাও তবে যত ইচ্ছা পড়তে পারো। প্রয়োজন হলে কর্মজীবী হয়ে কাজও করতে পারো। শুধু পর্দা লঙ্ঘন করো না। শরীয়তের গণ্ডি অতিক্রম করো না। মনে রেখো, ইসলাম তোমার অগ্রযাত্রায় বাধা নয়। পর্দাও অন্তরায় নয় প্রগতির পথে। ইসলাম চায় তুমি যেখানেই থাকো তোমার সতীত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান রক্ষা হোক। তোমার কোমলতা, সৌন্দর্য ও ভদ্রতা বজায় থাকুক। ইসলাম তোমাকে বন্দী করতে ইচ্ছুক নয়। কোনো চরিত্রহীন যেন তোমাকে কলঙ্কিত না করতে পারে, ছলে-বলে-কৌশলে তোমাকে অপমানিত না করতে পারে—এই ইসলামের অন্বেষা।

আমার স্কুল-কলেজগামী বোন, বখাটেদের ইভটিজিং থেকে বাঁচতে চাও? এসো পর্দার আশ্রয়ে। অমানুষদের এসিড সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে চাইলেও এসো পর্দার নিরাপত্তায়। যৌতুক তোমাকে দিতে হবে না; বরং নগদ মোহরানা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে, যদি তুমি হিজাবে সুশোভিত হও। এ শুধু আমার দাবি নয়; বরং বাস্তবতা। পরিসংখ্যান দেখলেই জানতে পারবে পর্দানশীনদের অল্পজনই এসব অমানবিকতার শিকার হয়।

বোন, আধুনিকতার নামে তুমি নিজেকে অসম্মান ও অনিরাপদ করো না। হেদায়েতের আলোক বঞ্চিতদের প্রচার-প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ো না। ওরা বোঝাতে চায়, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উৎকর্ষের এই যুগে আবার ধর্ম কেন? সভ্যতাগর্বী এসব মানুষের অপপ্রচারে তুমি প্রভাবিত হয়ো না। ওরা জানে না এর আগেও পৃথিবীতে তাদের মতো সভ্যতাগর্বী জাতি ছিল। তারা আজ কোথায়? বলো, তাজমহল ও পিরামিড যারা গড়েছে তাদের কেউ কি পৃথিবীতে বেঁচে আছে? দয়াময় আল্লাহ্ কত সুন্দর করে ইরশাদ করেছেন,

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে তারা দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কী হয়েছিল। দুনিয়ায় এদের চেয়ে তারা সংখ্যায় অধিক ছিল, আর শক্তি-সামর্থ্য ও কীর্তিচিহ্নে বেশি প্রবল ছিল। কিন্তু তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোনো উপকারে আসেনি।'[২২৮]

প্রিয় বোন, তুমি কি জানো বেপর্দার কুফল কী? পর্দার প্রতি যত অবহেলা করা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা ততই বাড়ছে। জাতি হিসেবে আজ আমরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত। কিন্তু নারীর প্রতি সামাজিক অনাচার বেড়েছে না কমেছে? নিত্যনতুন পন্থায় নারীর ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে। পর্দা লঙ্ঘনই অবৈধ যৌন সম্পর্কের প্রথম ধাপ আর এই অবৈধ মেলামেশাই যে নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে, এইডস-এর মতো নানা রোগ ডেকে আনে, তা বোঝার জন্য তো সাধারণ আকলই যথেষ্ট।

---

২২৮. সূরা মুমিন, (৪০) : ৮২

অতএব এসো মুক্তির পতাকাতলে। নিরাপত্তার সুরক্ষিত গণ্ডিতে। পর্দা শুধু তোমার দুনিয়ার জীবনকে নিরাপদই করবে না, নিশ্চিত করবে তোমার সম্মান ও সমৃদ্ধি। আর আখিরাতে নাজাত পাবে তুমি জাহান্নামের কল্পনাতীত শাস্তি থেকে। চিরশান্তির ঠিকানা জান্নাত হবে তোমার আবাস।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দিন। আমীন।

পাঠকের পাতা

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ্রামের দোচালা টিনের ঘরে পর্দার সুরত কী?
কাঁচারি ঘর, বাড়ির বেড়া, পর্দা।
শহরের আধুনিক ফ্লাটেই বা কীভাবে পর্দা করবে?
দরজা-জানালার পর্দা। রান্নাঘর ও ডাইনিং রুমের মাঝের পর্দা।
মেহমান আসলে এলোমেলো পরিস্থিতিতে পর্দা।
গ্রামে বেড়াতে গেলে পর্দা।
বিয়েবাড়ির পর্দা।
জানালা, পাশের ফ্ল্যাট, বেলকনি ও বারান্দার পর্দা।
লিফটের পর্দা।
থাই গ্লাসের আলোর বিপরীতে দিন ও রাতের মারপ্যাঁচ।
পথে-ঘাটে, সফরে-হযরে, বাড়িতে-গাড়িতে মা-বোন-ভাইদের পর্দার সুরত কী হবে?
কখন কোন পর্যায়ের পর্দা করবে?
প্রয়োজনে পরপুরুষদের সাথে কথা বলার কী উপায়?
গ্রামের উঠান থেকে বাচ্চাদের ডাকার উপায় কী?
জয়েন্ট ফ্যামিলির পর্দা।
গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারের পর্দার সুরত।
আত্মীয়স্বজনের সাথে পর্দা।
হকার, ফেরিওয়ালা, ভিখারি, বিদ্যুৎ বিল-ওয়ালা, অচেনা পুরুষ, হিজড়া, প্রতিবেশীর সাথে পর্দা।
কোন অবস্থায় শরীয়ত শিথিলতার সুযোগ দিয়েছে?
যেসব মা-বোন পর্দা করতে চান, কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে পারছেন না, তাদের কী করণীয়?
এমন জানা-অজানা অনেক বিষয় নিয়েই এই বই : পর্দা গাইডলাইন

পর্দা গাইডলাইন

তানজীল আরেফীন আদনান

উমেদ
প্রকাশ

স্ক্যান করুন